প্রবাহ

দ্বিতীয় খণ্ড

নিয়তি রায় বর্মণ

Prabaha (2nd Part)

An Essay Book

By - Niyati Roy Barman

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী, ২০১০ ইং

প্রকাশক
অর্ঘ্যনিলয় রায় বর্মণ
আশাদীপ
জয়নগর, ৫নং রাস্তা
আগরতলা, পিন- ৭৯৯০০১

প্রচ্ছদ
রানা বনিক
বাঁধাই
শঙ্কর পাল

মুদ্রণ
সকাল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
মিলনচক্র, আগরতলা ত্রিপুর

মূল্য
১৫০ টাকা

উৎসর্গ

প্রয়াত সহযোদ্ধা অঞ্জন ভূষণ রায় বর্মণকে

প্রবাহ প্রসঙ্গ (২য় খণ্ড)

(১)

সাধারণত, মালা গাঁথার পর তাতে সমগ্রতাই মুখ্য। চয়িতদের একক গুরুত্ব গৌণ। 'প্রবাহ' দ্বিতীয় খণ্ড সেই অর্থে পুরোপুরি লেখা-মালা নয়। অনেকটা যেন ডালায় সাজানো, সাজিতে রাখা ৪২টা ফুল। বর্ণে, গন্ধে, আকৃতিতে বিভিন্ন, বিচিত্র। আবার দুই মলাটের শাসনে তাদের একত্র রেখে সেলাই করার ছাড়পত্র দিয়েছে বুঝি সময়। কোনোটা প্রবন্ধ, কোনোটা 'রিপোর্টাজ', আবার কোনো কোনোটা শুধুই খবর-বিশ্লেষণ, দৈনিক সংবাদপত্রের চাহিদা, স্পেস্ ইত্যাদি মাথায় রেখে। হয়তো অসম্পাদিত লেখা-সংকলন এবং ফলে কিছুটা এলোমেলোও। তবুও সংকলিত সব লেখার একটাই অমোঘ ভরকেন্দ্র, সময়। একটাই তার মহাসম্পদশালী প্রাণকেন্দ্র—মানুষ। মানুষের প্রতি লেখিকার অকৃত্রিম ভালোবাসা, অপারিসীম দরদই তাঁর কলমকে প্রাণরসে পুষ্ট রাখে। ঘৃণায় আপসহীন রাখে মানুষের এবং সমাজের শত্রুকূলের বিরুদ্ধে। অমৃতস্য পুত্রা মানুষকে চলতি সময়ের গাঢ় পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার করে আনার এক দুর্নিবার আকুতি থেকেই যেন নিয়তি রায়বর্মণ পড়েন এবং লেখেন।

(২)

নিজে শিক্ষায়িত্রী বলেই হয়ত নিয়তিও বিশ্বাস করেন, "প্রকৃতি মানুষকে সুখী ও সৎ করিয়াই গড়িয়াছিল কিন্তু সমাজ তাহাকে দুর্নীতিপরায়ণ ও দুর্দশাগ্রস্ত করিয়াছে।" জাঁ জাক রুশো-র এই কথাগুলো একদিন ফরাসি বিপ্লবের ভিত্তি তৈরি করেছিল। কিন্তু, রুশো মনে করতেন— দুর্নীতি ও দুর্দশা থেকে ব্যক্তির উদ্ধার শিক্ষায় (Emile) এবং সমাজের উদ্ধার মুষ্টিমেয়র প্রভুত্ব ও বৈষম্যের অবসানে (কঁত্রা সোসিয়াল)। রুশোর 'সামাজিক গণতন্ত্র' থেকে কার্ল মার্কসের 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র', মতবাদের এই বিবর্তনের প্রাণকেন্দ্রেও কিন্তু মানুষ। মানুষের মুক্তি। সবরকম দাসত্ব, অসাম্য, শোষণ আর অমানবিকতা থেকে মুক্তির আকাঙ্খা নিয়তি রায় বর্মণ-এর এই প্রবন্ধ-সংকলনের ছত্রে ছত্রে।

(৩)

'দ্বিতীয় খণ্ড' যেহেতু, প্রথমও নিশ্চয় আছে। পড়া হয়নি, দেখাও হয়নি। তবে, দ্বিতীয়টা পড়ে প্রথমকে পাওয়ার সাধ জেগেছে। 'গল্প শুনে অল্প অল্প ভালবেসেছি'

বলা অনুচিত হলেও দ্বিতীয় 'প্রবাহ' প্রথম প্রবাহ'র খোঁজে কৌতুহলি করে তুলবে আগ্রহী পাঠককে।

৪২টি লেখার বেশির ভাগই ২০০৭ থেকে ২০০৯-এর মধ্যে আগরতলার কোনো না কোনো দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত। সবগুলোই যথেষ্ট তথ্য-সমৃদ্ধ। সহজ বাক্যবন্ধের অনায়াস ভাষাভঙ্গীতে সুস্পষ্ট কথা বলা। বক্তব্যের অস্পষ্টতা, অস্বচ্ছতা কিংবা অকারণ ছদ্মবেশ সবসময়ই দৃঢ়তার সঙ্গে পরিহার্য লেখিকার কাছে। প্রথম প্রবন্ধ 'চেতনার নাম একুশ'-এ যেমন, তেমনি বেশির ভাগ লেখায় আছে ইতিহাসও। একুশের প্রসঙ্গে ১৯৫২ সালের ঢাকা যেমন আছে, তেমনি আছে ১৯৬১-র ১৯ মে'র শিলচর। আছে ককবরকের ৩ মার্চ এবং মণিপুরী ভাষার ১৬ মার্চের কথাও। প্যারিসের 'ইউনেস্কো' অধিবেশনে ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে ঘোষণা হয়— ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে দিনটি বিশ্বজুড়ে পালিত হবে 'মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে। লেখায় এর উল্লেখ আছে। আছেন কবি শামসুর রাহ্মান থেকে কবি অনিল সরকারও। কিন্তু বাদ পড়েছে গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য। ২১ ফেব্রুয়ারি 'মাতৃভাষা দিবস' সরকারিভাবেই পালন শুরু হয়েছিল তারও অনেক আগে, সম্ভবত ১৯৯৪ থেকে এবং সেটা আমাদের এই ত্রিপুরাতেই। রাজ্যের বাম সরকার এবং মূলত সংস্কৃতি মন্ত্রী অনিল সরকারের উদ্যোগে।

(৪)

নিয়তি রায় বর্মণের প্রবন্ধের শিরোনামগুলিও বিশেষত্ব দাবি করে। 'বিংশ শতাব্দীর বিস্ময় কবি সুকান্ত' প্রবন্ধে তাঁর প্রশ্ন, 'একজন কবি কখন কালজয়ী হয়ে উঠেন?' উত্তরও দিয়েছেন নিজেই। বলেছেন, 'যদি তিনি যুগের বা শ্রেণীর অন্তর্নিহিত মুক্তির আকাঙ্খা বা যুগসত্যকে অনুধাবন করতে পারেন, তাঁর কবিতায় একটা নির্দেশ থাকে।' জানি, উত্তরটা শুনে হয়তো অনেকেরই ঠোঁট উল্টোবে, নাক কুঁচকোবে। কিন্তু থোড়াই কেয়ার করেন নিয়তি। তাই নির্দ্বিধ কলমে তিনি লেখেন, 'রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-সুকান্ত, অবিভাজ্য ধারার ক্রম-পরম্পরা।" 'বাঙালির গৌরব অদ্বৈত মল্লবর্মণ' প্রবন্ধে শান্তনু কায়সারের মতোই নিয়তি দেবীও 'তিতাস একটি নদীর নাম'কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি'র ওপরে রেখেছেন (জেলেদের জীবন আঁকার ক্ষেত্রে) অকুতোভয়ে। 'নিঃশব্দ বিপ্লবের নাম ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস' একখানা মূল্যবান প্রবন্ধ সন্দেহ নেই। তেমনি সুভাষ চন্দ্র বসু, ড. সর্বপল্লী

রাধাকৃষ্ণান, সরলা দেবী চৌধুরানী নিয়ে প্রবন্ধগুলোও চিত্তাকর্ষক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে পরপর পাঁচখানা প্রবন্ধ এই সংকলনের সম্পদ। রবিঠাকুরের সৃষ্টি, জীবন-সারণির শেষে কবির মৃত্যুর পরে ভক্তদের অত্যাচারের সেই কদর্য ও কুখ্যাত কাহিনী, মহর্ষির ধর্মাশ্রম থেকে বিশ্বকবির বিশ্ব ভারতীর বিকাশ, শান্তিনিকেতনের পরব ও মেলা এবং 'প্রজাপরায়ণ রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই পাঁচখানা প্রবন্ধের সঙ্গে 'ত্রিপুরা ও রবীন্দ্রনাথ' প্রসঙ্গে একটি লেখা হলেই আলাদা একখানা বই হতে পারে।

(৫)

নিয়তি রায় বর্মণের গভীর হৃদয়ানুভূতি টের পাওয়া যাবে পপ সম্রাট মাইকেল জ্যাকসনকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধটিতে। মানবপ্রেমী এক অন্য মাইকেলকে আঁকার চেষ্টা করেছেন তিনি, যেখানে আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের জন্য 'উই আর দি ওয়ার্ল্ড' অ্যালবামের ৭৫ লাখ কপি বিক্রির টাকা পাঠান এই জনপ্রিয় শিল্পী।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়েও লেখার তাগিদ এড়িয়ে যাননি তিনি। 'স্বাধীনতা হারাবার ইতিহাস ও পুনরুদ্ধারের প্রয়াস' প্রবন্ধে খুব গভীর বিশ্লেষণে না গিয়েও ইতিহাসের স্কেচ করেছেন। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭, এই ১৯০ বছরকে একটা প্রবন্ধের পরিসরে বন্দী করার কঠিন প্রয়াস তাঁর ব্যর্থ হয়নি। 'স্বাধীন ভারতে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের মর্যাদায়'- লেখাতে একটু আকস্মিকভাবেই যেন শচীন্দ্র লাল সিংহকে 'ত্রিপুরার রূপকার' বলে ছেড়ে দিয়েছেন লেখিকা। ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করবেন পাঠক।

(৬)

নারী অধিকার প্রসঙ্গে গোটা ছয়-সাতেক প্রবন্ধ এবং রিপোর্টাজ সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে 'সমাজতন্ত্রের আলোকে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি'— এককথায় অসাধারণ। পৃথিবীর সব দেশে নবজাতকের কান্না, লোকগান এবং নারী জাতির দুর্দশার মধ্যে মিল (!)-এর প্রসঙ্গ থেকে লেখিকা শুরু করেছেন! আছে 'বিবাহ', যৌন প্রবৃত্তি নিবৃত্তির ব্যক্তিগত অধিকার থেকে নানান প্রসঙ্গ, এঙ্গেলসের পরিবার এবং নারী-পুরুষের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সম্পের্কের কথাও। 'নারীর ভাগ্য পুনরুদ্ধারে আন্দোলন' লেখাটিতে একই বিষয়ের পুনরুল্লেখ আছে বেশ কিছু। 'ধর্মের অমানবিক কন্যা বিচার'—নিবন্ধে লেখিকার

বক্তব্য, 'মনু-সংহিতাকে জোর করে প্রাসঙ্গিক করে রাখা হয়েছে।' এ ছাড়া আসামের রাজপথে উপজাতি যুবতীকে নির্যাতন, অষ্টম সর্বভারতীয় নারী সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে মহিলা সংরক্ষণ বিলের কথা, আমেরিকায় কর্মক্ষেত্রে নারীদের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাওয়া নিয়েও রিপোর্টাজ-ধর্মী লেখা রয়েছে। আছে পতিতাবৃত্তি, লিঙ্গ-বৈষম্য নিয়ে ভাবিয়ে তোলার মতো নিবন্ধ। আছে শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি-মেদুর ভাললাগার ব্যক্তিগত কথা, ভ্রমণ কাহিনী, দুটি বইমেলা নিয়ে দুখানা লেখাও। মহাকরণের নতুন বাড়ির নেপথ্য ইতিহাস লিখেছেন। 'মৃত্যুদন্ড' এবং 'মিষ্টি'-মৃত্যু নিয়ে লেখা রয়েছে। বাদ যায়নি পরিবেশ দূষণ, ধর্মের কুপমন্ডুকতা, শক্তির আরাধনার ইতিহাস, বেনজির ভুট্টোর শহিদ হওয়া, নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গে নোয়াম চমস্কির বার্তা, মূল্যবোধের শিক্ষা ইত্যাদি নানান বিচিত্রধর্মী প্রসঙ্গের লেখালেখি।

মীনাক্ষী সেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ 'জেলের ভেতর জেল' নিয়ে একটি বিস্তৃত আলোচনাও এই সংকলনে পেশ করেছেন নিয়তি দেবী। পুস্তক আলোচনা হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু, সব লেখাই কি বই আকারে সংকলনযোগ্য? দুঃখিত, এই অযোগ্য ভূমিকা-লিখিয়ের তা মনে হয়নি। না থাকুন কোনও আলাদা সম্পাদক। নিজেকে নিজে কাঁটা ছেঁড়া করাটা কঠিন হলেও অসম্ভব কি? অন্তত একজন প্রাবন্ধিকের পক্ষে? সংকলিত লেখার অন্তত পনের-ষোল খানাকে বাদ-এর ঘরে তালাচাবি মেরে রাখতে পারলে সংকলনটি আরও সংবদ্ধ হতো। পাঠক বুঝবেন, হয়তো আপশোশও করবেন। তবুও পড়বেন, পড়তে থাকবেন। কেন না, শুরুতে বলেছি— লেখাগুলোর ভরকেন্দ্রে এই চেনা-অচেনা পোড়া সময়টা। ভাল-মন্দ, মৌলিকতা কিংবা সার্থকতার বিচারও করবে সময়। ত্রিপুরায় মহিলা-প্রাবন্ধিকের দেখা পাওয়াই যেখানে ভার, সেখানে অপরাজিতা রায়দের পরে দ্রুত দৃঢ় পা ফেলে এগিয়ে আসছেন যিনি, তাঁর নাম নিয়তি রায় বর্মণ। জীবন সম্পর্কে প্রবল আশাবাদী এই লেখিকার দ্বিতীয় 'প্রবাহ', তৃতীয়কেও তাড়াতাড়ি সংকলিত করে আনবে সময়ের গর্ভ থেকে, এই প্রত্যয় এবং শুভেচ্ছা রইল।

সমীর ধর
সাংবাদিক
আগরতলা
১২/০২/২০১০

প্রবাহ প্রসঙ্গে

আমার স্নেহভাজন নিয়তি রায় বর্মণের 'প্রবাহ' ২য় খণ্ডের প্রকাশনা নিশ্চিত রূপেই লেখিকার সাহসী প্রচেষ্টা। যারা লেখা লেখির সঙ্গে যুক্ত তারাই লেখা সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত দেবার অধিকারী। কিন্তু লেখিকার আব্দার এড়িয়ে যেতে পারলাম না বলে আনকোরা হয়েও দু চার লাইন লিখার জন্য রাজি হয়ে গেলাম। ত্রিপুরাতে মহিলা কবি, সাহিত্যিক, গল্পকার বা প্রবন্ধকার অর্থাৎ লেখালেখির জগতে যারা প্রতিষ্ঠিত তাঁদের সংখ্যা সম্ভবতঃ খুব একটা বেশি নয়। তাই কাঁচা বা পাকা যাই হোক না কেন একজন মহিলা হিসাবে নিয়তি রায় বর্মণকে উৎসাহিত করা দায়বদ্ধতা বলে মনে করি।

নিয়তি রায় বর্মণ পেশায় একজন শিক্ষিকা। কালি কলমের যুদ্ধে কতটা পারদর্শী তা পাঠকরা বিচার করবেন। তাঁর 'প্রবাহ' প্রথম সংকলনটি প্রকাশিত হয় ২০০৫ সালে আগরতলা বই মেলাতে। ৪২টি প্রবন্ধের গ্রন্থনায় 'প্রবাহ' ২য় সংকলন এবারের বইমেলাতে প্রকাশনার অপেক্ষায়। এই সংকলনটিতে লেখিকার কিছু পুরানো ও কিছু সাম্প্রতিককালের রচনা রয়েছে। এগুলোর প্রায় সবক'টি রাজ্যের দৈনিক কাগজ ত্রিপুরা দর্পণ, আরোহন, দৈনিক সংবাদ, উত্তর ত্রিপুরা, মানবী ইত্যাদিতে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিয়তি রায় বর্মণের চিন্তার প্রসারতা ও বৈচিত্রময় প্রয়াস প্রশংসার দাবি রাখে। লেখা নিয়ে আলোচনা করার দুঃসাহস আমার নেই। তবে এইটুকু বলব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ থেকে চেতনার কবি সুকান্ত, বাঙালির গর্ব অদ্বৈত মল্লবর্মণ থেকে দেশ মাতৃকার কৃতী সন্তান সুভাষচন্দ্র বসু, মানুষের বিড়ম্বনার কারণ ধর্মের কুপমন্ডুকতা থেকে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি— এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে অবাধ বিচরণ তাঁর বহুমুখী প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ। আবার বর্তমান সময়ে খুব প্রাসঙ্গিকভাবেই তিনি তুলে ধরেছেন সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান ধারনায় লালিত পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি অবমাননার বিষয়টি এবং তার থেকে উত্তরণের পথ একমাত্র সমাজতন্ত্র— তাঁর এই মতামতের সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করি। পরিশেষে বলব তাঁর এই লেখাগুলো যদি পাঠকদের ভাল লাগে তবেই তা হয়ে উঠবে স্বার্থক। আশা করব নিয়তি রায় বর্মণের লেখার অনুরাগী পাঠক পাঠিকার কাছে এই সংকলনটি সাদরে গৃহীত হবে। নিয়তি রায় বর্মণ এ রাজ্যের লেখিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হোক, এটাই কাম্য।

—মনিকা দত্তরায়

স্বীকারোক্তি

বিভিন্ন সময়ে নানা ঘটনা প্রবাহে মনে আনন্দ বিষাদের সুর উঁকি ঝুকি দেয়— এসবে কিছুটা প্রতিক্রিয়া না জানিয়ে মন স্থির হয় না। এছাড়া সমাজের বিখ্যাতজনদের মহৎ ও মর্মস্পর্শী বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা এসেও হৃদয়াকাশে ভিড় করে— তাই একটু নাড়াচাড়া করে মানসিক শান্তি খুঁজি—তৃপ্তি পাই। নারীদের অবমূল্যায়ণ মনকে পীড়া দেয়। আবার বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকায় লেখা পাঠানোর অনুরোধ— বাধ্যবাধকতা ও দায়বদ্ধতাও মনে শক্তি সাহস যোগায়। সর্বোপরি আমার সহযোদ্ধা যিনি আজ নেই—প্রয়াত— তাঁর তাগাদায়ও বিভিন্ন লেখায় হাত দিতে হয়েছে। সব মিলিয়ে সুখপাঠ্য (!) ও তথ্যবহুল রচনা জমে ওঠে। এগুলিকে এক জায়গায় সংরক্ষণের ইচ্ছা জাগে প্রিয়জনদের অণুপ্রেরণায়। এভাবেই 'প্রবাহ-২য় খণ্ড'র কলেবর তিলে তিলে সেজে ওঠে।

ব্যস্ত সাংবাদিক সমীর ধরকে কাছ থেকে ও দূর থেকে চিনি। তাঁর সহৃদয় ও পরিশীলিত ব্যবহার বরাবর আমাকে মুগ্ধ করে। তাঁকে যখন জানাই বইটির কথা তিনি অত্যন্ত খুশি হন। সঙ্কোচ কাটিয়ে বলি আমার উদ্দেশ্যের কথা অর্থাৎ বই সম্পর্কে উনার মতামত। তিনি আমাকে ফেরাতে পারেননি। বিভিন্নধরনের দায় দায়িত্বের মাঝেও সবটা প্রুফ পড়েন এবং বইটির সংক্ষেপে সামগ্রিক আলোচনা অতি অল্প সময়ে করে দেন— যা অতি দুঃসাধ্য কাজ। এটা একমাত্র আন্তরিকতায় হৃদয়ের তাগিদ ও কর্তব্য নিষ্ঠার অনুভবেই সম্ভব। কিছুটা প্রুফও তিনি স্বল্প সময়ে দেখে দেন। ধন্যবাদ জানিয়ে ভ্রাতৃসম সমীরকে ছোট করতে চাইনা।

আমার ভগ্নিসমা অগ্রজা মনিকা দত্তরায় মহাশয়া 'প্রবাহ-২য় খণ্ড'র প্রকাশ হতে চলেছে শুনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তিনি বিশিষ্ট নারী নেত্রী এবং লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো। দূরে না গিয়ে কাছের আপন জনের নিকট আবদার জানাই বইটি সম্পর্কে দু'চার কথা

লিখে দেবার জন্য। তিনি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি। বইটি সম্পর্কে সংক্ষেপে মতামত দিয়ে বাধিত করেছেন।

বই প্রকাশনার কাজে প্রত্যক্ষ সহায়তা করেছেন 'সকাল প্রকাশনা'র কর্ণধার শ্রী বিজয় পাল। তাঁর তত্ত্বাবধানে ডি.টি.পি. ছাপার কাজ ও আনুসঙ্গিক কাজ সুসম্পন্ন হয়। বইটির প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন রানা বনিক। তাঁদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

বইটি পাঠকের কাছে সমাদৃত হলে সকলের শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

—নিয়তি রায় বর্মণ

১৬.০২.২০১০ ইং

ঋণ স্বীকার

জীবনের ঝরাপাতা	—	সরলা দেবী চৌধুরানী
অজানা রবীন্দ্রনাথ	—	দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের চিঠি অন্তরঙ্গ নারীকে	—	দিগ্বিজয় দে সরকার
রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ত্রিপুরা	—	বিকচ চৌধুরী
ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ	—	প্রবোধ চন্দ্র সেন
রবীন্দ্রায়ন ২য় খণ্ড	—	পুলিন বিহারী সেন
রবীন্দ্র রচনাবলী (১৫শ খণ্ড)	—	বিশ্বভারতী
জীবন স্মৃতি	—	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শানিবারের চিঠি (প্রবন্ধ সংকলন)	—	রঞ্জন কুমার দাস
একত্রে রবীন্দ্রনাথ (২)	—	অমিতাভ চৌধুরী
চণ্ডী	—	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
নেতাজী ও ভারতের অসমাপ্ত বিপ্লব	—	হীরেন্দ্রনাথ নন্দী
ডঃ সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ ঃ জীবন ও দর্শণ	—	ডঃ রামপ্রসাদ পাল
জীবন স্মৃতি	—	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সাহিত্য	—	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাশিয়ার চিঠি	—	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুকান্ত স্মৃতিমাল্য	—	হরিপদ ঘোষ সম্পাদিত
জেলের ভেতর জেল	—	মীনাক্ষী সেন
বাঙালির মুকুট	—	অরুন্ধতি মুখোপাধ্যায়
সুকান্ত সমগ্র	—	সুকান্ত ভট্টাচার্য
অদ্বৈত মল্ল বর্মণ স্মারক গ্রন্থ-২০০৭	—	ত্রিপুরা সরকার
সঞ্চয়িতা	—	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাংলা সহায়ক পাঠ (উচ্চমাধ্যমিক)		

সূচীপত্র

চেতনার নাম একুশ

২১শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস — একটি রক্তাক্ত সংগ্রামের স্বীকৃতি। বর্তমানে ২১শে ফেব্রুয়ারী শোকের দিন নয় — উৎসবের দিন। মাথা নত না করার দিন। আমরা ত্রিপুরায় ঘটা করে এ দিনটি পালন করি সরকারী এবং বেসরকারীভাবে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ দিনটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ, বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের উপর আলোচনা, কবিতা পাঠ, সংগীত পরিবেশন, নাটক, নৃত্য পরিবেশন, ভাষার গতিবিধি অনুভূতি নিয়ে আলোচনা হয়।

এবার আগরতলায় ভাষা দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান তিনদিন ব্যাপী ছিল। ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০০৯ ইং বেসরকারী সংস্থা ত্রিপুরা-বাংলা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্র ভাষা উৎসবের উদ্বোধন করে নজরুল কলাক্ষেত্রের আনন্দ প্রেক্ষাগৃহে। ২১শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান। আখাউড়া চেকপোস্টে অনুষ্ঠিত হয় অসীমান্তিক প্রভাতী অনুষ্ঠান। এপার ওপার দু'পারের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময়, অস্থায়ী মঞ্চে কবিতা পাঠ, সংগীত পরিবেশন। মত বিনিময় ও ভাব বিনিময় চলে। ২২শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় আনন্দ প্রেক্ষাগৃহে কিশোর মহলের শিশুশিল্পীরা অংশ নেয়। বাংলা, হিন্দী, ককবরকে এরা ডালি সাজিয়ে এনেছিল — যা দেখে সবাই মুগ্ধ। সরকারী নির্দেশে ভাষা দিবস পালিত হয়েছে রাজ্যের সর্বত্র। বাংলাদেশ থেকে এক ঝাঁক বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক শিল্পী রাজ্যে এসেছেন। আমাদের রাজ্য থেকেও বাংলাদেশে গেছেন বিশিষ্ট অনেকে। পশ্চিম বাংলা থেকেও এসেছেন আমন্ত্রিত হয়ে ভাষা উৎসবে ত্রিপুরায় ও বাংলাদেশে।

আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস অর্থাৎ ২১শে ফেব্রুয়ারী নিয়ে এত উন্মাদনা কেন? এর পেছনে যে রয়েছে রক্তক্ষয়ী ইতিহাস। এই উপমহাদেশে একই সঙ্গে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয় — পাকিস্তান ও ভারত — ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ও ১৫ই আগস্ট। ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ইচ্ছায় বা শখে। যার ফলে দেশ ভাগে অগণিত মানুষের দুঃখ দুর্দশা। ছিন্নমুল উদ্বাস্তু সমস্যা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা। তদানীন্তন পাকিস্তানের দু'টি অংশ পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ববঙ্গকে নিয়ে পাকিস্তান।

ধর্মের ভিত্তিতে মুসলীম লীগের দেশ ভাগের দাবীকে বুদ্ধিজীবীরা মেনে নিতে চাননি। বিদ্রোহী কবি নজরুল 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন 'পাকিস্তান না ফাঁকিস্তান'?

এ কথাটি সে সময় বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের শ্লোগানে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের সৃষ্ট হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ভয়াবহতা মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায় দেশ ভাগ ছাড়া উপায় ছিল না। মহাত্মা গান্ধী দেশ ভাগের পক্ষে ছিলেন না। জওহরলাল রাজি হলেন উপায়ান্তর না দেখে। এদিকে ১৯৪৭ সালের জুলাই-এ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ জিয়াউদ্দিন আহম্মদ দাবি তুললেন নূতন পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা উর্দুই হোক। ডঃ মহম্মদ শহিদুল্লাহ যিনি ১৮টি ভাষায় পণ্ডিত এবং বগুড়ার আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ, 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় তৎকালীন জনবিন্যাসের বিস্তৃত তথ্য উল্লেখ করে লিখলেন, পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা ও অফিস-আদালতের মাধ্যম বাংলা হবে, উর্দু নয়। কাজেই দেশ ভাগের পূর্বেই যারা ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ চেয়েছিলেন তারা অস্বস্তিতে পড়লেন। কারণ ডঃ শহিদুল্লাহ-এর যুক্তি পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবী ও আমজনতা মেনে নিয়েছিল। রাষ্ট্রভাষার ইস্যুতে মুসলীম লীগ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খী উর্দুপন্থী ছিলেন। এ ভাবেই ভাষা আন্দোলনের সামাজিক ভিত তৈরী হয়ে যায় পূর্ববঙ্গে।

১৯৪৮ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক মহম্মদ আলি জিন্নাহ গভর্নর জেনারেল হিসাবে প্রথম পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় সফরকালে এসে ঘোষণা দিলেন, উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। ঢাকার বিখ্যাত রেসকোর্স ময়দানে তিনি ২১শে মার্চ ১৯৪৮ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, "Urdu and only Urdu should be the state language of Pakistan" মাঠে সমবেত বাঙালিদের সমস্বর ধ্বনি শোনা যায় "না" "না"। জাতির পিতার মুখে এ অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তের কথা পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের জাগ্রত বিবেককে স্তম্ভিত করেছিল। কারণ পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ছয়জন মাত্র উর্দু ভাষী আর বাদবাকী ৯৪ জনই বঙ্গভাষী। কাজেই ছয় জনের মুখের ভাষা চুরানব্বই জনের মুখের উপর জোর করে চাপিয়ে দেবার ধূর্ত প্রয়াস ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী — কেউই মেনে নিতে পারেননি। ক্রোধাগ্নিশিখা ক্রমে ক্রমে তীব্র হলো বঙ্গভাষীর অন্তরে এবং সে আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। ২৪শে মার্চ (১৯৪৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে সমাবর্তন উৎসবে তিনি পুনরায় উর্দু রাষ্ট্র ভাষা থাকার সদম্ভ ঘোষণা দেন। ছাত্রগণ সঙ্গে সঙ্গে 'No' 'No' বলে এর প্রতিবাদ করেন।

৪৭ থেকে ৫২, ভাষা নিয়ে বিতর্ক আর আন্দোলন অব্যাহত থাকল। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হলো বহুমুখী সাংস্কৃতিক সংগঠন। এর নেতৃত্বে ছিল বাম শক্তি ও জাতীয়তাবাদী শক্তি। ক্রমে শ্রমিকরাও আন্দোলনে সামিল হল। ওদিকে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এবং বড়লাট মহম্মদ আলি জিন্নাহ তাদের সিদ্ধান্তে অটল। জিন্নাহ-এর মৃত্যুর পর খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের বড়লাট হন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিন। সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা পরিষদ আন্দোলনের ডাক দেয় ৪ ফেব্রুয়ারী থেকে ২০ ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) পর্যন্ত। সমস্ত

পূর্ব পাকিস্তানে ২১শে ফেব্রুয়ারী হরতাল ডাকা হয়। সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বিপুল জনতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় মিলিত হয়। পুলিশ টিয়ার গ্যাস ও গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই আব্দুল, জব্বার ও রফিকুদ্দীন শহীদ হন। হাসপাতালে মারা যান সালাম ও বরকত। এছাড়া বহু ছাত্র-ছাত্রী আহত হন। অফিস-আদালত ত্যাগ করে সমস্ত মানুষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে জড় হন। আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে আওয়াজ ওঠে "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই, ছাত্র হত্যার বিচার চাই, নুরুল আমিনের ফাঁসি চাই।"

পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী অপপ্রচার চালায় ভারত ও কমিউনিস্টদের ষড়যন্ত্রে এসব হচ্ছে। গণবিক্ষোভের ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত হয়। সে আর এক ইতিহাস।

অবশেষে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। তবে বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করার জন্য নানা চক্রান্ত চলে। ইংরেজী সাহিত্যিকদের নানা রচনা পড়ানোর সিদ্ধান্ত — আর বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনা পড়ানো চলবে না। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, লোকায়ত উৎসব, কবিগান, যাত্রা — এসব নিষিদ্ধ। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা পরোক্ষ সংগ্রামের বীজ, সন্দেহের বাতাবরণ কৌশলে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদের পিতা শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ভারতীয় সরকার বিশেষ করে ত্রিপুরা, পশ্চিম বাংলা, অসমের একটা অংশ মুক্তি সংগ্রামীদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হাজারে হাজারে নর-নারী-শিশু ভারতে আশ্রয় নেয়। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর 'বাংলাদেশ' নামে এক নূতন সার্বভৌম দেশের সৃষ্টি হয় পৃথিবীর মানচিত্রে। সেই সঙ্গে ঋষি অরবিন্দের অমর বাণী সার্থক হয় — "Language is the heart of a Nation".

অসমের বারক উপত্যকায় সংগঠিত হয়েছিল বাংলা ভাষার জন্য গণআন্দোলন। ১৯৬১ সালের ১৯ মে এগারোজন বাংলা ভাষার দাবীতে আত্মবলিদান করে শহিদ হন। আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসে তাদের যথোপযুক্ত মর্যাদায় স্মরণ করা হয়। ৩রা মার্চ ত্রিপুরার আদিবাসী জনজাতি গোষ্ঠীর মুখের ভাষা ককবরকের জন্য শহীদান দিবস। ১৬ মার্চকে স্মরণ করি মণিপুরী ভাষার জন্য।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসে যে ভাষা বন্দনা অনুষ্ঠিত হয় এর নেপথ্যে এক কাহিনী রয়েছে। কানাডায় বহু ভাষাপ্রেমী একদল সহৃদয় ব্যক্তি একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

গড়ে তোলেন 'Mother Language Lover of the World.' উদ্দেশ্য, পৃথিবীর বুক থেকে বহু ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে—বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের, এদের অস্তিত্ব রক্ষা করা ও সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানেও একসময় বাংলা ভাষার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছিল। এ বিষয়ে কানাডার অভিবাসী রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালাম বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে ১৯৯৮ সালের ২৯ মার্চ রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব কফি আন্নানের নিকট আবেদনপত্র পেশ করেন। বিষয় হলো ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের স্বীকৃতি দান করা। ঐ আবেদনপত্রে দশ জন মাতৃভাষা প্রেমী স্বাক্ষর করেছিলেন। আবেদনপত্রটি পেশ করার পদ্ধতিগত ত্রুটি পরিলক্ষিত করে রাষ্ট্রসংঘ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে এধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আবেদন করতে হলে কোন সদস্য রাষ্ট্রের জাতীয় কমিশন মারফৎ হওয়া প্রয়োজন। তখন কানাডায় বসবাসরত রফিকুল এবং সালাম নিজ দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং কমিশনারের তরফ থেকে পুনরায় আবেদন পেশ করা হয়। ১৯৯৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেসকোর ত্রিশতম সাধারণ সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে ১৭ নভেম্বর ঘোষণা দেওয়া হয় ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। কাজেই ২০০০ সাল থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী সারা বিশ্বে ভাষাপ্রেমীগণ ভাষার কল্যাণে ভাষার বিকাশে স্মরণ করে আসছেন।

ইতিমধ্যে ইউনেসকো থেকে প্রকাশিত 'Atlas of Word Languages' জানিয়েছে, পৃথিবী হারিয়েছে ২০০টি ভাষা। বিশ্বের মোট ছয় হাজার ভাষা থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে প্রায় আড়াই হাজার। এরমধ্যে ভারতীয় ১৯৬টি ভাষা, আমেরিকার ১৯২টি ভাষা এবং ইন্দোনেশিয়ার ১৪৭টি ভাষা।

পৃথিবীর বৈচিত্র্য হরেক মানুষের হরেক ভাষা যদি হারিয়ে যায় তবে ২১-র চেতনার সার্থকতা কোথায়? সীমাহীন যত্নে পরিশ্রমে ও সময়ের ব্যবধানে একটি ভাষা সৃষ্টি হয় আর তা যদি অবজ্ঞা-অবহেলায় হারিয়ে যায় তবে ঐ মায়ের সন্তানের কী হবে? কোন্ ভাষায় কথা বলবে, জানবে, শিখবে? মাতৃদুগ্ধ হারা শিশুরা বাঁচবে? বড় হবে?

প্রতি বৎসর ভাষার মাস ফেব্রুয়ারী এলেই সামসুর রাহ্মানের অনুভূতি আমাদের হৃদয়কে দোলা দিয়ে যায় —

"বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে নিকানো উঠোনে ঝরে
রোদ, বারান্দায় লাগে জ্যোৎস্নার চন্দন। বাংলা ভাষা
উচ্চারিত হলে অন্ধ বাউলের একতারা বাজে
উদার গৈরিক মাঠে, খোলা পথে, উত্তাল নদীর
বাঁকে বাঁকে, নদীও নর্তকী হয়। যখন সকালে

নতুন শিক্ষার্থী লেখে তার বাল্য শিক্ষার অক্ষর,
কাননে কুসুম কলি ফোটে, গো রাখালের বাঁশি
হাওয়াকে বানায় মেঠো সুর, পুকুরে কলস ভাসে।

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে চোখে ভেসে ওঠে কত
চেনা ছবি; মা আমার দোলনা দুলিয়ে কাটছেন
ঘুম পাড়ানিয়া ছড়া কোন্ সে সুদূরে; সত্ত্ব তার
আশাবরী। নানি, বিষাদসিন্ধুর স্পন্দে দুলে
দুলে রমজানি সাঁঝে ভাজেন ডালের বড়া, আর
একুশের প্রথম প্রভাত ফেরি — অলৌকিক ভোর।”

ছোট্ট অরণ্য দুহিতা ত্রিপুরা রাজ্যে একুশের চেতনা নজরকাড়া। এখানে শিক্ষা সংস্কৃতি ও চেতনার একটা আবহ সৃষ্টি হয়েছে। সরকারীভাবে বইমেলা, ভাষা দিবস, রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত জন্মজয়ন্তী, শিক্ষক দিবস, শিশু দিবস ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। নেতাজী জন্মজয়ন্তী পালনে বড়মাপে সরকারী অর্থ সাহায্য উল্লেখ করার মতো।

কবিমন্ত্রী অনিল সরকারের চেতনায় ও অনুভূতিতে ২১-র বর্ণনা না দিলে এ রচনা অসম্পূর্ণ হবে —

“বুকের ভিতর,
শোকের ভিতর,
শিশুর মুখে,
প্রিয়ার চোখে
একুশ আছে,
একুশ আছে
আমার কাছে
তোমার কাছে।”

বিংশ শতাব্দীর বিস্ময় কবি সুকান্ত

প্রাক্ রবীন্দ্র যুগে বাংলা কাব্য সাহিত্যের ভিত্তি ছিল সংস্কৃতি সাহিত্য অনুসারী রোমান্টিকতা। বাংলার দিকপাল সাহিত্যিক রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, মধুসূদনদের সাহিত্যে রোমান্টিকতা পরিপূর্ণ প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সাহিত্যে এর উপস্থিতি। মধ্য জীবনে রোমান্টিকতার সঙ্গে মিস্টিসিজম। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র প্রতিভারও রূপান্তর। বিশেষ করে রাশিয়া ভ্রমণ করার পর তাঁর সাহিত্য রোমান্টিকতা ও মিস্টিসিজমের পর্দা ভেদ করে বাস্তবতার উপর পদচারণা করে। সে সময় ভারতের মাটিতে জল হাওয়ায় আন্তর্জাতিকতা, সাম্যবাদ এর ধারণা প্রসার লাভ করে। মার্কসবাদ দেশের মানুষের কাছে নূতন পথের সন্ধান দিল। নজরুলের কবিতায় এর প্রথম সদম্ভ প্রকাশ ঘটে। বাংলার কবিগণ সে থেকে বাস্তবের উপর দাঁড়িয়ে কবিতা লেখেন, মানুষের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, আশা-আকাঙ্খা উপজীব্য করে। মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রামের অংশভাগী হলেন তাঁরা। বিশ্ব কবির একান্ত ইচ্ছা ছিল —

"এসো কবি অখ্যাত জনের

নির্বাক মনের।

মর্মের বেদনা যত করিও উদ্ধার।"

রবীন্দ্রনাথ উত্তরাধিকারী কবিদের মধ্যে যে দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন — তা কাঁধে নিয়েই সুকান্তর আবির্ভাব ঘটেছিল। ক্ষণজীবী কবি সুকান্ত সে দায়বদ্ধতা সার্থক করেছিলেন। ক্ষয়রোগ যদি তাঁকে ছিনিয়ে না নিত তবে বাংলা, ভারতবর্ষ ও বিশ্ব পেত আর এক রবীন্দ্রনাথকে।

সুকান্তের জন্ম ৩০শে শ্রাবণ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে, দাদামশাই সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ৪২নং মহিম হালদার স্ট্রীটের বাড়ির দোতলার ছোট্ট একটি ঘরে। বাবা নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুনীতি দেবীর দ্বিতীয় সন্তান তিনি। বিখ্যাত সাহিত্যিক মনীন্দ্র লাল বসুর গল্প 'সুকান্ত'র নামেই জেঠতুতো দিদি রাণীদি তাঁর নাম রেখেছিলেন সুকান্ত। ছোট্টবেলা বাবা-জেঠামশাইর সাথে এক বাড়িতেই বাগবাজারের নিবেদিতা লেনের বাড়িতে কাটে। তারপর উনারা চলে আসেন বেলেঘাটায় ৩৪নং হরমোহন ঘোষ লেইনে নিজেদের বাড়িতে। এখানেই বাড়ির সকলের প্রিয় রাণীদির হঠাৎ মৃত্যু হয়। তারপর বাবা জেঠামশাইরা পৃথক হন।

বালক বয়সে প্রচুর ছড়া লিখে তিনি আত্মীয়স্বজনদের নিকট খ্যাতি লাভ করেন। বেলেঘাটায় স্থানীয় কমলা বিদ্যামন্দিরে ভর্তি হন। এখানে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াকালীন হাতে লেখা একটি পত্রিকা 'সঞ্চয়' বের হয়। এর নামকরণ বালক সুকান্তই করেছিলেন। পত্রিকাটিতে তাঁর একটি হাসির গল্প প্রকাশিত হয়েছিল।

তাঁর লেখা বিবেকানন্দের জীবনী প্রথম ছাপা হয়ে বের হয় বিজন কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শিখা' পত্রিকায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনাকালে তিনি অভিনয়ও করেছিলেন 'ধ্রুব' ন্যাটিকার নাম ভূমিকায়। তখনই তিনি মা'কে হারান। ক্যান্সার রোগে তিনি মারা যান। মাত্র এগারো বছর বয়সে তিনি 'রাখাল ছেলে' নামক একটি রূপক গীতিনাট্য রচনা করেন। এটি পরবর্তী সময় 'হরতাল' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

বেলেঘাটা কমলা বিদ্যামন্দির থেকে তিনি বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুলে ভর্তি হন। সেখানে সপ্তম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় 'সপ্তমিকা' নামক একটি হাতে লেখা পত্রিকার সম্পাদনা করেন। সহযোগী ছিলেন বন্ধু কবি অরুণাচল বসু।

রেডিওতে প্রথম কবিতা আবৃত্তি করেন ১৯৪১ খ্রীঃ গল্পদাদুর আসরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা। আর রবীন্দ্র প্রয়াণ উপলক্ষ্যে তিনি নিজের লেখা কবিতাই আবৃত্তি করেছিলেন রেডিওতে। সুকান্তের খুব প্রিয় খেলা ছিল ব্যাডমিন্টন ও দাবা। বেলেঘাটা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় তাঁর অন্যতম ভূমিকা ছিল।

১৯৪১-৪২ খ্রীঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কসবাদী চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন এবং আজীবন এ থেকে বিচ্যুত হননি। ১৯৪২ খ্রীঃ এর গোড়ার দিক থেকেই তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন।

১৯৪৩-৪৭ সালে বাংলা একেবারে বিধ্বস্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকায়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায়, মন্বন্তর ও মহামারীতে ৫০ লক্ষ বাঙালির অসহায় প্রাণ বলি হয়। এদিকে, সংঘবদ্ধ সংগ্রাম, ডাক ও তার ধর্মঘট, আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগ্রাম ও নৌবাহিনীর বিদ্রোহ ইত্যাদি অগ্নিক্ষরা কাহিনী। দেশের ভয়ঙ্করতম দিনে কিশোর কবি যুগ সচেতনার অদ্ভুত পরিচয় দিয়েছেন। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করেন —

"আর মনে করো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র,
নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,
অরণ্যের মর্মরধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা,
আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন।" (ঐতিহাসিক)

১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালের গণআন্দোলনের প্রত্যেকটিতেই তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ

করেন। ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কমিউনিস্টদের জন্য বিশেষ চিকিৎসা কেন্দ্র রেড-এন্ড-কিউর হোমে তাঁকে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে কিছুদিন পর মেজদা রাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য ও মেজ বৌদির তত্ত্বাবধানে শ্যামবাজারে থাকেন। তারপর যাদবপুর টি বি হাসপাতালে। সেখানেই ১৩৫৪ সালের ২৯শে বৈশাখ অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৪৭ সালের মে মাসে সুকান্তের মৃত্যু হয়।

সুকান্তের অকৃত্রিম মানবপ্রেমই তাঁকে মানুষের হৃদয়ের সিংহাসনে পাকা আসন করে দিয়েছে। মন ভোলানো মুখের ভালবাসা নয়, মেকি কান্না নয় — প্রতিটি গরীব মেহনতি মানুষের জন্য তাঁর অনুভূতি রূঢ় বাস্তব। 'রানার' কবিতাটি তাঁর সমমর্মিতার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। রানার সকলের খবর বহন করে, আর তার দুঃখের কাহিনী 'জানবে পথের তৃণ'—

"ক্লান্ত শ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে,
জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে।
অনেক দুঃখে, বহু বেদনায়, অভিমানে, অনুরাগে,
ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।" (রানার)

সুকান্তের জীবনের প্রস্তুতি পর্বে এমন কতকগুলি কবিতা — বোধন, রানার, কলম, ছাড়পত্র, একটি মোরগের কাহিনী ইত্যাদি লিখেছেন যেগুলি সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্বের দাবী রাখে। 'একটি মোরগের কাহিনী'তে একটি মোরগেব জীবনের স্বপ্ন-আকাঙ্খা ও চরম পরিণতি কি নিদারুণভাবে তাঁর কলমে পরিস্ফূট হয়েছে —

"ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দেখে —
প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবার!
তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল,
একবারে সোজা চলে এল
ধপ-ধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে;
অবশ্য খাবার খেতে নয় —
খাবার হিসেবে।।"

শোষিত মজুরের সংগ্রামের সাথে একাত্ম অনুভবে ঘোষণা করেন

"প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত
দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত;
তাদেরই দলের পিছনে আমিও আছি
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি — বাঁচি।"

বাংলা সাহিত্যে ছোটদের জন্য ছড়া ও কবিতা লিখে বিখ্যাত হয়েছেন সুকুমার রায়, সুনির্মল বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁদের ছড়ার পাশে সুকান্তর ছড়া ও অবলীলায় স্থান করে নিয়েছে। ছোটদের মনে আলাদা স্বাদ এনে দিয়েছেন। প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের মনকে আন্দোলিত করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন —

"বলতে পারো বড় মানুষ মোটর কেন চড়বে?
গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে?
বড় মানুষ ভোজের পাতে ফেলে লুচি মিষ্টি,
গরীবরা পায় খোলামকুচি, এ কী অনাসৃষ্টি?
বলতে পারো ধনীর বাড়ি তৈরী যারা করছে
কুঁড়ে ঘরেই তারা কেন মাছির মতো মরছে?"

বিদ্রোহী কবি নজরুলের সার্থক উত্তরসুরী সুকান্তের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় রচনা করেছে। আজীবন তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন — তাই দাবিদ্র্য পীড়িত, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের মনের বেদনা সর্বাঙ্গীনভাবে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পেয়েছিলেন। তার উপলব্ধি তাঁর প্রতিটি লেখায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। রোদ-বৃষ্টি-ঝড়, অর্ধাহার-অনাহার মানুষকে যতটা না ঘায়েল করতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশী ঘায়েল করে বঞ্চনা —মানুষ কর্তৃক মানুষের বঞ্চনা। কুকুরের সঙ্গে মানব শিশুকে ডাস্টবিনে এঁটোকাঁটা কাড়াকাড়ি করে খেতে দেখেও যারা নির্বিকার, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার কষাঘাতে হাড় জিরজিরে মানুষের দুরবস্থা দেখেও যারা প্রাচুর্য্যের ছিটেফোঁটা বিলাবার কর্তব্য অনুভব করে না, উল্টে দেশ দরদের ও মানব দরদের কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে শত শত বৎসর প্রতারণা করে চলেছে— তাদের বিরুদ্ধে সুকান্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, তাঁদের সত্যিকার পরিচয় উদ্ঘাটনে ব্রতী হন। এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থান্বেষী মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে জোঁকের মতো শোষণ চালায়। শোষকবর্গের প্রতি তাই তিনি জ্বালাময়ী কণ্ঠে হুসিয়ারী দিয়েছেন —

"শোনরে মালিক, শোনরে মজুতদার।
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়
হিসাব কি দিবি তার?
প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি?

আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।" (বোধন)

বিদ্রোহী কবি সুকান্তের শত বিদ্রোহের মধ্যেও তাঁর প্রেমিক সত্তার পরিচয় মেলে চিঠিপত্রের অন্তর্জালে। এদিক দিয়ে তিনি প্রেমিক নজরুলের সার্থক উত্তরসূরী। কোন তরুণীর স্নিগ্ধ ব্যবহার তার মনে প্রেমের জোয়ার এনেছিল। কোন 'সহানুভূতিশীলা'র নম্রতায় তিনি অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তবে প্রেমের কবিতা তাঁর নেই বললেই চলে। এদিকে, নজরুলের অসংখ্য সুন্দর প্রেমের কবিতা ও গান।

সুকান্তের কবিতা স্বাধীনতা, পরিচয়, শতাব্দীর লেখা, বসুমতী, আজকাল, উজ্জয়িনী, মেঘনা, কবিতা, ক্রান্তি, রঙমশাল, ত্রিদিব প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশের খবর শুনতে পান। ফ্রান্স ও আমেরিকায় তাঁর জীবনী বের হবে — একথা শুনেন। তাঁর কবিতা সংকলনগুলি — ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস, মিঠেকড়া, অভিযান, হরতাল — ইত্যাদি সবই তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

একজন কবি কখন কালজয়ী হয়ে ওঠেন? যদি তিনি যুগের বা শ্রেণীর অন্তর্নিহিত মুক্তির আকাঙ্খা বা যুগসত্যকে অনুধাবন করতে পারেন; তাঁর কবিতায় একটা নির্দেশ পাওয়া যায় — একযোগে শ্রমিক শ্রেণী ও প্রগতিশীল মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করার। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় জাতিসত্তায় স্পন্দন এনেছিলেন, নজরুল শ্রমিক-কৃষকের জাতীয় সংগ্রামে মৈত্রী বন্ধন অটুট করেছিলেন। আর সুকান্ত শ্রমিক শ্রেণীকে সচেতন করে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাই তো রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত অবিভাজ্য ধারায় ক্রম পরম্পরা।

বাঙালির গৌরব — অদ্বৈত মল্লবর্মণ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অদূরে গোকর্ণ ঘাটে অদ্বৈত মল্লবর্মণ জন্মগ্রহণ করেন ১লা জানুয়ারী ১৯১৪ সালে। পিতা অধরচন্দ্র মালো। শৈশবেই পিতা-মাতা ও দুই সহোদরকে হারান। বিয়ের পর তাঁর বোন বিধবা হন দুই পুত্রকে নিয়ে। তিনিও ১৯৩৪ সালে মারা যান।

নিত্য সঙ্গী ছিল দারিদ্র্য। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। অর্ধাহারে, অনাহারে পায়ে হেঁটে দূরে স্কুলে যেতে হত। ১৯২৭ সালে তিনি অন্নদা হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। এর পূর্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাইনর স্কুলে তিনি পড়েছেন। পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ দেখে এই অসহায় ছেলেটিকে মালো সমাজের লোকেরা চাঁদা তুলে স্কুলে ভর্তি করেছিল। তবে অদ্বৈত নিয়মিত বৃত্তি পেযে পেযে এগিযেছেন। ১৯৩৩ সালে ম্যাট্রিক প্রথম বিভাগে পাশ করলেও বৃত্তি পাননি, বহু কষ্টে কুমিল্লাব ভিক্টোরিযা কলেজে ভর্তি হন। ছোটবেলা থেকেই অদ্বৈতর পড়াশোনাব প্রতি যেমন আগ্রহ ছিল — তেমনি গল্প-কবিতা ও প্রবন্ধ লেখারও নেশা ছিল। তিনি ছিলেন মেধাবী ছাত্র - প্রচার বিমুখ ও অন্তরমুখী। মালো পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও জল ও জালের টান ছিন্ন করে কলকাতায় চলে আসেন জীবিকার সন্ধানে। এখানে এসে তিনি কালি-কলমের যুদ্ধ শুরু করেন। তবে তিনি ছিলেন ক্ষণজীবী। তাঁর সাহিত্য ও সাংবাদিকতার জীবন মাত্র ১৫ বৎসর। এরই মধ্যে তিনি কালজয়ী ও আন্তর্জাতিক মানের সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর মূল্যায়ন হয়নি। ১৯৫১ সালের ১৬ই এপ্রিল মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে যক্ষ্মা রোগে তাঁর অকাল প্রযাণ ঘটে। তিনি থাকতেন কলকাতার ষষ্ঠীতলা লেইনে একটি অতি পুরাতন চারতলা বাড়ির চিলেকোঠায়। ১৯৪৮ সালে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার জন্য কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অকৃতদার। বিষয়-আশয় লোভের হাতছানি তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। বাংলা উপন্যাসে তিনি একটি স্বতন্ত্র ঘরানার জন্ম দিয়েছিলেন। তার রচিত উপন্যাস তিনটি — ১) তিতাস একটি নদীর নাম ২) সাদা হাওয়া ৩) রাঙামাটি। তিতাস ও বিজয় এই দুই নদী পাড়ের মালোদের জীবনধারা বর্ণনার মাধ্যমে তিনি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করেন। উনার পূর্বে জেলেদের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে — 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় জেলে সমাজের অর্থনৈতিক চিত্র যতটা গুরুত্ব পেয়েছে — সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র ততটা পায়নি। আতিথেয়তা ও আন্তরিকতার অভাব যেন খোঁচা দেয়। তাঁর উপন্যাসের জেলেরা শুধু অর্থেই দরিদ্র নয় অন্তর সম্পদেও

দরিদ্র। অনেকটা যান্ত্রিকতার ছোঁয়া লেগেছে। জেলেদের প্রকৃত সত্ত্বা উপেক্ষিত।

এর প্রতিবাদ স্বরূপ যেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর লেখনীর দ্বারা প্রকৃত মর্ম উদ্ধারে ব্রতী হন এবং সৃষ্টি হয় তাঁর কালজয়ী উপন্যাস — 'তিতাস একটি নদীর নাম'। তাঁর রচনা 'সৌখিন মজদুরি' নয় — রূঢ় বাস্তবের স্পর্শে ছবি — যা তিতাস পাড়ের মালোদের অমূল্য দলিল।

মালো সমাজের 'মাঘমন্ডল ব্রত'র বিবরণ পাওয়া যায় উপন্যাসের শুরুতে। এ ব্রতটি হল সূর্যের আরাধনা। কুমারী মেয়েদের — তবে সমাজের সবাই অংশগ্রহণ করে আনন্দটা উৎসবের পর্যায়ে নিয়ে যায়। পুরো মাঘ মাস ব্যাপী কুমারী মেয়েরা ব্রতটি পালন করে—আর মাসের শেষদিন উদ্‌যাপন করে। ঐ দিন ঢোল-কাঁশি বাজিয়ে মেয়েদের সাথে সবাই যায়। মেয়েরা উৎসাহ উদ্দীপনায় নদীতে 'চৌয়ারি' ভাষায় আর ছেলেরা এগুলি কাড়াকাড়ি করে ধরে। 'চৌয়ারি' গুলি অত্যন্ত যত্ন সহকারে শিল্পসুষমা মন্ডিত করে বানানো হয়।

চৈত্র মাসে দোল উৎসব হয়। এ উৎসবের দেবতা কৃষ্ণ। উপন্যাসে নাড়ুগোপালকে লাল কাপড়ে বেঁধে ঝোলানো হয়েছে। গোপালের পায়ে সবাই আবীর দেয়। একে অপরের গায়ে রঙ দিয়ে রাঙিয়ে দেয়—শুধু শরীরই রাঙায় না, সাথে মনও রাঙায়। চলে মন দেওয়া-নেওয়া খেলা। দু'দলে গান হয়—রাধার দল ও কৃষ্ণর দল। বৈষ্ণবপদাবলীর ঢঙে লোকগীতি গাওয়া হয় — তারপর ক্রমশ লোকায়ত কথায় চলে আসে— স্থূল রস ও আমোদে মেতে ওঠে।

'জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ' অধ্যায়ে তিনি মালোদের ঐতিহ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। যার যেমন সাধ্য আছে সে অনুযায়ী জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহে খরচ করে। অর্থবান হলে জন্মের উৎসব এবং অন্নপ্রাসন ঘটা করে পালন করে। ছেলে হলে পাঁচ ঝাড় জোকার আর মেয়ে হলে তিন ঝাড়। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ছ'দিনের দিন আঁতুর ঘরে দোয়াত কলম রেখে দেয় — কেননা চিত্রগুপ্ত এসে শিশুর ভাগ্যলিপি লিখে দেয়। আট দিনে হয় আটকলাই। তেরো দিনে অশৌচ যায়। নাপিত ও ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে শুদ্ধ হয়। তারপর ভালো দিন দেখে স্নান যাত্রা শুরু হয়। নবজাতকের মাকে মাঝখানে নিয়ে গান গাইতে গাইতে অন্যান্য নারীরা নদীতে যায়। তিতাসকে প্রণাম করে। নবজাতককে তিনবার প্রণাম করায়, জল স্পর্শ করায়। তারপর রাধামাধবের মন্দিরে পরমান্ন ভোগের একটুখানি তুলে নবজাতকের মুখে দেয়। তারপর অন্যান্যদের দেয়। মালো সমাজে কালীপূজা হয় ধূমধাম করে। সংযম করে উপোস থেকে পূজার কাজ করে মেয়েরা। চারদিন ধরে চলে যাত্রা আর কবি গান। এদের সমাজে মনসা দেবীর পূজা বহুল প্রচারিত। শ্রাবণ মাস ব্যাপী পদ্মপুরাণ পাঠ হয় নিষ্ঠা সহকারে। মাসের শেষদিন প্রতি ঘরে পূজা হয়। 'উত্তরায়ন সংক্রান্তি' মালু সমাজে আনন্দের ঝর্ণাধারা বয়ে আনে। চালের ও মুড়ির গুঁড়ি দিয়ে প্রচুর পিঠে বানানো হয়। তিতাসের জলে স্নান সেরে

সবাই আনন্দ করে পিঠে খায়। এরপর শুরু হয় নগরকীর্তন। শেষ বেলার দিকে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হয় তিতাস নদীর তীরে বাইচ প্রদর্শন দেখতে। দেশ ভাগের পর অনেক মালো পরিবার পশ্চিমবঙ্গে চলে আসায় অদ্বৈতর পরিশ্রম আরো বেড়ে যায়। অনেকের দায় তিনি নেন। কাজের ফাঁকে গিয়ে তাদের দেখে আসতেন। 'রামধনু', 'ভাসমান' 'নয়াবসত' অংশ গুলিতে যে চিত্র তা যেন অদ্বৈতর অদ্বৈত হয়ে ওঠার নির্ভেজাল কাহিনী। জীবন যুদ্ধের সুস্পষ্ট ছবি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাইনর স্কুলে পড়ার ইতিহাস অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। সে সময়ে দলিত মানুষের পড়াশোনা প্রায় অসম্ভব। উর্ধ্বচাপ, নিম্নচাপ ও পার্শ্বচাপ—মালো সম্প্রদায়ের কয়েকজন চাঁদা তুলে তাঁকে পড়তে পাঠায়। কুমিল্লার ভদ্রশিক্ষিত জনেরা মালো সম্প্রদায়কে 'গাবর' বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য কবত। মালো সমপ্রদায় অদ্বৈতর মধ্যে মুক্তির দিশা দেখেছিল। তাদের মধ্যে কোন শিক্ষিত লোক নেই। চিঠি লেখা ও পড়া, মাছেব হিসাব রাখার জন্য অন্যের পা ধরতে হয়। অদ্বৈত অন্যান্যদের সঙ্গে রাতে মাছ ধরত। তবে অন্যরা মাছ ধরার শেষে ঘুমিয়ে পড়লেও, তিনি হ্যারিকেন জ্বেলে পড়তে বসতেন। কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তিনি কলকাতায় চলে আসেন, আর ফিরে যাননি।

যে তিতাস নদীকে কেন্দ্র করে অদ্বৈত মালোদের জীবন গাঁথা রচনা করেছেন — সেই তিতাসের চর পড়ে— যা মালোদের জীবনে এক অভিশাপ স্বরূপ। মাছ ধরা বন্ধ হয়ে যায় এবং মালোরা অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। অবশ্য দেশ ভাগ এরজন্য প্রধানত দায়ী।

কলকাতায় এসে তিনি প্রথমে 'ত্রিপুরা' নামে একটি মাসিক পত্রিকায় কাজ করেন। তারপর 'নবশক্তি' পত্রিকায় সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তিনি একে একে 'মোহাম্মদী', 'নবযুগ' 'কৃষক', 'যুগান্তর', 'আজাদ' এবং 'দেশ' পত্রিকায় যোগ দেন। বিশ্বমানের উপন্যাস — 'তিতাস একটি নদীর নাম' — মোহাম্মদীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ প্রায় ১৯৫৬ সালে। কল্পনা বর্ধন এটির ইংরেজী অনুবাদ করেন — A river called Titas নামে। Penguin এটি প্রকাশ করে ১৯৯২ সালে। নাট্যরূপ দেন উৎপল দত্ত এবং অভিনীত হয় মিনার্ভা মঞ্চে ১৯৬৩ সালে। ঋত্বিক ঘটক চলচ্চিত্রায়ণ করেন ১৯৭৩ সালে — যা অদ্বৈতকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায়।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের আর একটি স্বতন্ত্রধর্মী রচনা — 'ভারতের চিঠি পার্ল বাককে'। আমেরিকার স্বনামধন্য লেখিকা পার্ল এস্ বাক্ চিন দেশের পটভূমিতে 'Good Earth' উপন্যাস লিখে ১৯৩৮ সালে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। পার্ল বাকের এ বইটি পড়ে তিনি মুগ্ধ হন এবং এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তিনি রচনাটি লিখেন। তাঁর জীবদ্দশায় সম্ভবত ১৯৪৪ সালে রচনাটি প্রকাশিত হয়। রচনার মাধ্যমে লেখিকাকে ধন্যবাদ জানান — কারণ তিনি ছিলেন একজন অনন্য সাহিত্যিক।

গল্পগ্রন্থ 'দলবেঁধে'র মধ্যে তাঁর দুটি গল্প সংকলিত হয়েছে — 'সন্তানিকা' ও 'স্পর্শদোষ'। 'খোকাখুকু' ও 'মাসপয়লা' পত্রিকায় কিশোরদের জন্য তাঁর কবিতা ছাপা হত। গঙ্গাসাগর ভ্রমণ করে এসে 'সাগর তীর্থ' লেখাটি লেখেন এবং এটি 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়;

তাঁর অনুবাদ সাহিত্য 'জীবন তৃষা' 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া তাঁর বহু প্রবন্ধ নিবন্ধ সমসায়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই ১৯৫২ সালে রামমোহন লাইব্রেরির হল ঘরে তাঁর জীবনচর্চা শুরু হয়; তাঁর কর্মস্থল — 'আনন্দবাজার' ও 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর নিজস্ব সংগৃহীত অমূল্য গ্রন্থরাজি যা তিনি রুটিরুজির পয়সা বাঁচিয়ে বহুকষ্টে ক্রয় করেছিলেন — তা রামমোহন লাইব্রেরিতে সংগৃহীত আছে।

অদ্বৈত গবেষক শান্তনু কায়সারের জীবনীগ্রন্থ 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ' প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে ঢাকা বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে। এ গ্রন্থটি অদ্বৈতর চর্চার ক্ষেত্রে একটি মাইলস্টোন।

অদ্বৈতর জন্মস্থান তো ত্রিপুরার অদূরেই। দেরিতে হলেও ১১-১১-১৯৯৫ সালে ত্রিপুরা অদ্বৈত স্মৃতি রক্ষা কমিটি গঠিত হয়। বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা সংস্কৃতি, পর্যটন ও তফশিলী উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী অনিল সরকার মহোদয়ের উদ্যোগে ও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের প্রশ্রয়ে ও প্রেরণায় শুভ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে আরও বহু গুণীজনের অবদান তো অবশ্যই আছে। প্রথমেই যাঁদের নাম করতে হয় তাঁরা হলো — অধ্যাপক কমল কুমার সিংহ, জলধর মল্লিক, মন্ত্রী সুকুমার বর্মণ। কমলকুমার সিংহের পুস্তিকা বের হয়। রুদ্রসাগর অঞ্চলের কেমতলী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি পাঠাগার এবং কেমতলী বিদ্যালয়ের নতুন নামকরণ হয় 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়', ১৯৯৭ সালে ত্রিপুরায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ সাহিত্য পুরস্কার সূচনা করা হয়। আগরতলা বইমেলায় একদিন 'অদ্বৈত দিবস' পালন করা হয় যথাযথ মর্যাদায়। আগরতলার সন্নিকটে যোগেন্দ্রনগরে সমাজসেবী রেবতী দাসের বাড়িতে 'অদ্বৈত গবেষণা কেন্দ্র' স্থাপিত হয়েছে।

দৈনিক আরোহণ— মঙ্গলবার, ১৭ এপ্রিল ২০০৭ ইং
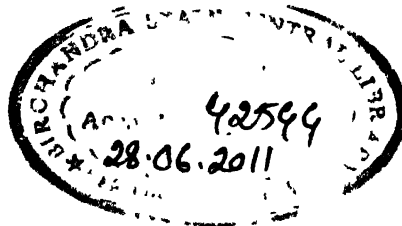
নিঃশব্দ বিপ্লবের নাম ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস

নোবেল বিজয়ী ডঃ ইউনূস এর জন্ম বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ১৯৪০ সালের ২৮ জুন। তার বাবা স্বর্ণকারের কাজ করে পরিবার চালাতেন। তিনি পড়াশোনা ভালোবাসতেন, তাই চেয়েছিলেন ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা শিখে উন্নতি করুক। ইউনূস ছোটবেলা থেকেই পড়া-শোনায় ভালো ছিলেন — তদুপরি বাবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল— তাতে পড়াশোনা হেরফের হবার জো ছিল না। ইউনূস ডানপিটে স্বভাবের ছিলেন — বাবা বাড়িতে প্রবেশ করেছেন - টের পেয়েই বই খুলে বসে যেতেন। অবশ্য পড়ার বই-এর চেয়ে গল্পের বই-ই বেশি থাকতো তাঁর পাঠ্য তালিকায়। মা সোফিয়া খাতুন ছিলেন ধর্মপ্রাণা মহিলা। গরীবের দুঃখে তিনি কষ্ট পেতেন। যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। ছেলেমেয়েদেরও তিনি সে শিক্ষা দিয়েছিলেন। গরীবের ব্যথায় তার মনপ্রাণ কেঁদে উঠত। তিনি ছেলেমেয়েদের বলতেন গরীবদের কখনো বিমুখ না করতে। মায়ের এ কথাগুলি তিনি সবসময় মাথায় রেখেছেন।

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের পড়া শেষ করে চট্টগ্রাম কলেজে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম এ পাশ করেন। এরপর আমেরিকার টেনেসির ভ্যানডার বিল্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে ১৯৬৯ সালে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন মিডল টেনেসি স্টেট ইউনিভারসিটিতে। ইতিমধে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং নিজের শহর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন।

তাঁর মন ও চোখ সবসময় আলাদা বিশ্লেষণী মাত্রা নিয়ে কাজ করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয় ১৯৭১ সালে। যুদ্ধের দগদগে ক্ষতচিহ্নের উপর দেখা দেয় নিদারুণ দুর্ভিক্ষ ১৯৭৪ সালে। বিশেষত গ্রামাঞ্চলের মানুষ খাবারের সন্ধানে শহরে এসে ভিড় করতে লাগলো। শহরের মানুষ তাদের তাড়াতে পারলে বাঁচে। সে সময় বহু মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি দেখে তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়েন। ডঃ ইউনূস এর মাথায় এসব গরীবদের জন্য স্থায়ী উপকার কিভাবে করা যায় — তার চিন্তা ভাবনা করে চলেছেন। তিনি অর্থনীতি অধ্যাপক। তা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে একটা নিজস্বতা ছিল। নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও উদ্যমের দ্বারা তিনি Micro-Credit বা স্বল্প ঋণ চালু করেন পরীক্ষামূলকভাবে। মহৎ ব্যক্তিদের চিন্তা চেতনায় একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় — তাই আবার প্রমাণিত হল। মহাত্মা গান্ধীর 'গ্রাম

স্বরাজ' আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পল্লী সমাজ' এর-ই যেন তিনি বাস্তব রূপ দিলেন। আর এই বাস্তব অবয়বে আলো ফেলল নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তি। ডঃ মুহাম্মদ বলেছিলেন, "অশ্রদ্ধা আসে আমাদের এই লেখাপড়ার উপর, মানুষের কাজে না লাগলে লেখাপড়ার বড়াই করে লাভ কি?"

তিনি লক্ষ্য করেছিলেন পাশের জোবরা গ্রামে মোড়া-বুনিয়ে মহিলাদের পাঁচ টাকা নেই বলে সারা দিনে তাদের রোজগার মাত্র দশ আনা হয় মহাজনের সুদ মিটিয়ে। তিনি প্রথম পদক্ষেপে গ্রামের প্রতি মহিলাকে দশ টাকা করে ঋণ দেন — তাতে গ্রামের চেহারাই পাল্টে যায়।

১৯৭৬ সালের আগষ্ট মাসে তিনি জনতা ব্যাঙ্কের বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় গিয়েছিলেন জোবরার কয়েকজন ভূমিহীন ব্যক্তির জন্য ঋণের ব্যবস্থা করতে। ঋণের ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে হয়নি। বহুদিন দরবার করার পর তিনি ব্যক্তিগতভাবে জামিনদার হয়ে ঋণের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই প্রথম অভিজ্ঞতা হল ব্যাঙ্ক বিনা জামানতে ঋণ দেয় না। সুতরাং ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর পক্ষে ঋণ পাওয়া সম্ভব না।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনা জামানতে ঋণ দেওয়ার জন্য তিনি একটি আলাদা শাখা খোলার প্রস্তাব দিলেন জোবরায়। কৃষি ছাড়া অন্যান্য খাতেও যাতে ঋণ দেওয়া যায়। কিন্তু কৃষি ব্যাঙ্ক অন্যান্য খাতে ঋণ দিতে অসম্মত। তিনি প্রস্তাব দিলেন নাম পাল্টে 'গ্রামীণ ব্যাঙ্ক' করার জন্য। এসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জোবরার একটি সাব অফিস খোলা হল। তিনি এর নাম দিলেন 'পরীক্ষামূলক গ্রামীণ শাখা'। ব্যাঙ্ক কর্মীদের মিটিং-এ আরো একটি নতুন ব্যাঙ্ক করার প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায় স্বয়ং অর্থমন্ত্রী জনাম মুহিতের সভাপতিত্বে। তবে সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। পরবর্তী সময় ডঃ ইউনূস পুরোপুরি ভূমিহীনদের মালিকানায় না করে সরকারের সঙ্গে মিলে যৌথ মালিকানায় ব্যাঙ্ক করার প্রস্তাব নিয়ে অর্থমন্ত্রীর নিকট যান। মালিকানার প্রস্তাব ছিল চল্লিশ শতাংশ সরকারের আর ষাট শতাংশ ভূমিহীনদের। অর্থমন্ত্রী ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রস্তাবটি মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর পরামর্শ দেন। যেই কথা সেই কাজ। কাগজপত্র তৈরী করে পাঠিয়ে দিলেন। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মন্ত্রণালয় থেকে অধ্যাদেশ জারী হল। তবে মালিকানার ভাগ পাল্টে গেল। সরকারের ষাট ভাগ আর ভূমিহীনদের চল্লিশ ভাগ। পরবর্তী সময়ে সরকারের ভূমিহীনদের শেয়ার বিক্রির সুযোগের কথা বলে রাখলেন।

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রকল্প থেকে ব্যাঙ্কে রূপ নিল ৮৩-র দুই অক্টোবর। আর ৮৬-র জুলাইতে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অধ্যাদেশে এক সংশোধনের ফলে মালিকানা হল পঁচিশ ভাগ সরকারের আর পঁচাত্তর ভাগ গরীব মানুষের। ছিয়াশি সালের সমাপ্তিতে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা হয়েছিল ২৯৫টি। পাঁচ হাজারেরও বেশী গ্রামে দুই লক্ষ তিরিশ হাজার ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে সর্বমোট একশত

পঞ্চাশ কোটি ঋণ বিতরণ হয়। সে সময়ে ঋণগ্রহীতার তিয়াত্তর শতাংশই ছিল মহিলা। মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ চৌদ্দ কোটি টাকা (বাংলাদেশী), ঋণ পরিশোধের হার আটানব্বই শতাংশ।

অণু-ঋণ দেওয়ার শর্ত হল কোন ভোগ্য পণ্য কেনার জন্য ঋণ দেওয়া হয় না। দেওয়া হয় কোন উৎপাদন ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য। হাঁস-মুরগি পালন, সব্জী চাষ, মাছ চাষ বা এ ধরনের কোন ক্ষুদ্র প্রকল্প যা গ্রামের অশিক্ষিত মহিলাগণ করতে পারেন। উদ্দেশ্য, নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ম্ভর করে তোলা যা পরোক্ষভাবে পরিবারকে স্বয়ম্ভর করে। গ্রহীতা নিয়মিত আয় করে এবং ঋণও শোধ করতে পারে। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বন্ধকযোগ্য সম্পত্তি ছাড়াই ঋণ দেয়, কিন্তু ঋণশোধের পরিমাণ ৯৮.৪৫ শতাংশ; পাঁচ জনের দলকে ঋণ শোধের এক একটি একক ধরা হয়, ফলে ঋণ শোধে একের গাফিলতি অপরের ঘাড়ে এসে বর্তায়। আর জামানত — মান ইজ্জত। নিয়মকানুন এবং অঙ্গীকারপত্র সর্বসমক্ষে পড়া হয়।

বাংলাদেশে শহরের সনাতন ব্যাঙ্কগুলি মেয়েদের কাছ থেকে সঞ্চয় জমা রাখে— কিন্তু ঋণ দেয় না— আর যদিও দেয় তবে স্বামীর সঙ্গে সওয়াল জবাব করে দেয়। কিন্তু ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক নারীকে প্রথমেই অর্থনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। তাতে পরিবারে এবং সমাজে নারীদের ভূমিকার পরিবর্তন এসেছে। ওরা নানা ধরনের নীতি নির্ধারণে অংশ নিতে পারছে। অর্থনীতিতে স্বয়ম্ভর হওয়ার ফলে ওদের মুখে কথা ফুটেছে—আর অবলা থাকছে না।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও সন্তান পালন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেছে। জয়নাল নামের এক যুবক কথা প্রসঙ্গে ডঃ ইউনূসকে বলেছিল—আগে রাগ হলে বৌকে গালাগাল দিয়ে এবং মারধর করে শরীরের ঝাল মিটাত স্বামীরা — আর এখন এসব করলে পাড়ার অন্য মেয়েরা দলবেঁধে এসে এর প্রতিবাদ করে। উল্টো গালাগাল দিয়ে যায়। নারীর স্বাবলম্বন বা অর্থনীতিতে প্রবেশের ফলে পরিবারের সামগ্রিক উন্নতি যত সহজে হয়েছে — শুধু পুরুষের আয়ের দ্বারা তা হয় না। তারপর গৃহঋণ প্রকল্পের দ্বারা স্ত্রীরাই হয়ে উঠে গৃহের আইনী স্বত্বাধিকারী, তাতে মেয়েদের জীবনে নিশ্চয়তা ফিরে এসেছে। স্ত্রী নির্যাতন ও তালাক এর মাত্রা অবিস্মরণীয় ভাবে কমেছে। বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গৃহকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিচার করেনি — বিচার করেছে আশ্রয় হিসেবে যেখানে উৎপাদিকা বসে তার কর্মকাণ্ড চালাবে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই আমরা দেখে এসেছি এর পট পরিবর্তন হচ্ছে কিছু দিন অন্তর অন্তর। একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা লেগেই আছে। ফলে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এরও নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে বার বার। সমাজের পুরুষরা বলেছে — এ ব্যাঙ্ক নারীদের চরিত্র নষ্ট করবে, মৌলবীরা বলেছে— প্রথমে মিশনারীদের মতো টাকা ঢালবে — তারপর ধর্ম হরণ করবে।

দক্ষিণপন্থী ভেবেছে ডঃ ইউনূস বামপন্থী, তিনি গরীবদের হাত করছেন। আর বামপন্থীরা

মনে করেছে আমেরিকার টাকা খাইয়ে গরীবদের বিপ্লবের পথ থেকে মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ইউনূস অত্যন্ত ধৈর্য এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে গেছেন। কারুর কথায় তিনি বিচলিত হননি, ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেনি। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন ক্রমে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গরীবদের ব্যাঙ্ক থেকে হয়ে উঠবে প্রাক্তন গরীবদের ব্যাঙ্ক। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সবসময়ই গ্রামের মানুষের পাশে থাকবে। তাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির দিশারী হয়ে থাকবে। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এর আয় ও গ্রহীতার সংখ্যা বাড়ছে বই কমছে না — এ ধারা অটুট থাকবে। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রায়ত্ত অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি ঋণের বোঝা বইতে বইতে মরা গাঙের মতো অবস্থা। সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঋণ ফেরৎ দিচ্ছে না। সরকারও রাঘব বোয়ালদের কাছ থেকে ঋণের টাকা আদায় করতে পারছে না। তাতে সাধারণ গ্রাহকদের নানা সুযোগ-সুবিধা কমে যাচ্ছে।

২০০৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার যৌথভাবে ডঃ মহম্মদ ইউনূস এবং তাঁর স্বপ্নের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক পায়। এই উপমহাদেশের ডঃ অমর্ত্য সেন ১৯৯৮ সালে অর্থনীতির জন্য নোবেল পুরস্কার পান। এরপর থেকেই অনেকে অনুমান করেছিলেন ডঃ ইউনূসও শীঘ্রই নোবেল পুরস্কার পাবেন। কিন্তু সময় লেগে গেল দীর্ঘ আট বৎসর। তবে তত্ত্বের জন্য নয়,কাজের জন্য। যে কাজ বিশ্বশান্তির অন্যতম দিশারী। ১৯১ জন প্রার্থীর মধ্যে বাছাইয়ে তিনি শীর্ষে চলে আসেন। পুরস্কারের অর্থমূল্য তের লক্ষ ষাট হাজার ডলার যা সমান ভাগ হয়ে যায় দুই প্রাপকের মধ্যে।

পুরস্কার প্রাপ্তির খবরে সাংবাদিক-এর প্রশ্নের জবাবে ডঃ মহম্মদ ইউনূস বলেন, "........আমাদের দায়িত্ব অনেক বাড়িয়ে দিল। এখন আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব বাংলাদেশ তথা পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টা করা। এই উদ্দেশ্যেই নতুন করে জোরদার লড়াই শুরু করতে চাই। এর ফলে অধিকাংশ দেশে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করার চেষ্টা আরো প্রবল হবে। কাজটা কঠিন হতে পারে,কিন্তু রোমাঞ্চকর। এই পুরস্কার আমার জেদ বাড়িয়ে দিয়েছে। এতদিন যে কাজ করেছি,তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।"

১৯৮৪ সালে ফিলিপিন্সের ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পান। তাঁর মহান কীর্তি বিশ্বে সাড়া ফেলেছে। নিন্দুকে নিন্দা করলেও অনেক দেশই তাঁকে চিনতে পেরেছে। ভারত প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এই মহান ব্যক্তিত্বকে ১৯৯৯ সালে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় পুরস্কার দিয়ে ধন্য হয়েছে। ১৯৯৯ সালে শারোদোৎসবে আনন্দ বাজার পত্রিকার বিশেষ ক্রোড়পত্রে বিংশ শতাব্দীর সেরা দশ বাঙালির মধ্যে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করে তাঁকে সম্মান জানানো হয়েছিল।

ডঃ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণদানের মডেল আমেরিকা থেকে উগান্ডা পর্যন্ত একশটিরও বেশি দেশে চালু হয়েছে। কমিউনিজম দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। মহম্মদ ইউনূস এ কাজে হাত বাড়িয়ে দিতে চান উত্তর কোরিয়ার দিকে। তিনি ডাক পেয়েছেন

চিন ও কিউবা থেকেও। অর্থাৎ তাঁর কর্মকান্ড সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে অনতিবিলম্বে। 'মাইক্রোক্রেডিট' এর মাধ্যমে গরীব গ্রামবাসীকে স্বনির্ভর করে তুলবেন। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডঃ মহম্মদ ইউনূসকে ডঃ অব্ ল ডিগ্রি প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়া হয় ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে।

১৮৯৬ খ্রী-এর দশ ডিসেম্বর শিল্পপতি আলফ্রেড নোবেল এর মৃত্যু হয়। সে সময় সুইডেন ও নরওয়ে সংযুক্ত ছিল। প্রতি বছর দশ ডিসেম্বর অর্থাৎ অ্যালফ্রেড নোবেল-এর মৃত্যুবার্ষিকীতে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। স্টকহলমে অন্য পুরস্কারগুলি বিতরণ করা হলেও নোবেল শান্তি পুরস্কারটি ওসলোতে দেওয়া হয়। ৬৫ বছর বয়স্ক মহম্মদ ইউনূস প্রথম বাংলাদেশে নোবেল পুরস্কার পেলেন। নোবেল বিজয়ের সংবাদ পেয়ে স্ত্রী আফরেজি ইউনূস এবং মেয়ে দিনাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির সামনে লনে বেরিয়ে আসেন এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ঢাকার শত শত মানুষ নোবেল জয়ীকে পুস্প স্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানান। তিনি আপ্লুত,তাঁর চোখে জল চলে আসে।

নোবেল জয়ের খবরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং বন্ধু ডঃ ইউনূসকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন এবং প্রশংসা জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম দাশগুপ্ত ওপারের অর্থনীতিবিদ্ বন্ধু অধ্যাপক ডঃ ইউনূসের বিশ্বজয়ের খবরে আপ্লুত। দেশ বিদেশ থেকে জ্ঞানী গুণীগণ তাঁকে অগুনতি অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন।

ডঃ মহম্মদ ইউনূসের বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে এবং বিশ্ব শান্তি সম্পর্কে ধারণা খুবই সুস্পষ্ট—যা সকল রাষ্ট্রনায়কগণ বা গণতান্ত্রিক সরকারগণ অনুসরণ করতে পারেন। দেশে দেশে যত সমস্যা রয়েছে সীমানা নিয়ে,জল নিয়ে,মাছ ধরার অঞ্চল নিয়ে—সবই আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যাবে বলে—তিনি বিশ্বাস করেন। হিংসার পথ,কুট রাজনীতির পথ পরিহার করে সুস্থ স্বাভাবিক চিন্তা,উন্নতির চিন্তা করলেই সমস্যা লাঘব হবে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি খরচ করে জেতা যাবেনা। মূল সমস্যা নির্ণয় ও তা উৎপাটন করা দরকার। নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের দুঃখ,ক্ষোভ,বেদনা বুঝতে হবে। একটা লোক প্লাস্টিক বোমা শরীরে বেঁধে আত্মাহুতি কেন দেবে? নিপীড়ন আর বৈষম্যই এসব কিছুর জন্য দায়ী।

পারমাণবিক বোমা তৈরী করা ও প্রয়োগ করা আত্মহননের নামান্তর। তাঁর মতে একবিংশ শতাব্দীতে অর্থনীতিতে একটা ঢেউ এসেছিল। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতি ও আবিষ্কার—মানুষকে আশার আলো দেখিয়েছিল—এর মধ্যে জর্জ বুশ বললেন—সন্ত্রাসবাদকে রুখতে হবে—তাই যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। বললেন সন্ত্রাসবাদকে পরাজিত করতে হবে—সারা বিশ্ব স্তম্ভিত। তিনি বলেছেন, বিশ্বসংগঠন হিসেবে জাতি সংঘকে শক্তিশালী করা দরকার। জাতিসংঘ ক্ষমতা-হৃত। যূথবদ্ধ হবার ক্রিয়া চলছে—ইউরোপ এক হল,আসিয়ান এক হল,লাতিন আমেরিকা অর্থনৈতিকভাবে এক হতে চাইছে। এর মধ্যে কেউ যদি বলে—আমি যা ইচ্ছে তা-ই করব-তবে

সব পন্ড হবার জোগাড়। বিশ্বের সব রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানগণ ২০০০ সালে একত্রিত হয়ে ঠিক করেছিলেন মিলেনিয়াম গোল (Milleniam Goal)। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার হিড়িকে ও বীভৎসতায় বিশ্ববাসীর দৃষ্টি সেদিক থেকে সরে গেল। বিশ্ব সামনের দিকে না গিয়ে এখন পেছনের দিকে হাঁটছে। অবিশ্বাস কোন্ জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে—বিমানে টুথপেস্ট ও ওষুধ নিয়ে ওঠা বারণ।

তিনি বিশ্বাস করেন—হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। শান্তির প্রক্রিয়া আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চালিয়ে যেতে হবে। সার্ক অঞ্চলের যে অর্থনৈতিক কাঠামো—তাতে এককভাবে কেউ সুবিধা করতে পারবেনা। আসিয়ানরা যদি ইউরোপের মতো সবাই এক জায়গায় আসতে পারি এবং সীমান্ত,পাসপোর্ট ভিসা—এসবকে গুরুত্ব না দিই—তবে আসিয়ান বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান-প্রদান,ব্যবসা উন্মুক্ত হবে এবং সবারই সুবিধা হবে।

আর বাজার দখল নিয়ে অহেতুক ভীতি। তিনি মনে করেন ছোট্ট বাংলাদেশ যদি ভারতে বা পাকিস্তানে বাজার পায়—তাতে বাংলাদেশেরই লাভ। বিশাল বাজারে যদি কুড়িটা জিনিস বিক্রি করা যায় তবে বাংলাদেশের প্রাচুর্যের অভাব থাকবেনা। মোজা বা আলপিন সস্তা হলেও ফেলনা নয়। এগুলি থেকে কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা করা যাবে।

এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। সন্দেহের প্রাচীর দেওয়া হচ্ছে। এক দেশের নাগরিককে অপর দেশে যেতে দেওয়া হচ্ছে না সহজভাবে। কি আছে যে নিয়ে যাবে! চট্টগ্রাম বন্দর উন্মুক্ত করার কথা বলা হচ্ছে। তাতে শুধু বাংলাদেশ কেন ভারত, নেপাল,ভুটান এবং চিনদেশ উপকৃত হবে। তাতে প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে ব্যবসা অনেক সহজ হয়ে যাবে—সবাই লাভবান হবে। হারাবার কিছু নেই—পাবারই কথা, বাংলাদেশ যদি চিন ও ভারত—এই দুই বিরাট দেশকে নিয়ে চলতে পারে—তবে বাংলাদেশেরই সোনায় সোহাগা হবে। কোন দেশ যদি মনে করে আমার দেশে লোক ঢুকিয়ে অবৈধ কাজ করাবে তবে তার সঙ্গে আমার সর্ম্পক রাখার প্রয়োজন নেই। কোন দেশের যদি লোকবল কম থাকে এবং লোক চায়—তাকে দিতে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়।

রাজনীতি আমাদের বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কি দেশীয় ক্ষেত্রে—কি আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে। গালিগালাজ করা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিরর্থক। ডঃ ইউনুসের মতে এই রাজনীতির ডামাডোল থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র বিকল্প পথ বা উপায় হচ্ছে মানুষ। রাজনীতি আমাদের পথ আটকে দিয়েছে। পথ পরিষ্কার করার মতো রাজনীতি সৃষ্টি হচ্ছে না। কিন্তু একদিন মানুষই তা সৃষ্টি করবে। কারণ মানুষের সে শক্তি আছে।

বিভিন্ন রাজনীতিকে আশ্রয় করে মানুষ পরস্পরে খেয়োখেয়ি করে। একটা জাতি মারামারি আর কোন্দলে জড়িয়ে পড়েছে,কিন্তু হঠাৎ করে দেখা গেল সব মানুষ গলাগলি করে ফূর্তি করছে দেশের নোবেল প্রাপ্তির খবরে। এই যে উদ্দীপনা, ঐক্য—এটাকে কাজে লাগাতে

হবে। তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন তিনি রাজনীতির লোক নন—তাঁর পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। আর করতে হলে শূণ্য থেকে আবার শুরু করতে হবে। রাজনীতিতে যাওয়ার তাঁর কোন ইচ্ছে নেই। সুখ-দুঃখের কথা মানুষকে বোঝাতে পারলে ও উদ্বুদ্ধ করতে পারলেই হল।

১৩ই অক্টোবর ২০০৬ ইং নোবেল প্রাপ্তির ঘোষণার পর থেকে বিভিন্ন পত্রিকায় এবং ম্যাগাজিনে এই মহান ব্যক্তি এবং তাঁর সৃষ্ট গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও অণুঋণ প্রকল্প সর্ম্পকে ঢালাও প্রচার চলছে লেখালেখির মাধ্যমে। দেশ-বিদেশের মানুষের একেবারে কাছে চলে এসেছে। যদিও তাঁর অণুঋণ প্রকল্প পূর্বেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গ্রহণ করা হয়েছে। এখন ডাক আসছে বিভিন্ন দেশ থেকে। বাংলাদেশে গ্রামীণ মহিলাগণ অণুঋণ প্রকল্প-এর অংশীদার হয়ে আর্থিক স্বয়ম্ভর হয়ে উঠেছে—নিজ নিজ পরিবারকে খেয়ে বাঁচার পথ দেখিয়েছে। পাশাপাশি একটা কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে—তাঁদের নৈতিক মান উন্নত হয়েছে। ঋণ-সততা দেখিয়েছেন—এটা একটা শিক্ষা। 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখায়'—এ শাশ্বত বাণীর বাস্তবায়ন। একজন মহিলা পরিবারের সামগ্রিক উন্নতি চান এবং এটা কিভাবে করতে হবে তা বোঝেন। তাঁদের ত্যাগ তিতিক্ষা সীমাহীন। নারীদের সততা ও নিষ্ঠার কথা বারবারই পণ্ডিতগণ উচ্চারণ করেছেন। বাংলাদেশের দরিদ্র অশিক্ষিত নারীগণ তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে আবাব দেখালেন। পুরুষশাসিত সমাজে যাঁরা কোন মর্যাদা পাননা—অবজ্ঞা অবহেলার শিকার, তাঁবা আজ আলোচনাব কেন্দ্রবিন্দু। এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে মহান পরিত্রাতা ইউনূস সাহেব-এব কৃতকর্মে। তাঁকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানাই। তিনি দীর্ঘদিন বাঁচুন এবং নিপীড়িত শোষিত নাবীদেব জন্য আরো করুন। গরীবদের বাঁচতে সাহায্য করুন।

দৈনিক সংবাদ— ২৯-৩০ অক্টোবর, ২০০৬ইং

দেশমাতৃকার কৃতী সন্তান সুভাষচন্দ্র বসু

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্ম একদা উড়িষ্যার রাজধানী কটক শহরে। বাবার প্রাসাদোপম বাড়িতে ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী, শনিবার বেলা ১২টা বেজে ১৪ মিনিটে তাঁর জন্ম। নবজাতকের নাম রাখা হয় 'সুভাষ'। বাড়িতে সবাই তাঁকে 'সুবি' বলে ডাকত। তিনি ভায়েদের মধ্যে ষষ্ঠ, আর পিতামাতার নবম সন্তান ছিলেন।

তাঁর পিতা জানকীনাথ বসু ছিলেন কটকের সর্বগণ্যমান্য আইন ব্যবসায়ী, সরকারী উকিল। উপার্জনও ছিল প্রচুর। কিন্তু অর্জিত অর্থকে তিনি বাঁধ দিয়ে আটকে রাখেননি। নদীর স্রোতের মতো তা দু'ধারের তীর ভূমিকে শস্যশ্যামল করে দিয়েছিল। পরিবারের বাইরে যে একটা জগৎ আছে যার নাম সমাজ তাকে তিনি দু'হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষামূলক ও জনহিতকর অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর আর্থিক ও আত্মিক যোগ ছিল। কলকাতা থেকে আইনের ডিগ্রি নিয়ে তিনি কটক বারে যোগদান করেছিলেন। উড়িষ্যাবাসীদের আত্মীয়জ্ঞানে হৃদয়ের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তিনি একদিকে উদার ছিলেন। অন্যদিকে আবার তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। সরকারী চাকরি করলেও সরকারের পায়ে দাসখৎ লিখে দেননি। জেলা শাসকের সঙ্গে মত দ্বৈধতার দরুণ সরকারী উকিল ও পাবলিক প্রসিকিউটরের পদ থেকে ইস্তফা দেন ১৯১৭ সালে। ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহের জন্য ব্রিটিশ সরকারের দমন-পীড়ন নীতির প্রতিবাদে 'রায়বাহাদুর' খেতাব ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন অনায়াসে।

ব্রাহ্মণ সমাজের প্রভাবে সে সময়ে আদর্শবাদী তরুণ সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে কেশব চন্দ্র সেন ব্রাহ্মণ সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। জানকীনাথের আদর্শ পুরুষ ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ব্রাহ্মধর্মে গভীর অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও তাতে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেননি।

সুভাষ চন্দ্রের মা ছিলেন হাটখোলা দত্ত পরিবারের মেয়ে, পিতা গঙ্গাচরণ দত্ত। সুভাষ চন্দ্রের মায়ের নাম প্রভাবতী দেবী। তিনি ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্না মহিলা। বাড়ির তিনিই ছিলেন সর্বময়ী কর্ত্রী। স্বামী জানকীনাথ সবসময় বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। কাজেই তাঁকে ঘর সংসার সামলাতে হতো। বাঙলার মায়েদের চরম বিকাশ মাতৃত্বে। কিন্তু প্রভাবতী দেবীর চরম বিকাশ গৃহিনী বা গৃহকর্ত্রী রূপে।

সুভাষচন্দ্রের মায়ের কাছে যশোধারূপের চেয়ে অন্নপূর্ণা রূপটিই বেশী ফুটে উঠেছিলো। কারণ নিজের ছেলেমেয়ের সংখ্যা চৌদ্দটি আর আশ্রিত আত্মীয় স্বজনের সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না। তার উপর অতিথি অভ্যাগত তো ছিলই। সুতরাং ছেলেমেয়েদের নিয়ে সোহাগ করবার অবসর তাঁর কোথায়? ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়েছে ঝি-চাকরদের কাছেই। সুভাষচন্দ্রের একজন ধাইমা ছিলেন, নাম 'সারদা'। ছেলেবেলার ভৃত্যরাজতন্ত্রের কথা রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ আছে। তাঁদের দাপটের কথা রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেননি। তবে সুভাষ চন্দ্রের ধাইমা সারদা হৃদয়হীনা ছিলেন না। এই 'সারদা' তাঁকে গর্ভধারিনী মায়ের মতোই সেবায় যত্নে অন্তরের সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে মানুষ করেছিলেন। আর সুভাষচন্দ্রও চিরকাল সেই শুদ্রানী মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবনত ছিলেন।

তবে শিশু সুভাষ চন্দ্রের মন কিছুটা অতৃপ্ত ছিল। পালিতা মায়ের ভালবাসা জৈবস্নেহের পরিতৃপ্তি ও পরিপুষ্টি ঘটাতে পারে, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে ক্ষুধার্ত থেকে যায়। এটা খুবই স্বাভাবিক সুভাষচন্দ্রের মা প্রভাবতী দেবী বৃহৎ সংসারের বোঝা মাথায় নিয়ে দূর থেকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন যাতে ছেলেমেয়েদের কোন প্রকার অবহেলা না হয়। তাদের মঙ্গল চিন্তায় তিনি সদা জাগ্রত থাকতেন। খুব কাছে থেকে মা শিশুকে দেখতে পাননি বা শিশু মাকে দেখার সুযোগ হয়নি। তিনি ছিলেন অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মতো।

সুভাষচন্দ্র যেদিন ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য অদম্য আকাঙ্খা বুকে চেপে দেশ ত্যাগ করেন সেদিন মায়ের হৃদয়ের হাহাকার অকল্পনীয়। সব ছেড়ে ছেলে দেশান্তরী হয়েছে — ছেলের জন্য অজানা আশঙ্কায় তিনি মুহ্যমান — কি করে শান্তি পাবেন বুঝেন না। গঙ্গায় ঝাঁপ দেবেন না কি করবেন ঠিক করতে পারেন না। 'নিমাই সন্ন্যাস' কীর্তন শুনতে গিয়ে তিনি ডুঁকরে কেঁদে উঠতেন — 'আমার নিমাই কই' বলে। প্রভাবতী দেবী ধর্মপ্রাণা ছিলেন। ছোটবেলা সুভাষচন্দ্রকে তিনি 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়ে শুনাতেন। সেটা ওনার খুব ভালো লাগতো। সে থেকে সুভাষ চন্দ্রের জীবনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব। সুভাষচন্দ্র তাঁর মা-বাবাকে খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তাঁদের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অটল গাম্ভীর্য তাঁর মনে একটা ভয়ের ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। কিছুটা দূরত্বও সৃষ্টি হয়েছিল। যাই হোক ১৯০২ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হতে চলেছে তখন তাঁকে স্কুলে ভর্তি করা ঠিক হয়। প্রটেস্টান্ট ইউরোপীয় স্কুল। সুভাষের দাদা-দিদিরাও এ স্কুলে পড়ত এবং সবাই ক্লাসে শীর্ষ স্থানটি দখল করে থাকত। কাজে কাজেই স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁদের সম্পর্কে একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। স্কুলে যাবার প্রথম দিন তাঁর দু'জন কাকা সহ তিনজন স্কুলে যাবে, গাড়িও আসল — কিন্তু সুভাষ পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পান। কাজেই তাঁর সেদিন স্কুলে যাওয়া হয়নি। দু'জন কাকা যথারীতি স্কুলে গেলেন। আর তিনি মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বিছানায় শুয়ে থাকতে বাধ্য হলেন। প্রটেস্টান্ট ইউরোপিয়ান স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ প্রায় সবাই ছিলেন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। তবে প্রধান

শিক্ষক ও তাঁর স্ত্রী দু'জন ছিলেন খাঁটি ইংরেজ। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি ভারতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতির চেয়ে ভিন্নতর ছিল। এখানে উন্নততর শিক্ষাদান পদ্ধতি। ব্যক্তিগত যত্ন ও নিষ্ঠা এবং নিয়মিত অধ্যাপনা — এসব কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা নামক বৈতরণী — অনায়াসে পার হয়ে যেত। ভারতীয় বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক মুখ্য করে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর বিরাট বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হত। আর পরীক্ষাটা হয়ে দাঁড়াত বিভীষিকা। সুভাষচন্দ্র যখন প্রটেস্টান্ট ইউরোপীয়ান স্কুলে ভর্তি হন তখন তিনি ইংরেজি বর্ণমালা শিখেছেন মাত্র। সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের মধ্যে মিস্ সারা লরেন্সকে তিনি অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলেন এবং তিনিও তাঁকে অসীম স্নেহে বরণ করে নিয়েছিলেন। তাঁর কাছেই তিনি ইংরেজির ভিত তৈরী করেন। পরবর্তী জীবনে আই সি এস পরীক্ষায় ইংল্যান্ডের বাঘা বাঘা ছাত্রদের পরাস্ত করে ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বর পান এবং এ কৃতিত্বের জন্য মহিয়সী শিক্ষিকা মিস্ সারা লরেন্সের নাম তিনি কৃতজ্ঞ চিত্তে পরবর্তী সময়ে স্মরণ করেছেন। প্রটেস্টান্ট ইউরোপীয়ান স্কুলে ক্লাসে তিনি সেরা ছাত্র ছিলেন। তবে খেলাধূলায় বা শরীর চর্চায় তিনি পিছিয়ে ছিলেন। কাজেই তিনি সেরা হয়েও সেরার মর্যাদা পাননি। ১৯০২ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত মোট সাত বৎসর পড়াশোনা করে তিনি ১৯০৯ সালে বেরিয়ে যান। তবে খ্রিষ্টান মিশনারী স্কুলের সামগ্রিক চালচিত্রে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে বের হলেন না। কিশোর মনে নানা প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল—মীমাংসা তিনি পাননি। কাজেই যে আত্ম প্রত্যয়হীন অবস্থায় প্রথমে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন সেরূপ আত্মপ্রত্যয়হীন মন নিয়েই সাদামাটা ভাবে স্কুল থেকে বিদায় নিলেন।

১৯০৯ সালের ৬ জানুয়ারী কটকের কাঠজুড়ি নদীর তীরে র‍্যাভেন্স কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন এবং নতুন ক্লাসে প্রবেশ করেন। এ নতুন স্কুল তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। ক্লাসের মধ্যে তিনি সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হলেন। তিনি যথাযথ মর্যাদা পেলেন — যা পি ই স্কুলে পান নি। প্রধান শিক্ষক বেণী মাধব দাশ ও অন্যান্য শিক্ষকগণ ভাবতেন তিনি স্কুলের নাম উজ্জ্বল করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম বা দ্বিতীয় হতে পারেন। স্কুলে প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাশের চলাফেরা, স্কুল পরিচালনা ইত্যাদি তাঁকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতে থাকে। সুভাষচন্দ্র তখন তেরো বছরের। তাঁর মনে বৃহত্তর আদর্শের দীপ — তিনি জ্বেলে দিলেন। বেণীমাধব দাশ শুধু শিক্ষাদাতা নন তিনি দীক্ষাদাতাও বটে। সুভাষচন্দ্র অধিকতর উৎসাহে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে লাগলেন এবং বিদ্যালয়ের প্রতিটি বিষয়ের পরীক্ষায় তাঁর কৃতিত্ব ধাপে ধাপে প্রমাণ করে যেতে লাগলেন।

বেণী মাধব ছিলেন বিরল জাতের শিক্ষক। তিনি মনে করতেন ছাত্রের শুধু বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করলেই চলবে না। পাশাপাশি তার ব্যক্তিত্বকে উদ্বুদ্ধ করা চাই। তিনি শিক্ষকতাকে ভগবানের পূজা মনে করতেন। ছাত্রদের মধ্যে অনাগত মহামানব প্রত্যক্ষ করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হতেন। তাঁদের মধ্যে হয়তো অনাগত রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র

সেন লুকিয়ে আছে। সুতরাং তাদের প্রতিভার কলিকে বিকশিত হতে সাহায্য করাই ওনার কাজ। অর্থাৎ ফুল বাগানের মালির যা কাজ তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। চাকরির সুবাদে তিনি বিভিন্ন স্কুলে কাজ করেছেন—র্যাভেন্স কলেজিয়েট স্কুল, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল, রাণী ভবানী স্কুল সর্বক্ষেত্রেই তিনি নিজস্ব ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে ও কর্ম প্রণালির দ্বারা ভক্তমণ্ডলী তৈরী করেছিলেন। তাঁর উদার ও উষ্ণ হৃদয়ের স্পর্শে ছাত্ররা তার পরিবারের অন্দরমহলেও প্রবেশের সুযোগ পেত। কাজেই জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি দেশপ্রেমের দীক্ষা পেতে কোন অসুবিধা হত না। তাঁর ভাবশিষ্যরা বিভিন্নভাবে দেশসেবার কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। তাঁরই সুযোগ্যা কন্যা বীণা দাশ পিস্তল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বাংলার লাট এন্ডারসনের উপর। এর পেছনে অবশ্যই তার পিতা শ্রদ্ধেয় বেণীমাধব দাশের আশীর্বাদ ছিল। দেশপ্রেমিক শিক্ষক বেণীমাধব দাশের চোখেই সর্বপ্রথম সুভাষচন্দ্র দেশমাতাকে চিনতে, তাকে ভক্তি করতে ও ভালোবাসতে শিখেছিলেন। স্কুলে বেণীমাধববাবু নবম শ্রেণী থেকে পড়াতেন। সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত আকুল চিত্তে সেদিনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু নবম শ্রেণীতে কয়েকমাস পড়ার পরেই তিনি বদলির আদেশ পান কৃষ্ণনগরের সরকারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে। তাঁকে বিদায় দিতে হলো। সুভাষের নিকট স্কুলটা শূন্য মনে হল। অবশ্য ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক চিঠির মাধ্যমে বজায় ছিল। যখন যা উপদেশ দেবার — তিনি দিতে কার্পণ্য করতেন না। সুভাষের মনের গোচরে তিনটি পথ প্রশস্ত হয়ে দেখা দিল।

(১) লেখাপড়ায় কৃতিত্ব অর্জন করে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ হওয়া, (২) ধর্মজীবনে উন্নতিলাভ করা ও চরিত্র গঠন করা (৩) রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। ধর্ম সম্পর্কে প্রথম পাঠ তো তিনি মায়ের কাছেই পেয়েছেন। আরও গভীর পড়াশোনা করে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সাধনায় রত রইলেন। সাধনপথে এগোবার জন্য কৃচ্ছ্রসাধনা শুরু করেছিলেন সঙ্গে সাথীদের নিয়ে, গোপনে। পিতামাতার ঐশ্বর্য আভিজাত্য পুত্র সুভাষচন্দ্রকে আটকে রাখতে পারেনি। ধনীর প্রাসাদ থেকে নেমে এলেন জনতার মাঝখানে।

সুভাষচন্দ্র নবম শ্রেণীর ছাত্র। এমন সময় কৃষ্ণনগর থেকে সুভাষেরই বয়সী একটি ছেলে নাম হেমন্ত কুমার সরকার বেণীমাধবের নির্দেশে সুভাষের সঙ্গে কটকে এসে দেখা করেন। সুভাষের সঙ্গে দেখা করার আগেই হেমন্ত কুমার রাজনৈতিক মন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছিল। কাজেই হেমন্ত কুমার সুভাষকে রাজনৈতিক দীক্ষা ভালোভাবেই দিলেন। সুভাষচন্দ্রের মনের ভেতরে যে ঝড় উঠেছে নানা দিক থেকে — তা দেখে তাঁর পিতা-মাতা চিন্তিত হয়ে পড়েন এই মেধাবী একগুঁয়ে ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে। অশান্ত বিধ্বস্ত বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে ১৯১৩ সালে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসলেন। ফল প্রকাশের দিন সবাই বিস্ময় পুলকে জানতে পারলেন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। তারপর তিনি কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। নদী যেন এসে সাগরে মিশল। সুভাষচন্দ্র মফঃস্বল

কলেজ থেকে এসেছেন ঠিকই — কিন্তু ময়ূর পুচ্ছধারীদের চিনতে ভুল করেননি। বিভিন্নভাবে তিনি তাঁর কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে লাগলেন। আধ্যাত্মিক শক্তি জয় করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে তিনি দেশোদ্ধারের কাজে হাত দিয়েছিলেন। আমাদের ভাগ্য ভালো তিনি নতুন কোন ধর্মের পতাকাবাহী হননি। প্রচণ্ড ছোটাছুটি ও অস্থিরতার মধ্যে তিনি আই এ পরীক্ষায় বসলেন এবং প্রথম বিভাগে পাশ করলেন। তারপর দর্শক শাস্ত্রে অর্নাস নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজেই বি এ ক্লাসে ভর্তি হলেন। সে সময়েই বাঁধে জাতিবিদ্বেষী প্রফেসার ওটেন সাহেবকে নিয়ে ঝামেলা। ঝামেলার জেরে প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্র ধর্মঘটও হয়ে গেল দু'দিনের। ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিলেন সুভাষচন্দ্র। ওটেন সাহেব প্রিন্সিপাল সাহেবের চাপে মুখে দুঃখ প্রকাশ করলেও ব্যবহার ছিল ঠিক উল্টো। একদল ছাত্র গোপনে মিলিত হয়ে ওটেন সাহেবকে শায়েস্তা করার পরামর্শ করল। বাস্তবে করাও হল সিঁড়িতে ধাক্কা দিয়ে। এদিকে, জাতি বিদ্বেষী প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকগণ এদেশীয় ছেলেদের এধরনের প্রতিবাদ হজম করতে পারছিলেন না। অনেকের জরিমানা করা হল এবং সুভাষচন্দ্র ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না — তবু তাঁকে কলেজ থেকে বহিস্কার করা হল। এ ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ ভীষণ উদ্বিগ্ন এবং বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁর রচিত প্রবন্ধ 'ভারতীয় ছাত্রগণ ও পাশ্চাত্য দেশীয় ছাত্রগণ' এ এর ছাপ স্পষ্ট পাওয়া যায়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রধান দৈনিক পত্রিকাগুলি ধাবাবাহিক বিবরণ দিয়েছিল এবং একাধিক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। ভারতীয় পক্ষে 'বেঙ্গলী' এবং 'অমৃত বাজার' আর বৃটিশদের পক্ষে 'ইংলিশম্যান' এবং 'স্টেটস্‌ম্যান' নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষে জোরাল বক্তব্য পেশ করেছিল। যাই হোক ১৯১৬ সালের মার্চ মাসে তিনি পিতা-মাতার স্নেহাশ্রয়ে কটকে চলে আসেন। অল্প কিছুদিন বিশ্রামে থেকে নানা প্রকার সমাজ সেবামূলক কাজে নিজেকে নিয়োগ করলেন। কলেজ থেকে বহিস্কৃত ছাত্র হিসেবে কোন অবজ্ঞা তো পেলেনই না — উল্টো সমীহ পেতে শুরু করলেন এবং তাঁর যে অসাধারণ নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা আছে তা প্রমাণিত হয়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অনুমতি মিলল ভাইস চ্যান্সেলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট থেকে। স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি এ ক্লাসে ভর্তি হয়ে যান। তখন খবর পেলেন ভারতরক্ষা বাহিনীর ইউনিভার্সিটি ইউনিটে ছাত্র ভর্তি হচ্ছে। তিনি সেখানে সহজেই ভর্তি হয়ে গেলেন। চার মাসের ক্যাম্প হল। সুভাষচন্দ্রের সৈনিক জীবনের পটভূমি এভাবেই তৈরী হয়েছিল। তিনি সসম্মানে বি এ পাশ করার পর এম এ পড়ার কথা ভাবছেন। এমন সময় জানকীনাথের ডাক পেলেন। তিনি তাঁকে বিলেত গিয়ে আই সি এস পড়ার প্রস্তাব দিলেন। সময় বেশী নেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাতে বললেন। বিলেত যাবার হাতছানিকে তিনি এড়াতে পারলেন না, রাজি হয়ে গেলেন। ১৯১৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তিনি 'সিটি অব ক্যালকাটা' নামক জাহাজে ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে গিয়ে তিনি মাত্র আট মাসের প্রস্তুতিতে আই সি এস পরীক্ষায় বসলেন। সাফল্য পেলেন সেভাবেই চতুর্থ স্থান অধিকারের

দ্বারা। পিতা-মাতাকে তিনি চিঠি লিখেন তাঁরা যেন তাঁকে দেশে সেবার কাজে নিয়োজিত হতে অনুমতি দেন। তিনি সারা জীবন দরিদ্র থেকে দেশমাতাকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে চান। তাঁর পিতা তাঁকে চাকরি ছাড়ার অনুমতি দেননি—বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাঁর সংকল্পে অটল রইলেন। আই সি এস এর চাকরি প্রত্যাখানের মাধ্যমে সুভাষের সঙ্গে ব্রিটিশের সম্পর্ক আরও তিক্ততাপূর্ণ হল — কেন না তাঁকে বশ মানাতে না পারার জ্বালা। দেশে প্রত্যাবর্তন করে গান্ধিজীর নির্দেশে কলকাতায় এসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে তিনি সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য তিনি আহ্বান জানান। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সঙ্গে তাঁর বনিবনা হওয়ায় ১৯৩৯ সালে তিনি কংগ্রেস দল পরিত্যাগ করে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' দল গঠন করেন। ক্যাপ্টেন মোহন সিং এর নেতৃত্বে সিঙ্গাপুরে ১৯৪২ সালে 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ২ জুলাই সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুর এলে তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ অক্টোবর সুভাষচন্দ্র 'আজাদ হিন্দ সরকার' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। 'দিল্লি চলো' ও 'জয়হিন্দ' ধ্বনি ঘোষিত হয় কয়েক লক্ষ ভারতীয়র সামনে। জার্মান, জাপান ইত্যাদি আটটি দেশ এই সরকারকে স্বীকৃতি দেন। ১৯৪৫ সালে একদল সেনা নিয়ে তিনি রেঙ্গুন পর্যন্ত আসেন এবং ইম্ফলও দখল করতে সমর্থ হন। কিন্তু খাদ্যের অভাবে এই বাহিনী ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে আজাদ হিন্দ বাহিনীর পরাজয় হলেও এর ফল হয়েছিল সুদূর প্রসারী। 'দিল্লি চলো' অভিযান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শেষ মর্যাদাকে বিপন্ন করে তুলেছিল। ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট একটি জাপানি বোমারু বিমান ফরমোজা দ্বীপে ভেঙ্গে পড়ে। অনেকের ধারণা এই বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। নেতাজীর মৃত্যুরহস্য এখনো ঠিকভাবে জানা যায়নি।

ত্রিপুরা দর্পণ— মঙ্গলবার, ২৩শে জানুয়ারী, ২০০৭ইং

শিক্ষক দিবসের প্রেক্ষাপট

বিশ্বের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও দার্শনিক ডঃ সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়ে ১৩ই মে ১৯৬২ সালে আসন গ্রহণ করেন। ৫ই সেপ্টেম্বর এই মহান শিক্ষকের জন্মদিন। জাতীয় শিক্ষক সংস্থা (National Fedaration of Teachers) এই নতুন রাষ্ট্রপতির জন্মদিন 'শিক্ষক দিবস' হিসেবে পালন করার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করে। ভারত সরকার তা মেনে নেয়। এরপর থেকে প্রতি বছর ৫ই সেপ্টেম্বর 'শিক্ষক দিবস' সারা দেশে পালিত হয়ে আসছে।

দেশে আরো অনেক শিক্ষক ও দার্শনিক ছিলেন — কিন্তু তাঁর নামটা কেন এল —— এ প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে এ মহান ব্যক্তির মহত্ত্বর দিকে আলোকপাত করতে হবে। তাঁকে জানতে হবে — বুঝবে হবে। তাঁর আত্মত্যাগ, তাঁর নিষ্ঠা, তাঁর মেধা, তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তাঁর অধ্যবসায় — এসব হিমালয়ের মতোই গগনচুম্বী ছিল।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি মাসিক দশ হাজার টাকা বেতন পেতেন। এর তিনি মাত্র আড়াই হাজার টাকা গ্রহণ করতেন। এখান থেকে আয়কর কেটে ১৯০০ টাকা হাতে পেতেন। বাকি টাকা তিনি প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জমা দিতেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে তাঁর নির্বাচন সারা বিশ্ব সাদরে গ্রহণ করেছিল। সে সময়ে নোবেল বিজয়িনী উপন্যাসিক পার্ল এস্ বাক্ মন্তব্য করেছিলেন — "আমি ভারতকে অভিনন্দন জানাই।" অভিনন্দনের ভাষার অর্থ হল ভারতবর্ষ তাঁর মতো একজন গুণীকে চিনতে পেরেছে। বিংশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল আনন্দিত হয়ে বলেছিলেন ভারতবর্ষ একজন দার্শনিককে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বসিয়ে দর্শনের সম্মান বৃদ্ধি করেছে। প্লেটোর আদর্শকে রূপায়িত করেছে। লন্ডনের টাইমস্ পত্রিকা লিখেছিল — ডঃ রাধাকৃষ্ণাণের মতো একজন কৃতী পুরুষ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শেষে পাঁচ বৎসরের জন্য যদি রাষ্ট্রপতি না হতে পারতেন তবে তা হত ভারতের পক্ষে কলঙ্ক।

তিনি ছিলেন দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি। তাঁর পূর্বসূরী ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে সাংবিধানিক ক্ষমতার গন্ডিতে আবদ্ধ থেকেছেন। কিন্তু তিনি এ পদটিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলেন। তিনি সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে থেকেছেন। এ পদের গুরুত্ব তিনি অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি যেহেতু উঁচুদরের দার্শনিক কাজেই তিনি রাজনীতির ব্যাখ্যা করতেন।

রাষ্ট্রপতি হয়ে তিনি জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেননি। তাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের অভাব - অভিযোগ শুনতে চাইতেন। তাই সপ্তাহের দুই (২) দিন তিনি সাধারণ মানুষের জন্য রাষ্ট্রপতি ভবনের দরজা খোলা রাখতেন। দেশের সংহতির স্বার্থে রাষ্ট্রপতি দক্ষিণ ভারতের হায়দ্রাবাদের রাষ্ট্রপতি নিলয়ম্ এ গিয়ে থাকতেন। ১৯৬২ সালে নেহরু গিয়ে দুই (২) দিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

তিনি সরকারি কাগজপত্রের চেয়ে পুঁথিপত্র নিয়ে সময় কাটাতে বেশি ভালোবাসতেন। দিনে অন্তত বারো (১২) ঘণ্টা পড়াশোনা করতেন। তাঁর বিছানা, টেবিল, চেয়ারে বই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। স্মৃতি শক্তি ছিল অসাধারণ। বক্তৃতা দেবার সময় প্রসঙ্গক্রমে তিনদিন আগের কোন ঘটনা পত্রিকায় যা উঠেছিল তা তিনি হুবহু বলে দিতে পারতেন — এরকমটা আর কেউ পারতেন বলে জানা নেই। ইংরেজিতে তাঁর ব্যুৎপত্তি দেখে ইংরেজ অধ্যাপকগণও অবাক হতেন। কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় এর স্বাক্ষর তিনি বহুবার রেখেছেন। মাদ্রাজ খ্রীশ্চান কলেজে তিনি উইলিয়াম মিলার, উইলিয়াম স্কিনার, এ জি হগ — এদের তিনি পেয়েছেন। এখানে তিনি চার বছর (১৯০৫-১৯০৯) পড়াশোনা করেছিলেন। এ চার বছর তাঁর জীবনে স্মরণীয় বছর — তা তিনি বহু জায়গায় স্বীকার করেছেন। ১৯০৬ সালে বি এ অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন। আর দর্শনে সর্বোচ্চ নম্বর পান। বি এ পরীক্ষায় ভালো ফলের জন্য মাসে ২৫ টাকা বৃত্তি নিয়ে এম এ ক্লাসে দর্শন নিয়ে ভর্তি হন।

এম এ ক্লাসের অধ্যাপক হগ প্রায়ই ভগবত গীতার ভুল ব্যাখ্যা করতেন। ভগবত গীতার অনাসক্তি ও বৈরাগ্যকেই তিনি ভারতের অধপতনের মূল কারণ বলে ব্যাখ্যা করতেন। রাধাকৃষ্ণাণ মন থেকে এ কথাটি মেনে নিতে পারতেন না। তাঁর জেদ চেপে বসে এবং হিন্দু ধর্মের মর্ম উদ্ঘাটনে বিভিন্ন বই জোগাড় করে পড়াশোনা শুরু করেন। এম এ পরীক্ষার অংশ হিসেবে একটি প্রবন্ধ লিখেন — .The Ethics of Vedanta and its meta-physical Pre-supossition. এটি ছিল তাঁর দুঃসাহসিক কর্ম। সে সময়ে ভারতে কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই ভারতীয় দর্শন পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল না। এ প্রবন্ধটিতে হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টান ধর্মের কতকগুলি তত্ত্বকে তিনি আক্রমণ করেন। তরুণ রাধাকৃষ্ণাণের যুক্তি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও ইংরেজির পাণ্ডিত্যে খ্রীষ্টান পরীক্ষকগণ মুগ্ধ হন। পাশ্চাত্য দার্শনিক ও কবিগণের বহু উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি এটির শক্ত ভিত তৈরি করেছিলেন। পরে এক স্থানীয় প্রকাশক ছেপে প্রকাশ করেন — ৯৩ পৃষ্ঠা হয়েছিল বইটির। এই প্রবন্ধটি সাড়া ফেলে দেয় এবং তিনি সর্বত্র সুপরিচিত হয়ে যান। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে দ্বিগুণ বেতন দিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে টেনে আনেন।

এম এ পাশ করে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কাজ শুরু করে ৬০-৮০ টাকা বেতন। সে সময়ে তিনি সৈদাপেটে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে প্রশিক্ষণ নিতে ভর্তি হন।

এখানে মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক তাঁকে ক্লাস করা থেকে অব্যাহতি দেন। পরে ঐ অধ্যাপকের অনুরোধে তিনি মনস্তত্ত্ব বিষয়ে বারোটি (১২) বক্তৃতা দেন। তাঁর সহপাঠীরা যারা প্রত্যেকেই তাঁর থেকে বয়সে বড় তাঁরাও মনস্তত্ত্বের দুরূহ বিষয়গুলি বুঝতে পেরেছিলেন। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের ভারতীয় শাখা ১৯১২ খ্রীঃ বক্তৃতাগুলিকে Essentials of Psychology নামে বই এর আকারে প্রকাশ করেন।

প্রশিক্ষণ সময়ে তিনি অর্ধেক বেতন পেতেন। এটা তখনকার নিয়ম অনুসারে। বরাবরই তাঁকে অর্থাভাবে কাটাতে হয়েছে। এ সময় তাঁর বাবা মারা যান। মা-ভাই-বোনেরা তাঁর কাছে—সংসার চালাতে তাঁর পুরানো অতি প্রিয় দামী দামী বই একে একে বিক্রি করেন। কলেজের মেডেল তৈজসপত্রও বিক্রি করেন। লোকজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে সংসার চালান। পাওনাদারের টাকা সময়মত শোধ করতে না পারার জন্য কোর্টেও যেতে হয়েছিল। আবার কোন বন্ধু বা ছাত্রের অর্থকষ্ট দেখলে তিনি সাহায্য না করে পারতেন না। বাইরের পোষাক পরিচ্ছদ ও চালচলনে ত্রুটি রাখতেন না। অভিজাত সমাজের নাচগানের আসরে তাঁকে নিয়মিত দেখা যেত। ১৯১১ সালে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর ১০০ টাকা বেতনে দর্শনের সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত এবং স্থায়ী পদে নিযুক্ত হন।

দর্শন ও মনস্তত্ত্ব ছাড়াও সমসাময়িক সমাজ ও বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন যেগুলি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পত্রিকায় ও ম্যাগাজিনে বের হয়েছিল। তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতা দেখে সারা বিশ্ব মুগ্ধ হয়। তবে পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখা ও বই পড়া নিয়ে ডুবে থাকলেও তিনি বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা ও হাস্যকৌতুকে বেশ কিছুটা সময় কাটাতেন।

রাধাকৃষ্ণাণ প্রথম জীবনে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে লেখালেখি করলেও পরবর্তী সময়ে ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতেন। তিনি বুঝেছিলেন সকল ধর্মই ঈশ্বরের কথা বলে এবং সকল জীবন ঈশ্বরের সৃষ্টি। এক ধর্মের সাথে অপর ধর্মের মূলগত কোন পার্থক্য নেই। ধর্মের সারবত্তার দিকেই তিনি দৃষ্টি দিয়েছিলেন। আমরা প্রকৃপক্ষে ধার্মিক নই বলে ধর্মে ধর্মে পার্থক্য করি। রাধাকৃষ্ণাণ এ বিষয়টা তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বুঝিয়েছেন।

তিনি ছাত্রদের পড়াতে ও ছাত্রদের সংস্পর্শে থাকতে ভালবাসতেন। তিনি খুব অল্প সময়ে যা পড়াতেন — তাতে ছাত্ররা খুব উদ্দীপ্ত হত। ছাত্ররা সব সময় তাঁকে পেতে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। তিনি যখন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন তার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে মনোনিবেশ করেছেন। গৃহ থেকে গ্রন্থাগার সকল কিছু তাঁর হাতের যাদু স্পর্শে সুন্দর বিকশিত হয়ে উঠত। পরিকল্পনা তৈরী করে ফান্ড জোগাড় করে সকল কিছু সহজভাবে সমাধা করতেন।

১৯০৯ থেকে ১৯১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে সহকারী অধ্যাপকের পদে কাজ করেন। তারপরে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯১৮ থেকে ১৯২১ খ্রীঃ পর্যন্ত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক পদে ছিলেন ১৯২১ থেকে ১৯৩১ খ্রীঃ পর্যন্ত।

স্পালডিং প্রফেসর হিসেবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদে ছিলেন ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে তিনি অক্সফোর্ডের অল্ সোলস্ কলেজে অধ্যাপনার কাজে যান। তখন নেহরুর ডাকে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়। নেহরুর ডাকে অর্থাৎ দেশের ডাকে। স্বাধীন ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব তাঁকে নিতে হবে। তাই তিনি দেশে ফিরে আসেন।

তাঁকে সভাপতি করে দশজনের কমিটি গঠন করা হয়। এঁরা প্রত্যেকেই শিক্ষা জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং মহাপ্রাজ্ঞ। এই দশরত্নসভার মধ্যমণি ছিলেন ডঃ সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ। ১৯৪৮ সালের ৬ই ডিসেম্বর দিল্লিতে কমিশনের প্রথম অধিবেশন বসে। এঁরা মোট পঁচিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং বহু কলেজ পরিদর্শন করেন। অর্থাৎ সারা ভারতে তাদের যেতে হয়। রাধাকৃষ্ণাণ ভারতের সংবিধান তৈরি করার জন্য যে গণপরিষদ গঠন করা হয়েছিল তারও সদস্য ছিলেন। সুতরাং সংবিধানের মর্ম তাঁর জানা ছিল। তাঁর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন পেশ করে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই। প্রতিবেদন প্রকাশের পর তা দেশ-বিদেশে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে এটা রাধাকৃষ্ণাণের চূড়ান্ত সাফল্য।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের দায়িত্বপূর্ণ করে তিনি অক্সফোর্ড গেলেন অধ্যাপনার কাজে। তিনি পড়াশোনা নিয়ে থাকতেই বেশি ভালবাসতেন। আবার নেহরুর ডাক এল — রাষ্ট্রদূত হয়ে রাশিয়া যেতে হবে। কারণ রাষ্ট্রদূত হয়ে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত রাশিয়া গিয়েছিলেন — কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের উন্নতি হয়নি। আরো নাম এসেছে কিন্তু নেহরুর মনঃপুত হয়নি। অনেকে তখন ভাবলেন একজন ভাববাদী দার্শনিক সাম্যবাদী রাশিয়ায় গিয়ে মানিয়ে নিতে পারবেন কি? পূর্বে দু'বার তিনি রাশিয়া যাওয়ার সুযোগ হারিয়েছেন। একবার ভারত সরকার পাঠাতে চেয়েছিল, আর একবার রাশিয়া আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

তাই রাশিয়া যাবার পূর্বে সে দেশ সম্পর্কে পড়াশোনা করে নিলেন। গরিবের বন্ধু হিসেবে মার্ক্সবাদে তাঁর সহানুভূতি ছিল। আবার মার্ক্সবাদের অন্যান্য তত্ত্বে দ্বিমতও ছিল। রাশিয়াতে তখন শূন্য ডিগ্রীর নীচে ৩০/৪০ ডিগ্রী শীত। তিনি প্রায় নিঃসঙ্গের মতো রাশিয়ায় গিয়ে বই আর লেখার কাজে ডুবে রইলেন। কিছুদিন এভাবে কাটল। স্ট্যালিনের কাছে ভারতের নতুন রাষ্ট্রদূতের খবর গেল। শিক্ষাবিদ দার্শনিক রাষ্ট্রদূত বই আর পড়াশোনার মাঝে নিজেকে কিভাবে বন্দি রেখেছেন — তাঁর মনে কৌতূহল হল। স্ট্যালিন তাঁকে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ১৯৫০ সালের ১৪ই জানুয়ারি রাত ৯টায় লৌহমানব স্ট্যালিন ও কোমল হৃদয় রাধাকৃষ্ণাণের মধ্যে যে ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার হয় — তাতেই দু'দেশের মধ্যে সুচিরস্থায়ী মৈত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয় নেতার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় হয়। মস্কোতে রাধাকৃষ্ণাণ অসাধারণ জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯৫১ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে রাশিয়ার মন্ত্রী দলবল নিয়ে হাজির ছিলেন। সে সময়ে দেশে চরম খাদ্যাভাব। নেহরুর অনুরোধে রাধাকৃষ্ণাণ রাশিয়া থেকে পাঁচ লক্ষ টন গম সহজ শর্তে আমদানীর ব্যবস্থা করেছিলেন।

কাশ্মীর প্রসঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়া ভারতের পক্ষে দাঁড়াল। অর্থাৎ প্রতিকূল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করল — তখন আমেরিকা, ব্রিটেন এমনকি ভারত সরকারও অবাক হল। কারণ ভারত সরকারের পক্ষে রাশিয়াকে কোন অনুরোধ করা হয়নি। পরে জানা গেল রাধাকৃষ্ণাণের অনুরোধে কাজ হয়েছিল। এরপর থেকে নিরাপত্তা পরিষদে যতবার কাশ্মীর প্রসঙ্গ উঠেছে, রাশিয়া ভারতের পাশে থেকেছে।

নেহরু রাধাকৃষ্ণাণকে তৃতীয় বৎসরের জন্য আবার রেখে দিলেন মস্কোতে। অর্থাৎ ছয় মাস মস্কোতে, ছয় মাসঅক্সফোর্ডে। তবে তৃতীয় বৎসর শেষ না হতেই তাঁকে ভারতের রাষ্ট্রপতি মনোনীত করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে প্রস্তাব আসতে শুরু হয় নেহরুর কাছে। তবে কংগ্রেসের গোড়া অংশ রাজেন্দ্র প্রসাদকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে চেয়েছিলেন। তখন নেহরু ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে রাষ্ট্রপতি এবং রাধাকৃষ্ণাণকে উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সকলকে খুশি করেন।

মস্কো রাধাকৃষ্ণাণের বিদায় সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেছিল — যা ইতিপূর্বে কোন রাষ্ট্রদূত পাননি। স্ট্যালিনের সঙ্গেও তাঁর বিদায় সাক্ষাৎকার হয়েছিল। এই সাক্ষাৎকারও ঐতিহাসিক। তখনও উভয় নেতার মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মত বিনিময় হয়। ক্রেমলিনে স্ট্যালিনের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণাণের সাক্ষাৎকারের খবর সারা বিশ্ব জেনে স্তম্ভিত হল। ক্রেমলিনে বসে রাধাকৃষ্ণাণ 'তাস' এর প্রসঙ্গ তোলেন এবং বলেন "আমার মনে হয় আমাদের দু'দেশের পরিচয় মুহূর্তে তার প্রেরিত খবরগুলি বিভ্রান্তিকর।" "Remove him" তৎক্ষণাৎ আদেশ দিয়েছিলেন স্ট্যালিন। সেদিনের সাক্ষাৎকার অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল। রাধাকৃষ্ণাণ সস্নেহে ও আন্তরিকতায় স্টালিনের পিঠে হাত রেখেছিলেন। দো-ভাষী ছিল। তিনি বললেন, বহু হিংসা ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে আপনি এত শক্তিধর হয়েছেন। আমাদের দেশে এক সম্রাট ছিলেন — নাম অশোক। তিনি কলিঙ্গ যুদ্ধের পর সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। আপনার ক্ষেত্রে কি এটা সম্ভব নয়? সমস্ত পৃথিবীকে জয় করেও কেউ যদি আত্মাকে হারায় তবে তার কী থাকল? এসব কথা শুনে স্ট্যালিন দৃশ্যত বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি দো-ভাষীকে বলেছিলেন সবাই তাকে 'দানব' ভাবে — একমাত্র রাধাকৃষ্ণাণই তাকে 'মানুষ' মনে করেছেন। এই সাক্ষাতের ছয় মাস পরে স্ট্যালিনের দেহান্তর ঘটে।

রাধাকৃষ্ণাণ লৌহমানবের মনে একটু ধাক্কা দিতে পেরেছিলেন। তিনি দেশে ফিরে আসেন। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদে দশ বছর ছিলেন — ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত। রাজ্যসভার সভাপতির কাজ পরিচালনা করেন পদাধিকার বলে। রাজ্যসভায় রাধাকৃষ্ণাণের অতুলনীয় ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন অনেকেই। তিনি সে সময় রাজ্যসভার 'প্রাণপুরুষ' ছিলেন।

দৈনিক আরোহন— মঙ্গলবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৬ ইং

সেরা শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা সংগঠক

যে মহান ব্যক্তির জন্মদিন 'শিক্ষক দিবস' হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে — তাঁকে আমরা ৫ই সেপ্টেম্বর নানাভাবে নানা স্তরে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ডঃ সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ জাতীয় শিক্ষক। তাঁর মধ্যে যে কর্মক্ষমতা ও উদ্যম ছিল তা বিরল। অল্প বয়স থেকেই তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন — তিনি ছিলেন মেধাবী ছাত্র। তাঁর স্মৃতিশক্তি প্রশ্নাতীত।

১৯০৩ সালে ভেলোরে এফ এ (ফার্স্টআর্ট) পড়ার সময়ই মাত্র ষোল বছর বয়সে দশ বছরের শিবকামুর সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ফার্স্ট আর্টেও তিনি প্রথম বিভাগে পাশ করেন। গণিত, ইতিহাস ও মনস্তত্ত্বে ডিস্টিংশান পান। বয়ঃসন্ধিকালে তিনি কোন প্রকার বদ অভ্যাসে আক্রান্ত হন নি। কখনো ধূমপান বা মদ্যপান করেননি। তিনি নিঃসঙ্গ প্রকৃতির ছিলেন। তবে তাঁর নিঃসঙ্গ অন্তরভাগ কল্পনা ও চিন্তার সম্পদে ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়ে ওঠে। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তাঁর সুকুমার বৃত্তিগুলি ধ্বংস হয়নি। দারিদ্র্যের মধ্যেও বই কিনতে কোন দ্বিধা করতেন না। পাঠ্য বই এর বাইরেও তিনি বই কিনতেন ও নিয়মিত পাঠ করতেন। ঐতিহ্যমণ্ডিত মাদ্রাজ খ্রিষ্টান কলেজ থেকে তিনি ১৯০৬ সালে প্রথম শ্রেণিতে বি এ পাশ করেন দর্শনে সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে। এ কলেজটি খ্রিষ্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত। শিক্ষক উইলিয়াম মিলার, উইলিয়াম স্কিনার, এ জি হগ - তাঁদের উষ্ণ হৃদয়ের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। তাঁদের সুশিক্ষা ও পাণ্ডিত্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। তাঁদের সুশিক্ষার গুণেই তিনি ইংরেজি সাহিত্য ও দর্শনে এতটা আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বি এ পরীক্ষায় ভালো ফলের জন্য মাসে ২৫ টাকা বৃত্তি নিয়ে দর্শনে এম এ ক্লাসে ভর্তি হন।

এম এ পড়ার সময় মাদ্রাজের বাসায় মা, ছোট তিন ভাই ও স্ত্রীকে নিয়ে কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে পড়াশোনা চালিয়ে যান। মাসে ২৫ টাকা বৃত্তি ও কিছু ছাত্র পড়ানোর টাকা দিয়ে ধার দেনা করে চলতে থাকেন। গরিব মানুষের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। ধর্মের প্রতিও আগ্রহ ছিল। এম এ পড়ার সময় ক্লাসে অধ্যাপক হগ্ প্রায়ই হিন্দু ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করতেন। গীতার অনাসক্তি ও বৈরাগ্যই হিন্দুদের অধঃপতনের মূল কারণ। তিনি এ যুক্তি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। তিনি গীতার ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ সংগ্রহ করে গভীর পড়াশোনা চালিয়ে যান এবং এম এ পরীক্ষার অংশ হিসেবে এক দুঃসাহিসক রচনা তৈরি করেন - 'The Ethics of vedanta and its metaphysical presuppositions' — কারণ সে সময়ে ভারতীয় দর্শন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল না। সে রচনায় তিনি হিন্দুধর্মের

তত্ত্বের প্রকৃত অর্থ তুলে ধরেন, পাশাপাশি আলোচনা প্রসঙ্গে খ্রিষ্ট ধর্মের কিছু কিছু ত্রুটির উল্লেখ করেন। ইংরেজি ভাষার দখল, মৌলিক চিন্তা, সূক্ষ্ম চিন্তা শক্তি এসব মিলে তিরানব্বই পৃষ্ঠার রচনাটি বহু উদ্ধৃতিসহ অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছিল। ইংরেজ অধ্যাপকগণের নিকট থেকে রচনাটি ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। পরবর্তী জীবনে হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের উপর বহু বক্তৃতা এবং বই লিখেছেন — এসবের অঙ্কুরিত বীজ এ প্রবন্ধেই নিহিত হয়েছিল। ১৯০৯ সালে এম এ পাশ করার পর প্রথম অধ্যাপনা শুরু করেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে মাত্র ৬০-৮০ টাকা বেতনে। এরপর রাজামুন্দ্রী, মহীশূর কলেজে অধ্যাপনা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। অধ্যাপক থেকে উপাচার্য পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩১শে মে ১৯৩১ সালে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন বাড়ি ছিল না। তিনি সুরম্য ভবন নির্মাণ ও ছাত্রদের হোস্টেল সহ পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় রূপে গড়ে তুলেন - যা দেখে সি ভি রমন অভিভূত হয়ে বলেন আরব উপন্যাসের দৈত্যের মতো রাধাকৃষ্ণাণ যেন যাদু বলে রাতারাতি ফাঁকা জায়গায় বাড়ি, অধ্যাপক, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, খেলাধূলার ব্যবস্থা করলেন। রাধাকৃষ্ণাণের কর্মকাণ্ডে বিদ্বান, কবি, বিদ্যোৎসাহী মহারাজা বিক্রম দেববর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রথমে ৫০ হাজার এরপর ৭৫ হাজার, তারপরে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা আজীবন দান করে গেছেন।

অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্ত প্রকার সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে একমাত্র গুণমানের উপর নির্ভর করে ভারতের বাইরে থেকেও নিয়োগ করতেন। এ নিয়ে সিনেটের সভায় তাঁকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় স্থানীয়দের প্রাধান্য দেননি বলে।

উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করে তৎকালীন সময়ে গ্রন্থাগারটিকে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার হিসেবে গড়ে তুলেন। বহু দুষ্প্রাপ্য বই এর সংগ্রহ তিনি করেছিলেন। ব্যক্তিগত চেষ্টায় মার্কসবাদী সাহিত্যের বিপুল সম্ভার নিয়ে এসেছিলেন। ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ মার্কসবাদী ছিলেন না — তবে তিনি ছিলেন স্বাধীন চিন্তার প্রবক্তা। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে সব রকমের চিন্তার খোরাক থাকবে। ১৯৩৬ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পালডিং অধ্যাপক পদে যোগ দেওয়ার সুবাদে তিনি উপাচার্যের পদ ত্যাগ করেন। তাঁর বিদায়ের পর নতুন উপাচার্য এ সমস্ত বই সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের হাতে তুলে দেন। এর মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসুর নিষিদ্ধ গ্রন্থ 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' অন্যতম।

তাঁর নিকট ছাত্র স্বার্থ ছিল সবার উপরে। সব অধ্যাপক এবং কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। তবে যে যা খুশি করার সুযোগে পেতেন না। তামিল-তেলেগু দ্বন্দ্ব থেকে ক্লাস বয়কটের সিদ্ধান্ত ছাত্ররা নিলে তিনি কড়া ভাষায় ছাত্রদের ক্লাস বর্জনের সিদ্ধান্ত বর্জন করার নির্দেশ দেন। সব গণ্ডগোল থেমে যায়। যথারীতি ক্লাস শুরু হয়ে যায়। তামিল বিরোধী মনোভাবকে তিনি প্রশ্রয় দেননি।

বিশাখাপত্তনমের মেডিকেল কলেজ সরকারি সাহায্যের অভাবে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে তিনি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাধাকৃষ্ণাণের বেপরোয়া মনোভাব ও তির্যক মন্তব্যে মাদ্রাজ সরকার কলেজের জন্য অর্থ মঞ্জুর করে।

উপাচার্যের কাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের কাজ করে তিনি সন্তোষ্ট থাকতে পারতেন না। ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে মনের খোরাক পেতেন না। তাই তিনি নিয়মিত ক্লাস নিতেন। তিনি ছিলেন জাত শিক্ষক। ছাত্রদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগে অনুপ্রাণিত হতেন স্ফূর্তি অনুভব করতেন।

হোস্টেলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এক সঙ্গে খাওয়ার সিদ্ধান্ত জোর করে ছাত্রদের উপর চাপিয়ে না দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ তাদের দিলেন। একদিন জাতি, ধর্ম, বর্ণের গোঁড়ামির কুফল সম্পর্কে আলোচনা করলেন — এরপর ছাত্ররা নিজেরাই এক পংক্তিতে ভোজনের সিদ্ধান্ত নেয়।

বর্তমানে যে জাতীয় সেবা প্রকল্প জনপ্রিয় হয়েছে তার চিন্তা ভাবনা ও শুভ সূচনা অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি করেছিলেন। গ্রামে গিয়ে গ্রামকে চেনা ও গ্রামের সেবায় উৎসাহ দান তিনিই প্রথম করেছিলেন। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের যাতে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত ঘটে তাই ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের অধিবেশনে জাতীয় নেতাদের আমন্ত্রণ করতেন। মহাত্মা গান্ধি ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সালে দু'বারই ছাত্র ও অধ্যাপকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। নৃত্যনাট্যের দল নিয়েও অভিনয় করান। বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতা বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদও ছাত্র ইউনিয়নে বক্তৃতা দেন।

রাজা মহারাজাদের অনুদানে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ১৯১৭ সালে। দেশের মধ্যে তৎকালীন সময়ে এটিই ছিল প্রধান আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাচীন ভাষা সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নত পাঠক্রম চালু ছিল। বছরে মাত্র তিন লক্ষ টাকা দান পাওয়া যেত উত্তরপ্রদেশ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে যা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ করতে গিয়ে বহু টাকা দেনা হয়ে যায়। আস্তে আস্তে প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য মদনমোহন মালব্যের শরীরও ভেঙ্গে যায়। তখন একজন তরুণ ও যোগ্য উপাচার্যের খোঁজ পড়ে। সে সময় ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ কলকাতা ও অক্সফোর্ড দু'জায়গায় কাজ করছেন। ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে মালব্যজী রাধাকৃষ্ণাণকে উপাচার্যের পদ গ্রহণের অনুরোধ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে ও এতগুলো দায়িত্ব একসঙ্গে সামলানোর কথা চিন্তা করে অনিচ্ছুক ছিলেন। গান্ধীজী রাধাকৃষ্ণাণকে উপাচার্য করার পক্ষে ছিলেন। কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও নূতন দায়িত্ব ভার কাঁধে তুলে নিলেন। উপাচার্য হিসাবে তিনি কোন বেতন নিতেন না। শুধু কলকাতা - বারাণসী ট্রেন যাতায়াত খরচাটা নিতেন। ১৯৩৯ সালের ২০ আগস্ট মালব্যজী ইস্তফা দেন আর রাধাকৃষ্ণাণ দায়িত্বভার কাঁধে নেন ২৪শে আগস্ট।

তিনি হলেন 'সপ্তাহ-অন্তিক উপাচার্য'। শুক্রবার রাতের ট্রেনে বারাণসীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতেন আর রবিবারে রাতের ট্রেনে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতেন। ১৯৪১ সালের ২০ মার্চ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক পদে ইস্তাফা দেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময়ে যেসব সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিলেন তা কৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ করেন। তবে এটাও ঘটনা তাঁর দ্বারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন গোঁড়ামির অবকাশ রাখেন নি। হায়দ্রাবাদের নিজামের টাকায় তিনি ইসলামিক অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করেন। প্রথা ভেঙে বেদের ক্লাসে ছাত্রীদের ভর্তি করান। তিনি প্রতি রবিবারে গীতাপাঠ ও গীতার অর্থ ব্যাখ্যা করতেন। বরোদার মহারাজা স্যার প্রতাপচন্দ্র গাইকোয়াড়ের অর্থানুকুল্যে অধ্যাপক পদে তিনি বৃত ছিলেন। কোচিন মহারাজার দানে নির্মিত কোচিন হাউস এ ছিল তাঁর বাসগৃহ ও অফিস। গৃহ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে বসেই উপাচার্যের কাজ দেখাশোনা করতেন।

১৯৪২ এর জানুয়ারিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী পালিত হয়। উদ্বোধন করেন মহাত্মা গান্ধি স্বয়ং। নেহরুসহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভাষণ দান করেন। সাম্মানিক ডি লিট দেওয়া হয় জওহরলাল নেহরু ও রাজেন্দ্র প্রসাদ সহ অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের। স্বাধীনচেতা উপাচার্য রাধাকৃষ্ণাণ যে ভাবে একের পর এক কাজ করে গেছেন ব্রিটিশ সরকারকে তোয়াক্কা না করে এবং সরাসরি সংঘর্ষের পথ নেন — তাঁকে বলা হত academic extremist বেশির ভাগ শিক্ষাবিদ ব্রিটিশের ভয়ে স্বাধীন মত প্রকাশ করতে পারতেন না বলে নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় হয়ে থাকতেন। কিন্তু রাধাকৃষ্ণাণ ছিলেন ব্যতিক্রমী বেপরোয়া।

বিশ্বদরবারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কতবার যে মাতৃ ভূমির প্রতিনিধিত্ব করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। বক্তৃতার মাধ্যমে দেশের মহিমা, হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। হিন্দু দর্শন ও ধর্ম নিয়ে তাঁর বক্তৃতামালা তৎকালীন দুনিয়ায় বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতা, বিচক্ষণতা, স্মৃতিশক্তি, উদার মনস্কতা, পাণ্ডিত্য তাঁকে গগনচুম্বী করেছিল। রাষ্ট্রদূত হিসাবে, উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে, রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর ভূমিকা ছিল ব্যতিক্রমী। তাঁর অধ্যবসায়, কাজের প্রতি নিষ্ঠা তাঁকে চির ভাস্বর করে তুলেছিল। শিক্ষা ও ছাত্র স্বার্থে কোন কিছুর প্রতি আপোষ করেন নি। তাই তো তিনি জাতীয় শিক্ষক। তাঁকে স্মরণ করে আমরা ধন্য হই।

দৈনিক আরোহণ— শুক্রবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৮ ইং

কর্মময় বিশাল ব্যক্তিত্ব—সরলা দেবী চৌধুরানী

জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি থেকে সমাজ এমন সব বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের পেয়েছে যাঁদের চলন-বলন, বেশ-ভূষা, আদব কায়দা সমাজে দাগ কাটিতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদশে প্রচলিত বহু রীতি ব্রাহ্মঠাকুর বাড়ি থেকে এসেছে। জন্মদিন পালন, মেয়েদের শাড়ি পড়ার আধুনিক পদ্ধতি, রাখি বন্ধন, বসন্ত উৎসব ইত্যাদি। সনাতনী হিন্দু উৎসহ ব্রাহ্মঠাকুরবাড়িতে অনুষ্ঠিত হত না— তবে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির চর্চার ফলে একটা স্নিগ্ধ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল— যা অন্যত্র ছিল না।

স্বর্ণকুমারী দেবী ও জানকীনাথ ঘোষালের দ্বিতীয় কন্যা সরলা ১৮৮৭ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করতে গিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চোখে পড়ে সুপুরুষ সুশিক্ষিত নদীয়া জেলার ব্রাহ্মণ জমিদার পুত্র জানকীনাথকে। ঠাকুরবাড়ির নিয়ম ছিল ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দিয়ে জামাইদের বিয়ের মন্ত্র পড়ানো এবং ঘরজামাই করে রাখা। কিন্তু জানকীনাথের ক্ষুরধার বক্তব্য ছিল—ব্রাহ্ম এবং হিন্দু উভয়ই ব্রহ্মের উপাসক—নিরাকার এবং সাকার। কাজেই আলাদা করে ব্রহ্ম উপাসক বলে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেবার প্রয়োজন নেই এবং বিয়ের পর স্ত্রীকে নিজ বাড়িতে এনে রাখবেন। শ্বশুরগৃহে থাকবেন না। যাই হোক, জানকীনাথের উভয় শর্তেই শ্বশুর দেবেন্দ্রনাথ সম্মত হলেন। কিন্তু পিরালী দেবেন্দ্রনাথের কন্যাকে বিয়ে করায় তিনি ত্যজ্যপুত্র হলেন জমিদার পিতা জয়চন্দ্র ঘোষাল কর্তৃক। কালক্রমে অবশ্য পিতার ক্রোধ শমিত হয়েছিল। বিয়ের পর বৈঠকখানার আলাদাবাড়িতে নব দম্পতি থাকতে শুরু করেন।

দিদি হিরন্ময়ী, দাদা জ্যোৎস্নানাথ এবং বোন উর্মিলাসহ সরলারা এক ভাই তিন বোন ছিলেন। বোনেদের মধ্যে সরলা মেজ। প্রায় পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত সরলারা জোড়াসাঁকোর বাইরে ছিলেন— তবে সর্বদা যোগাযোগ ছিল। ছ'মাস বয়সে ঠাকুরবাড়ির পানিহাটির বাগান বাড়িতে ঘটা করে সরলার অন্নপ্রাসন হয়। সে বাড়িটি ছিল ঠাকুরবাড়ির গ্রীষ্মনিবাস। তারপর শেয়ালদার বৈঠকখানার বাড়িতেও ছিলেন মা-বাবার সঙ্গে। বৈঠকখানার বাড়ি থেকে সিমলার বাড়িতে চলে যান যা মিনার্ভা থিয়েটারের পাশের গলিতে। সেখানে থাকা অবস্থায় বছর চারেক বয়সে সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে সরলার সামনের দুটো দাঁত ভেঙে গিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড। প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র লাগানো হল। ব্যথার সঙ্গে বাড়তি ভয় ঢুকিয়ে দিল দিদি ও দাসীরা মিলে — "বর এসে ফোকলা দাঁত দেখে ফিরে যাবে"। ঠাকুর বাড়ির প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী

শিশুরা জন্মের পর মায়ের কোলে ওঠার বিশেষ সুযোগ পেত না। সরলার বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। দাসীর কোলেই বেড়ে ওঠেছেন। দাসীর সঙ্গে দিদি হিরন্ময়ী কর্তৃত্ব ফলাতে গিয়ে একদিন সরলার মাথা ভরা কোকরা চুল এবড়ো-থেবড়ো করে প্রায় নেড়া করে দেয়। মা-বাবা বাড়িতে ছিলেন না। ফিরে এসে বাবা বললেন ওরকম মাথা নিয়ে কারোর সামনে বের হওয়া চলবে না— সাতদিন তাই ছাদের ঘরে বন্দি প্রায় অবস্থায় থাকতে হয়।

আদরের চেয়ে শাসনেই গড়ে ওঠেছেন। তবে ঠাকুরদা পল্লীজমিদার জয়চন্দ্র ঘোষালের আগমণ হলে বাড়ির পরিবেশ পাল্টে যেত। তাঁর স্নেহবিগলিত "দিদি, দিদি" স্বরে বাড়ির মরুভূমিতে হিমেল হাওয়া বইত। সঙ্গে নিয়ে আসতেন কদ্‌মা-কাসুন্দি-পাটালি ও কলসীগুড়। সিমলার বাড়িতে পিসেমশাই ত্রিপুরা স্টেটের ডাক্তার পরেশ নাথ মুখোপাধ্যায় আসতেন এবং সঙ্গে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ফনিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও আসতেন। তাঁর সঙ্গে পরে সরলার দিদি হিরন্ময়ীর বিয়ে হয়। পিসেমশাইর দেশের পণ্ডিত সতীশ মুখুজ্যে বাড়িতেই থাকতেন। পাঁচবছর বয়সে তাঁর কাছেই সরলার হাতে ঘড়ি হয়। 'Morning shows the day'– প্রবাদ বাক্যটির সঠিক প্রতিফলন হয় সরলার মধ্যে। আশ্চর্যজনকভাবে বর্ণ পরিচয়ের প্রথমভাগ প্রথম দিনেই শেষ করে ফেলে এবং এখবর বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। পিসেমশাইর নিকট থেকে পুরস্কার স্বরূপ নগদ অর্থ জুটে।

কিছুদিন পর সরলার বাবা জানকীনাথ ঘোষালের বিলেত যাওয়া স্থির হয় তাই ডেপুটি কালেক্টরের চাকরিতে ইস্তফা দেন। যদিও নানা অভাবিত কারণে বিলেত যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তবে সরলারা মায়ের সাথে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে চলে আসেন। ঠাকুরবাড়ির রীতি ছিল অন্নপ্রাসনে সকল শিশুদেরই জয়পুরি সাদা পাথরের এক সেট থালা-বাটি-গ্লাস দেওয়া হতো। কাঁশ পিতলের বাসন বামুন-ঝি-চাঁকররা ব্যবহার করতো। চায়ের চল ছিল না, পেয়ালাও ছিল না। রূপার বাটিতে দুধ দেওয়া হতো। সরকারি রান্নাঘরে দশ বারো জন ঠাকুর ভোরবেলা থেকে লেগে যেত। দুদিকের মেঝেতে পরিষ্কার কাপড় পেতে দুভাগে ভাত ঢালা হতো— যা উচু হয়ে প্রায় কড়িকাঠ স্পর্শ করতো। ভাতের পরিমানের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ব্যঞ্জনাদিও প্রস্তুত করতেন বামুনরা। রাতে প্রস্তুত করতেন লুচি তরকারি। দুপুরে এবং রাতে ভাত-ব্যঞ্জন এবং লুচি তরকারি পাথরের থালা বাটিতে করে সাজিয়ে মহল্লায় মহল্লায় দিয়ে আসতো। এ ছাড়াও প্রতি মহলে গিন্নীর বিশেষ রুচি ও স্বামীদের ফরমাস অনুযায়ী বিশেষ রান্না আলাদা করে হতো। নীচের সরকারি ও উপরের বেসরকারী রান্নার মধ্যে বিস্তর তফাৎ থাকতো— বাড়ির রান্না ও মেস বা হস্টেলের রান্নার মতো।

জোড়াসাঁকোতে সাত বছর বয়স পর্যন্ত মঙ্গলা দাসীর অধীনে ঘরে থাকতে হয়— তার খবরদারি ও হাতের মার সহ্য করে। আর বাইরে সতীশ পণ্ডিতের হাতে রুলের মার। ঠাকুরবাড়ির ছেলে মেয়েরা সবাই নিজ নিজ মহলাতে কড়া প্রহরায় নানা ধরনের বিদ্যাচর্চা ও সংগীত চর্চায়

সময় অতিবাহিত করতো। সরলা সাফল্যের সঙ্গে পড়াশোনা ও সংগীতের তালিম নিতে লাগলো। কাজে কাজেই প্রশংসাও জুটতে লাগলো। মায়ের ঘরে পিয়ানো শেখানোর জন্য একজন মেম আসতেন। রোজ এক ঘন্টা পিয়ানো অনুশীলন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মা। যা সরলার একেবারেই ভালো লাগতনা। এ কথা তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনের ঝরাপাতায়' অকপটে স্বীকার করেছেন। সমব্যথী সুপ্রভা দিদি তাঁকে পরামর্শ দিলেন রেওয়াজের সময় ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নিলেই সমস্যার সমাধান হয়। সরলা মাকে ভয় পেত—কাজেই সুপ্রভাদি নিজেই তা করে দিলেন মায়ের গৃহান্তরের সুযোগে। তবে মা তা বুঝে ফেললেন এবং রেওয়াজের সময় তখন থেকে এক ঘন্টার পরিবর্তে আধ ঘন্টা হয়ে যায়।

সাড়ে সাত বছর বয়সে ১৮৮০ সালে তাঁকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। এই স্কুলটি বেথুন সাহেব ১৮৪৯ সালের ৭ই মে স্থাপন করেন এশীয়দের সহায়তায় বালিকাদের জন্য। ১৮৭৮ সালে বালীগঞ্জের 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়' এর সঙ্গে সম্মিলিত হয়। কলেজ বিভাগ ও খোলা হয়। ১৮৮৮ সালে এটি প্রথম শ্রেণির কলেজে রূপান্তরীত হয়। এখান থেকে মহিলারা এম.এ. পরীক্ষায়ও বসতে পারতেন। সরলা ১৮৮৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৯০ সালে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে বি.এ. পাশ করেন। এ কৃতিত্বের জন্য তিনি 'পদ্মাবতী মেডেল' পান।

স্কুলে যাতায়াতের পথে, ক্লাশে, টিফিন পিড়িয়ডে সরলার অনেক অতৃপ্ত আকাঙ্খা পূরণ হতে লাগলো। ছাত্রীদের সকলের মধ্যমণি হয়ে ওঠলেন। বাড়িতে যেমনই স্নেহের কাঙাল, স্কুলে তা পুষিয়ে গেল। ইংরেজি রূপ কথার গল্প শোনার জন্য তাঁকে ঘিরে থাকতো ছাত্রীরা। প্রিয় সরলা দিদিকে অনেক ছাত্রী বাড়িতে নেমন্তন্ন করে ওর পছন্দের জিনিস খাওয়াতো। পাশ করে বেরিয়ে যাবার পরেও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রাকলগ্নে ডাক পড়ত ছাত্রীদের গান অভিনয় শিখিয়ে দেবার জন্য এবং সাজানোর জন্য। সরলার নিপুন নির্দেশে এবং পারদর্শিতায় অনুষ্ঠানগুলি মনোজ্ঞ হয়ে ওঠতো। স্কুলে ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অত্যন্ত প্রিয় পাত্রী হয়ে ওঠেছিলেন সরলা। বি.এ. পাশের পরও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ইংরেজি কবিদের গ্রন্থাবলি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন।

স্কুলে ভর্তি হবার পরই বাড়িতে একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা ঘটে। সরলার দু'বছরের ছোট বোন উর্মিলার মৃত্যু। উর্মিলা ছিল নূতন মামীর অত্যন্ত আদুরে। সে নূতন মামীর সাথে বাইরের তেতালাতেই থাকতো। যেন নিঃসন্তান নূতন মামীর সন্তান। শুধু স্কুলে যাবার সময় পাল্কীতে চড়ে একসঙ্গে যেত—বাকি সময় সেখানেই। নূতন মামী হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চমপুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী। একদিন নূতন মামীর ছাদের বাঁকা সিঁড়ি দিয়ে গোলাবাড়ির দিকে নামতে গিয়ে পড়ে যায় এবং মাথায় চোট পেয়ে মৃত্যু হয়। সেদিন বাড়িতে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। কেউ খেলতে যায়নি। যে যার ঘরে। উর্মিলা আর ফিরে আসবে না সেটা বুঝতে বেশ সময় লেগেছিলো সরলাদের।

সরলা কম বয়স থেকেই পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গীতেও পারদর্শী হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বাড়ির ছোটদের তাঁর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি পিয়ানোতে প্রকাশ করার কাজ দিলেন। সবার মধ্যে একমাত্র সরলাই রবিমামার এ কাজটি সার্থকভাবে করতে পেরেছিলেন। তখন সরলার বয়স মাত্র বারো এবং জন্মদিনে কাশিয়াবাগানের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ এলেন একখানা খাতা নিয়ে। যার উপর সুন্দর করে লেখা "Socatore Composed by Sarala" রবীন্দ্রনাথের 'সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে'—ব্রহ্মসংগীতটিকে সরলা ইংরেজি বাজনার সুরে তালে এমনভাবে বেঁধেছিলেন যা পিয়ানো বা ব্যান্ডে বাজানোর মতো। না জানলে কেউ বুঝতে পারবেনা যে এটি একটি দেশি গান। রবিমামার নির্দেশ ছিল খাতাটিতে গানের নোট লিখে রাখার। রবীন্দ্রনাথের আরো অন্যান্য গানেও সরলা ইউরোপীয় সুর দিয়েছিলেন— যা অপ্রকাশিত রয়েগেছে। সরলা যেখানে যে গান শুনতে পেতেন তাই শেখার ঝোঁক ছিল। ভিখারিদের পয়সা দিয়ে তাদের গানও আয়ত্ত করতেন। মাঝিদের থেকেও গানের সুর আহরণ করতেন। এসবের একমাত্র সমঝদার ছিলেন রবিমামা। নূতন কোন সুর শিখলে তাঁকে না শুনিয়ে শান্তি পেতেন না। রবীন্দ্রনাথ সরলার শেখা কথা ও সুর থেকে নূতন গান রচনা করতেন। 'কোন্ আলোকে প্রাণের প্রদীপ,' 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,' 'আমার সোনার বাংলা'—এগুলি মাঝির সুর থেকে সরলার আহরিত সুরে বসানো। এছাড়া আরো বহুগানে সরলার সংগৃহীত সুরে তিনি সুর দিয়েছেন। 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে', 'এস হে গৃহ দেবতা', 'এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ', 'চির বন্ধু চির নির্ভর' প্রভৃতি। সরলা তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন "বাড়ির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রহীতা ছিলেন রবিমামা, তাই আমার দাত্রীত্ব পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল তাঁতে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত 'বন্দেমাতরম' সংগীতটির প্রথম দুলাইনের সুর রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন এবং তাই গাওয়া হতো। একদিন তিনি সরলার উপর ভার দিনেল বাকি লাইনগুলিতে সুর বসানোর জন্য। এ দুরুহ কাজ সরলা অনয়াসে করে দিলেন দেখে রবীন্দ্রনাথ খুশি হলেন। এরপর থেকে পুরো গানটি গাওয়া হতো। শুধু সংগীতের জগৎ নয়—সাহিত্যের জগতেও রুচি গড়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ম্যাথু আর্নল্ড, ব্রাউনিং, কীটস্, শেলি প্রভৃতির রস ভাণ্ডার তিনি সরলার চিত্তে ছড়িয়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি সরলার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল এবং এর সাক্ষ্য স্বরূপ উনার জন্মদিন পালন সরলাই প্রথম শুরু করেন। তখন রবীন্দ্রনাথ ৪৯নং পার্ক স্ট্রীটে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে থাকতেন। ৭ই মে ভোরে সরলা কাশিয়াবাগান বাড়ি থেকে বকুল ও বেল ফুলের মালা ও অন্যান্য ফুল জোগার করে এক জোড়া নূতন ধুতি চাদর সহ এনে রবিমামার পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে তাঁকে জাগালেন। বাড়িতে সাড়া পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। এরপর ক্রমে বড়দেরও জন্মদিন পালনের রীতি হলো।

সরলার মেজমামা সত্যেন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যমপুত্র। তিনি ভারতবর্ষের প্রথম আই.সি.এস ও অন্যান্য নানা গুনে খ্যাত ছিলেন। তাঁর পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী বিলেত থেকে এসে

নিজ ছেলে মেয়েদের জন্মদিন পালন শুরু করেন। বিকেলে সবাইকে জলযোগের নিমন্ত্রণ করতেন। বাড়ির ছোট বড় সবার উপর তিনি নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

সরলা বেথুন কলেজ থেকে বি.এ. অনার্স পাশ করে দু-তিন বছর 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকেন। সংস্কৃতে এম.এ পরীক্ষা দেবার জন্য বাড়িতে প্রস্তুতি চলছিল। অবশ্য পরীক্ষা আর দেওয়া হয়নি। এদিকে মনের ভেতর উদ্দাম চাঞ্চল্য বাড়ির পিঞ্জর ছেড়ে বেড়িয়ে ভাইদের মতো স্বাধীন জীবিকা নির্বাহের জন্য। মায়ের সম্মতি মিলল। পিতা জানকীনাথ 'সক্রোধ সম্মতি' দিলেন। দাদা মশাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কোন আপত্তি করলেন না। অথচ তখনও ঠাকুর বাড়ির কন্যা ও বধূগণ গঙ্গাস্নানের অভিপ্রায় করলে বাড়ির ভেতর পাল্কীতে চড়তেন এবং পাল্কীসহ গঙ্গায় ডুব দিয়ে আনা হতো। মেজপুত্রবধূ জ্ঞানদানন্দিনীর বিলেত যাওয়া নিয়ে কোন সমস্যা হয়নি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন আধুনিক ও অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাই তাঁর পরিবারের সদস্যগণ বিভিন্ন দিকে খ্যাতির শীর্ষে ওঠতে পেরেছিলেন।

সরলা 'ভারতী'-তে 'প্রেমিকসভা' নামে একটি হাস্যরসাশ্রিত লেখা লিখে সাড়া ফেলে দেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ খুশিতে অভিনন্দন পত্র পাঠান। প্রশংসা পেয়ে সরলার কলম তরতরিয়ে চলতে লাগলো। সংস্কৃত কাব্যের আলোচনামূলক লেখা—'রতিবিলাপ', 'নীলের উপোস', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'মালতীমাধব'— একে একে লিখলেন। পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। 'রতি বিলাপ' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্র' পড়ে স্বয়ং সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র প্রশস্তি করে চিঠি লিখেন। রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমের চিঠি সরলাকে সাহিত্য জগতে পাকা আসন করে দিল। বঙ্কিমের চিঠির সাথে এসেছিল তাঁর নিজের বই এর এক সেট নিজ হস্তাক্ষর যুক্ত উপহার স্বরূপ।

মা-বাবা ও দাদামশায়ের অনুমতি পেয়ে সরলা মহীশূর পাড়ি দিলেন মহারানী গার্লস স্কুলে কাজ করার জন্য ১৩০১ বঙ্গাব্দে। সে সময়ে মেজমামা সত্যেন্দ্রনাথ সেতারা থাকতেন। মায়ের সাথে সরলা সেতারা চলে আসেন। তারপর মেজমামা নিয়ে আসেন তাঁকে মহীশূর। এখানে এক বৎসর কাজ করে ১৩০২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ন মাসে বরদার মহারানীর প্রাইভেট সেক্রেটারী রূপে ৪৫০ টাকা বেতনে যোগদান করেন। অবশ্য ফাল্গুন মাসেই পুনরায় মহীশূরে মহারানীর স্কুলে অধ্যাপিকার কাজে যোগদান করেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বহু অর্থের বিনিময়ে দক্ষিণী ও বেনারসী পণ্ডিতদের আচার্যরূপে নিয়োগ করেছিলেন সংস্কৃতের সঠিক উচ্চারণ শেখাবার জন্য। সরলা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। কাজেই মহীশূরের পণ্ডিতদের প্রশংসা পেতে অসুবিধা হয়নি। সরলার চোখে ধরা পড়ে বাংলা অঞ্চলে স্কুল-কলেজে ছাত্রছাত্রীরা সংস্কৃতে কথা বলার অভ্যাস করে না। আগে ব্যাকরণ শুরু করা হয়—বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ কৌমুদি দিয়ে। আর দক্ষিণে ডাইরেক্ট পদ্ধতিতে প্রথমেই বাক্যের ব্যবহার শেখানো হয়। কলকাতায় প্রথম পাঠ্য পুস্তক থেকে শেষ পাঠ্যপুস্তক—সবই দেবনাগরী অক্ষরে লেখা নেই—বাংলা অক্ষরে লেখা। সরলার পড়ার

অভ্যাস ছিল— লেখায় তেমন সরগর না হলেও বিলম্বে তা মহাত্মাগান্ধীর তত্ত্বাবধানে রপ্ত হয়। আর উচ্চারণগত ত্রুটি সরলাকে ভীষণ পীড়া দিত। বাংলার অনেক পণ্ডিত ব্যাকরণ শুদ্ধ অনর্গল বলতে পারতেন তবে উচ্চারণ হত অশুদ্ধ।

কলকাতায় এম.এ. পড়া শুরু হয়েছিল— শেষ হয়নি। মহীশূরের ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরীর কিউরেটার মহাদেব শাস্ত্রী সরলাকে বই সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। মহীশূরে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের পুনরুদ্ধার ও পুনর্মুদ্রণ হত এবং জ্ঞান পিপাসুদের তা উপহার দেওয়া হতো। সে সুবাদে সরলা ট্রাঙ্ক ভর্তি বই উপহার পান।

সরলা বাড়ির বাইরে থেকে হাপিয়ে পড়েন। চাকরি করার শখ মিটে যায়। তার উপর ম্যালেরিয়ায় ধরে। বাধ্য হয়ে এ্যালোপ্যাথি ওষুধ গ্রহণ করেন। তিনি বরাবর হোমিওপ্যাথি ব্যবহার করতেন। তবে বাড়ির বাইরে থেকে মানসিক নানা পুষ্টি বৃদ্ধি পেল এবং এ অভিজ্ঞতা দেশের সেবায় নিয়োজিত করার ভাবনা এল।

সে সময়ে 'ভারতী' পত্রিকাটি ঠাকুরবাড়ির মণিমানিক্যের দ্বারা পরিচালিত ও সুশোভিত হলেও রবিঠাকুর আক্ষেপ করে পত্রিকায় লিখলেন—

শুধাই ঐ গো ভারতী তোমায়
তোমার ও বীণা নীরব কেন?
ভারতের এই গগণ ভরিয়া
ও বীণা আর মা বাজে না কেন?

কাজেই সঠিক সময়ে সরলা এসে ক্ষুরধার ও উদ্দীপ্ত লেখার মাধ্যমে ভারতবাসীকে জাগানোর কাজে মুখ্য ভূমিকা নিলেন। ইতিমধ্যে ভারতের অনেকটা সরলার দেখা ও জানা হয়ে যায়। ব্যায়াম চর্চা ও শরীর গঠনের জন্য তিনি আহ্বান জানান। নূতন নূতন ভাবনায় পত্রিকাটিকে তিনি অনুপ্রেরণার উৎসে পরিণত করলেন। যে কোন জায়গার, যে কোন ভারতবাসীর শৌর্য-বীর্যের ও আত্মত্যাগের কাহিনী সবিস্তারে প্রকাশিত হতে লাগলো। বঙ্গভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথ হাতে লালসুতো বেঁধে রাখিবন্ধন উৎসব করেছিলেন। এর পূর্বেই সরলা ছেলেদের দেশের কাজে উদ্দীপ্ত করার জন্য ভারতের মানচিত্রে মাথা ঠেকিয়ে ও হাতে লাল সুতো বেঁধে দিয়ে শপথ করাতেন, সরলার পরিকল্পনায় উৎসাহে এবং পরিচালনায় ভবানীপুরে মণিলাল গাঙ্গুলির সহায়তায় 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হল। কুস্তি, বক্সিং, তলোয়ার ও লাঠি চালানো খেলার প্রদর্শনী হয় এবং খেলার শেষে খেলোয়াড়দের সরলা মেডেল প্রদান করলেন। মেডেলে খোদাই করা ছিল "দেবাঃ দুর্বলঘাতকাঃ"। সভার প্রথমে মনিলাল সংক্ষেপে নিজের লেখা প্রতাপাদিত্যের বীরত্বপূর্ণ জীবনী পাঠ করলেন। এ ঘটনায় লোকের মুখে মুখে ও সংবাদপত্রে ঝড় উঠে। দেবী দশভুজা সশরীরে মর্ত্যে অবতীর্ণ হলেন বুঝি।

কাশিয়াবাগান থেকে ২৬নং সার্কুলার রোডের বাড়িতে থাকা কালীন বাড়ির পেছনদিকে ছোটখাটো একটা চৌকোনা জায়গা ছিল— সেখানে সরলা নিয়মিতভাবে টেবিল চেয়ার নিয়ে বসে থেকে ছেলেদের অস্ত্র চালনা পরিচালনা করতেন। তাদের হাজিরা নিতেন এবং প্রয়োজনীয় জিনিস-দস্তানা, ঢাল, ছোরা, তলোয়ার, বড় ও ছোট লাঠি ইত্যাদি যোগান দিতেন। বাঙালি জাতির যে বদনাম—অলস-শান্ত-শিষ্টতা ঘোচাবার জন্য নানাভাবে সচেষ্ট হলেন। বি.এ. এম.এ পাশ ছেলেরাও সরলার নিকট আসতে থাকে। ক্রমে এ ক্লাবের খবর পুলিশের নিকট যায়। তবে তিনি দমবার পাত্রী ছিলেন না।

অধিকন্তু দুর্গাপূজার অষ্টমীদিন 'বীরাষ্টমী' ব্রত উদ্‌যাপন করার ব্যবস্থাপনা নূতন করে শুরু করলেন। এটা পুরনো ব্রতই— লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কলকাতার সমস্ত ক্লাবকে আমন্ত্রণ করা হল অংশ গ্রহণ করার জন্য। ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। খেলার শেষে প্রত্যেককে 'বীরাষ্টমী' পদক দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পদকের এক পিঠে লিখা ছিল— 'বীরো ভব' অপর পিঠে লিখা ছিল 'দেবাঃ দুর্বলঘাতকাঃ'। কাপড় ঢাকা মঞ্চে বাড়ির মহিলাগণ বসেছিলেন। সরলার মা, মাসি, মামিসহ এবং মঞ্চে আবৃত থেকে শুধু হাত বের করে খেলোয়ারদের পদক দেন। 'বীরাষ্টমী' উৎসবের অনুষ্ঠান পদ্ধতি চালু হল এবং সারা বাংলায় তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কলকাতার মূল অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করতে আসতে পারতেন না—স্ব স্ব জায়গায় উৎসব পালন করতেন। এছাড়া বিভিন্ন জায়গা থেকে সরলার নিকট আবেদন আসতে থাকে তাঁর ক্লাবের সদস্য পাঠাতে বিভিন্ন খেলাধূলার অনুশীলন চর্চা করানোর জন্য। দুর্গাপূজার সময় বড় লোকদের বাড়িতে যে বাইনাচের প্রচলন ছিল তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। এক কথায় বাংলার জাতীয় চরিত্রের প্যাটার্ণ তিনি বদলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলার "Joan of Arc", "দেবী চৌধুরানী" ইত্যাদি নানা নামে তিনি ভূষিত হতে লাগলেন। সে সময় ভারতীতে তাঁর 'আহিতাগ্নিকা' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। যা বঙ্গবাসীকে দেশপ্রেমে ও শৃঙ্খল মোচনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে আহতদের সেবা করবার জন্য ইংরেজদের রেডক্রশ সোসাইটির মতো 'বেঙ্গলী রেডক্রস' গঠনের ভাবনা তাঁর মাথায় এল। অর্থের প্রয়োজন— তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে বিভিন্নজন অর্থের হাত প্রসারিত করেছিলেন। সে সময়েই তিনি সম্পূর্ণ নিজের খরচে 'লক্ষ্মীভান্ডার' খুললেন কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে। স্বদেশী ও সুরুচিবোধ জাগ্রত করার জন্য শুধু মেয়েদের বস্ত্র ও দ্রব্য এতে স্থান পেয়েছিল। বৌবাজারেও তাঁর উদ্যোগে 'স্বদেশী স্টোরস' খোলা হয়। তিনি আপাদমস্তক স্বদেশী বেশভূষায় বিয়ে বাড়ি ও নানা অনুষ্ঠানে যোগদান করে সমাজের চোখ খুলে দিলেন। তাঁকে দেখে মানুষ স্বদেশীয়ানায় উদ্বুদ্ধ হয়।

জাতীয় জীবনে সাহস, বল, বিদ্যা, একতা, স্বাবলম্বন ও স্বায়ত্তশাসন—এ ষড়মার্গের প্রয়োজনীয়তা তরুণদের উপলব্ধি করাতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং 'ভারতী' ছিল এসব ক্রিয়াকান্ডের প্রধান মাধ্যম। নিত্য নতুন ভাবনায় জারিত হয়ে সেগুলিকে রূপদান দিতেন। যে

সব লেখক লেখিকাদের লেখায় পত্রিকাটি শাখা-প্রশাখায়, পত্রপুষ্পে সুশোভিত হয়ে ওঠেছিল তাঁদের পারিশ্রমিক দেবার রেওয়াজ তিনিই প্রথম শুরু করলেন। এরপর অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা ঘটতে শুরু করে। আর একটি জিনিস তিনি সম্পাদনা কালে করে দেখালেন— সেটা হলো যথা সময়ে পত্রিকা প্রকাশ করে পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দেওয়া। সচেতন পাঠক-পাঠিকাগণ বলতেন "ওঃ আজ মাসের ১লা যে 'ভারতী' এসে গেছে।" তাঁর নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমের প্রভাব অন্যান্য সাময়িকীতেও পড়েছিল। দেখাদেখি সবাই নিয়মিত ও সময়মতো পত্রিকা প্রকাশে ইচ্ছুক ও তৎপর হলেন।

পুরনো লেখকদের লেখা দিয়ে পাতা ভর্তি করে সহজেই পত্রিকা ছাপানো যায়। কিন্তু তিনি কোন নতুন লেখক পেলে তার লেখাটিকে নিজে খেঁটে পরিমার্জন করে গুণগ্রাহী করে তুলতেন। প্রথম কয়েকবার যত্ন নিলে একজন ভালো লেখক তৈরি হয়ে যায়—তা তিনি বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন। মালী যেমন বাগানের পদ্মকুড়ির পাপড়িগুলি এক এক করে খুলে ধরে সেরূপ তিনি প্রতিভার কুড়িগুলিকে যত্নের সঙ্গে পরিচর্যা করে পূর্ণ বিকশিত করে তুলতেন। তাঁর সম্পাদনা কাজ শুধু যান্ত্রিক ছিল না— মানবিক গুণে সমৃদ্ধ ছিল। তিনি পত্রিকাটির গৌরব বৃদ্ধির জন্য অবাঙ্গালি বিখ্যাতদের ইংরেজি রচনা বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতেন।

হিরন্ময়ীদেবী ও সরলাদেবী যৌথ দায়িত্বে 'ভারতী'র সম্পাদনা করেছেন ১৩০২ থেকে ১৩০৪ পর্যন্ত। তিনি একা দায়িত্বভার কাঁধে নেন ১৩০৬ থেকে ১৩১৪ পর্যন্ত। পরে আবার ১৩৩১ এর আশ্বিণ থেকে সম্পাদনায় ব্রতী হন পাঞ্জাব থেকে ফিরে এসে। সে যাত্রায় একাদিক্রমে আড়াইবছর এ বিশাল কাজে রত ছিলেন এবং সঙ্গে সাহিত্য চর্চা।

বিষয়ভাগের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাড়ি ও পাশের ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্র গুনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ির উৎসব অনুষ্ঠান পৃথক ধরনের হয়ে গেল। মহর্ষির বাড়িতে ১১ই মাঘ অন্য বাড়ির দুর্গাপূজার মতো বিবেচিত হতো। বাস্তবে দুর্গাপূজার সঙ্গে এর বিস্তর ফারাক। মাটির প্রতিমা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বাড়িতে এনে রঙ করা ও চোখ মুখ ফুটিয়ে তোলা এবং প্রত্যেকের নতুন কাপড় পরা। এছাড়া বারো মাসে তেরো পার্বনতো ছিলই। ধর্মীয় বিশ্বাস হেতু মহর্ষির বাড়ি ও অন্যান্য ঠাকুর বাড়ি আলাদা হয়ে গেল। সামাজিক মেলামেশা, দ্রব্য আদান প্রদান বন্ধ হয়ে গেল অন্য বাড়ির সাথে। তবে মহর্ষির বাড়িতে ১১ই মাঘ সকাল থেকে ওঠানে তৈরি মঞ্চে শুদ্ধভাবে বৈদিক মন্ত্রপাঠ হতো। বেদিতে তিন জন আচার্য থাকতেন। সংগীত ও বিশুদ্ধ স্তোত্র পাঠ শোনার জন্য প্রচুর লোক সমাগম হতো। ১১ই মাঘ ঠাকুর বাড়ির মেয়েদের গান শোনার জন্য বাড়ি উপচে পড়ত। অবশ্য গান গাওয়া হতো ধ্রুপদী চালের গাম্ভীর্য রক্ষা করে।

ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ঐক্য স্থাপিত হোক। উনার এ মতকে সম্মান দিয়ে পাঞ্জাবের আর্যসমাজের

বড় নেতা, দেশপ্রেমী, সুবক্তা, সমাজসংস্কারক, সুপুরুষ ও ব্রাহ্মণ রামভজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে সরলার পরিণয়ের বিষয়ে পরিবারের সকলেরই আন্তরিক সমর্থন ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আর্যসমাজের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহী ছিলেন। মাতা স্বর্ণকুমারী দেবীরও শেষ ইচ্ছা সরলা যেন বিয়ে করে। রামভজ দত্ত চৌধুরী সরলার উপযুক্ত পাত্র বলে আত্মীয়গণ সকলেই পছন্দ করলেন। সরলাও বিয়েতে মত দিলেন—কাউকে নিরাশ করলেন না। আবার কেউ কেউ মনে করলেন শৃঙ্খলিত ভারতমাতা একজন প্রকৃত সৈনিক ও ত্রাতাকে হারাবে। তবে দিদি হিরন্ময়ীর মানবিক আবেদনে সাড়া না দিয়ে সরলা পারলেন না। অবশ্য পাত্রের দুবার বিয়ে হয়েও বিপত্নীক। সরলা গিয়েছিলেন হিমালয়ে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী আশ্রমে। সেখানে হিমালয়ের স্নেহক্রোড়ে কেদার-বদ্রী-অবলোকন করে এবং বিবেকানন্দের গুরু ভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকট উপনিষদ ও গীতা অধ্যয়নে একাগ্রচিত্ত ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সরলার পরিচয় পূর্বেই ঘটেছিল। সরলার শিক্ষার গভীরতা ও পরিপক্বতা দেখে তিনি তাঁকে তাঁর কর্মকাণ্ডের সহযোগী করতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয় বিদেশ ভ্রমণেও তাঁকে সঙ্গী হিসাবে পেতে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সরলা যেতে অপ্রস্তুত ছিলেন। মায়াবতী আশ্রমে তখন অধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দ। তিনি সেখানে একটি উচুমানের ইংরেজি পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত' সম্পাদনা করতেন। আশ্রমের ব্রহ্মচারীদের বেদান্তের ক্লাশ নিতেন। পাশাপাশি অতিথি অভ্যাগতদের সৎকারের কাজও নিজহাতে করতেন। জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ মিলেমিশে একাকার। কোন স্বার্থপরতা নেই, রয়েছে শুধু কর্তব্যের ও সেবার অনুপ্রেরণা।

লোকের কথা অনুযায়ী সরলার বিয়ের ফুল ফুটেছে—কাজেই তাঁকে হিমালয় থেকে নেমে আসতে হলো। মা-দিদিরা বৈদ্যনাথে আছেন। লক্ষ্ণৌ এসে গাড়ি বদলাতে হয়। লক্ষ্ণৌ এর প্রবাসী বাঙালিরা সরলা আসবেন জেনে এক বৃহৎ সভার আয়োজন করে মানপত্র প্রদান করেন। অতুল প্রসাদের বাড়িতে থেকে সরলা বৈদ্যনাথের দিকে রওয়ানা হন। বৈদ্যনাথ নেমে সটান পাল্কীতে চড়ে কনে সেজে সরলা চলে আসেন বিয়ে বাড়িতে। দু'এক দিনের মধ্যে আত্মীয় স্বজনে বাড়ি ভরে গেল। বোলপুর থেকে রবিমামা, বড়মামা দ্বিজেন্দ্রনাথ, রাঁচী থেকে নতুন মামা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মেজমামা সত্যেন্দ্রনাথ, মেজমামী জ্ঞানদানন্দিনী, কলকাতা থেকে ইন্দিরা (সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা) ও প্রথম চৌধুরী (ইন্দিরার স্বামী), বড় মাসিমা (সৌদামিনী দেবী) আরও অনেকে আসেন। অন্য একটি বাড়িতে বর পক্ষদের এনে রাখা হলো। সরলার সম্মতিতে আর্যসমাজের বিয়ের পদ্ধতি ও হোমের মাধ্যমে উভয়ের বিয়ে সম্পন্ন হলো। সালটা হলো ১৯০৫। বিয়ের পর সবাই কলকাতায় চলে আসেন। সেখানে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের আপ্যায়ন করা হয়। তারপর রামভজের কর্মস্থল লাহোরে নবদম্পতি চলে যান। তিনি সেখানে একজন ব্যবহারজীবী হিসেবে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ১৯০৭ সালের ৩রা জানুয়ারী তাঁদের একমাত্র সন্তান দীপকের জন্ম হয়। ১৯০৫ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত

সরলা পাঞ্জাব ছিলেন এবং বিভিন্ন সমাজহিতকর কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সঙ্গে সাহিত্য চর্চাও অব্যাহত ছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের পরিপূরক হয়ে কর্মের ঢেউ বিস্তার করতে থাকেন। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে এই বিদগ্ধ দম্পতি যোগদান করতেন।

১৯১০ সালে এলাহাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় সরলা নিখিল ভারতীয় মহিলা সম্মেলন এর আয়োজন করেন জাজিরার মহারানীর সভানেত্রীত্বে। উক্ত অধিবেশনে সরলা 'ভারত স্ত্রী মহামন্ডল' স্থাপন কল্পে ভাষণ দেন। বিভিন্ন রাজ্যের রানীগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সহায়তায় কলকাতা দিল্লিসহ ভারতের বিভিন্নস্থানে ভারত স্ত্রী মহামন্ডলের শাখা স্থাপিত হয়। এই শাখা সমিতির মাধ্যমে অন্তঃপুরে নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা চালু হয়।

সরলার ইংরেজি বুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। উর্দু 'হিন্দুস্থান' সাপ্তাহিকের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করে চালাতে তাঁর কোন বেগ পেতে হয়নি। রাজনীতিতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ছিলেন উগ্রপন্থী। লাহোরে সরলা দেবীর কার্যকলাপে গোটা পাঞ্জাবের মহিলাগণ আত্মোন্নতির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেন। আর্যসমাজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অনউন্নতদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করা। একাজে পন্ডিত রামভজের অসামান্য অবদান—আর নারী শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন যোগ্য সহধর্মিনী সরলা।

সৈন্যবিভাগে বাঙালিদের প্রবেশে নানা বিধি নিষেধ ছিল। তা দূর হয় ১৯১৭ সালে এবং তখন সরলা লাহোর থেকে বাংলায় আসেন এবং পূর্বের কৌশল অনুযায়ী বাঙালি তরুণদের সৈন্যদলে ভর্তি হতে উৎসাহিত করলেন। তাঁর 'বুদ্ধসংগীত' এবং বিভিন্ন বক্তৃতা 'আহ্বান', 'উদ্বোধন', 'অগ্নিপরীক্ষা' ভারতীতে প্রকাশিত হয়।

রাওলাট আইন (১৯১৯) ভারবাসীকে বিপ্লবী সন্দেহে আটক করার এক ধারালো অস্ত্র হিসাবে উপস্থিত হয়। বহু বিপ্লবী বন্দী হলেন। পাঞ্জাবের বিশিষ্টদের মধ্যে পন্ডিত রামভজও গ্রেপ্তার হন অনির্দিষ্ট কালের জন্য। 'হিন্দুস্থান' উর্দু ও ইংরেজি সংস্করণ দুইটিই বন্ধ করে দেয় ইংরেজ সরকার। তখন সরলা যে তেজস্বিতা দেখিয়েছেন— তা সকলকে চমকে দেয়। দেশের অবস্থা অগ্নিগর্ভ। এমন সময় গান্ধীজী 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন জারী করলেন। এদিকে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড। দত্তচৌধুরী পরিবারের উপর সরকারের দৃষ্টি পড়ে। হিন্দুস্থান প্রেসটিও বন্ধ করে দেয়। মহাত্মাগান্ধীর সঙ্গে সরলাদেবীর পরিচয় দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের এবং তাঁর বাসস্থান হয়ে ওঠে সরলার বাড়ি। সরলা রামভজের একমাত্র পুত্র দীপককে পাঠানো হয় গান্ধীজীর সবরমতি আশ্রমে পড়াশোনার জন্য। ১৯১৯ সালের অমৃতসর কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়। রামভজও স্বগৃহে ফিরে আসেন। ১৯২০ সালে কলকাতায় ন্যাশনাল কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়— সভাপতি লালা লাজপত রায়। ৩১শে জুলাই হঠাৎ বালগঙ্গাধর তিলক মারা যান। সরলা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছুটে যান বোম্বাই—শব শোভাযাত্রায় যোগদানের জন্য।

মহাত্মাগান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে সরলা মনে প্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়েন। চরখা খদ্দরের প্রবর্তনে এবং মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনে সরলা মনে প্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়েন। চরখা খদ্দরের প্রবর্তনে তিনি ছিলেন মহাত্মার দক্ষিণহস্ত। সরলার এই রাজনৈতিক আদর্শের পরিবর্তনে স্বামী রামভজ মর্মাহত হলেন। তিনি আমৃত্যু তাঁর আদর্শে অটল থাকেন। সরলা বানপ্রস্থে যেতে চাইলেন এবং স্বামী রামভজের অনুমতিক্রমে হৃষিকেশে হিমালয়ের আহ্বানে চলে যান। আর্যসমাজ পুরুষের পাশাপাশি নারীরও 'বানপ্রস্থ' স্বীকার করে। কিন্তু হিমালয় বাস দীর্ঘায়িত হয়নি। রামভজ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সরলা খবর পেয়ে ছুটে আসেন এবং পতির সেবায় ও চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করেন। অবশেষে ১৯২৩ সালের ৬ই আগস্ট মুশৌরীতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সরলা আর হিমালয়ে যাননি। চলে আসেন কলকাতায় এবং এখানেই তিনি আমৃত্যু থেকে যান। সরলা শেষ জীবনে আধ্যাত্মিকতায় ঝুঁকে পড়েন। ১৯৩৫ সালের মাঝামাঝি হাওড়ার আচার্য শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মার সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁর মুখে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনে তাঁকে গুরুপদে বরণ করেন। গুরু বিজয়কৃষ্ণের বাণীগুলিকে সরলা লিপিবদ্ধ করে রাখতেন— যা পরে 'বেদবানী' নামে প্রকাশিত হয়।

১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট এই বিরাট কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর সারগর্ভ রচনা যা 'ভারতী'-তে প্রকাশিত হয়েছিল—সেগুলি অমূল্য সম্পদ। সরলা দেবী চৌধুরানী ও রামভজ দত্ত চৌধুরীর একমাত্র সুযোগ্য পুত্র দীপক দত্ত চৌধুরী আইন ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি সবরমতি আশ্রম ও শান্তিনিকেতনে থেকে ভাবতের দুই দিকপাল ব্যক্তিত্ব মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন।

মানবপ্রেমী পপ-সম্রাট

পপ-সম্রাট, সুরের যাদুকর মাইকেল জ্যাকসান আর নেই, চির নিদ্রায় শায়িত—এ খবর ছড়িয়ে পড়ে ২৫শে জুন ২০০৯ বৃহস্পতিবার রাতে। তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় রাত ২টা ২৬ মিনিটে রোনাল্ড রেগান ইউ সি এল এ মেডিকেল সেন্টারে। লস এঞ্জেলসের বাড়িতেই তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন। জীবনভর গগনচুম্বী খ্যাতির সঙ্গে বিতর্ক যেমন ছিল তেমনি মত্যুও হল বিতর্কের অবকাশ দিয়ে। তাঁর ব্যক্তিগত ডাক্তার কোনারড মারে জ্যাকসনের মৃত্যুর সাক্ষী। হাসপাতালে নেবার পথে কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ মারে জ্যাকসনের সাথে অ্যাম্বুলেন্সে ছিলেন। তাঁকে মরফিন, পেথিডিন গোত্রের ব্যথানাশক ওষুধ 'ডেমেরল' ইঞ্জেকশান দেওয়ার ৫০ মিনিট পরেই ব্যাপক হার্ট এ্যাটাক হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের গতি কমতে থাকে। আস্তে আস্তে নির্জীব হয় শরীর। অন্তিম সময়ে জ্যাকসনের পাশে ছিলেন মা, তিন ভাই ও দুই বোন।

ডাঃ মারেকে পুলিশ তিনঘন্টা ব্যাপী জিজ্ঞাসাবাদ করেন— কিন্তু ৫০ বৎসর বয়সী জ্যাকসনের অকাল মৃত্যুর বিষয়ে কোন নূতন সূত্র মিলেনি। ময়না তদন্তে পাকস্থলিতে নানা ধরনের ট্যাবলেটের অংশ পাওয়া যায়। খাদ্যদ্রব্য ছিল না। সঠিক তদন্তের জন্য দ্বিতীয়বার ময়না তদন্তের আদেশ দেওয়া হয়।

শিকাগোর শিল্প শহর গ্যারিতে এক নিম্নবিত্ত কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারে মাইকেল জোসেফ জ্যাকসনের জন্ম ২৯ আগস্ট ১৯৫৮ সালে। বাবা ছিলেন ইস্পাত কারখানার শ্রমিক। কিন্তু তিনি গান ভালবাসতেন। জ্যাকসনরা ছিলেন নয় ভাইবোন—এর মধ্যে তিনি সপ্তম। অভাব অনটনের সংসারে ও পিতার নিগ্রহের মধ্যে ছোট বেলা কাটে। কিন্তু গান ও তাল উনার রক্তে-অস্থিতে-মজ্জায়। মাত্র এগারো বৎসর বয়সে পেশাদার গায়ক হয়ে ওঠেন। বন্ধুদের নিয়ে তৈরি করেন 'দি জ্যাকসন-৫'। একক অনুষ্ঠান প্রথম করেন ১৯৭১-এ। আর ১৯৭৭ সালে এলভিস প্রিসলের মৃত্যুর পর তিনিই হয়ে ওঠেন পপ দুনিয়ার অবিসংবাদিত সম্রাট। ১৯৮০'র দশক থেকে সারা বিশ্বকে তিনি বশ করে রাখেন। জনপ্রিয়তার সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়ে বিক্রি হয়েছে তাঁর পাঁচটি সোলো স্টুডিও অ্যালবাম—'অফ্ দা ওয়াল' (১৯৭৯), 'থ্রিলার' (১৯৮২), 'ব্যাড' (১৯৮৭), 'ডেঞ্জারাস' (১৯৯১) এবং 'হিস্ট্রি' (১৯৯৫)। 'থ্রিলার' বিক্রি হয়েছে ৫ কোটির ওপর।

মেয়লি কণ্ঠ, জটিল বাদ্যযন্ত্রের বিচিত্র ব্যবহার, মঞ্চে আলো ছায়ার নাটকীয়তায় পপ ঘরানার নক্সা ও সংজ্ঞা দুটোই রক্ এন্ড রোলের পর বরাবরের মতো পাল্টে দিয়েছেন।

সংগীতকে দর্শনীয় করে তোলার কৃতিত্ব তাঁর এবং তিনিই এর পথিকৃৎ। তিনি শুধু ব্রেক ডেন্সের শিল্পী ও গায়কই ছিলেন না— তিনি ছিলেন গীতিকার, প্রযোজক, কোরিওগ্রাফার, অ্যারেঞ্জার, লেখক ও ব্যবসায়ী।

১৯৯৩ সালে ওপ্রা উইনফ্রের অনুষ্ঠানে বলতে গিয়ে ছোটবেলায় বাবার হাতে নির্যাতিত হবার কথা বলে তিনি কেঁদে ফেলেন। আবার ঐ সময়েই শিশু নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে যা তাঁর জনপ্রিয়তায় কিছুটা বিরূপ প্রভাব ফেলে। তিনি ১৩টি গ্রামি পুরস্কার পেয়েছেন। ৮টি গিনেস বুক রেকর্ড তাঁর দখলে। ১৯৮৩ সালে নাচের এক নতুন স্টাইল 'মুন ওয়াক' দর্শকদের নিকট উপস্থাপন করলেন।

বি বি সি কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন-'লেখেন না কেন আমি মঙ্গল গ্রহের প্রাণী! অবশ্যই লিখবেন আমি কাঁচা মুরগি খাই, মধ্যরাত্রে ভুডু নাচি। আপনারা সাংবাদিক, যা লিখবেন সকলে তাই বিশ্বাস করবে।'

১৯৮৪ সালে বহুজাতিক সংস্থা পেপসির বিজ্ঞাপনের জন্য কাজ করতে গিয়ে একটি সেটে আগুন ধরে তাঁর চুলে আগুন লাগে এবং শরীরের সিংহ ভাগ পুড়ে যায়। অসহ্য যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে চিকিৎসকগণ তাঁকে শক্তিশালী বেদনানাশক 'ডেমেরল' খেতে পরামর্শ দেন।

'রক এন্ রোল' এর রাজা এলভিস প্রেসলি মারা যান মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে। রেখে যান একমাত্র সন্তান লিজাকে। ১৯৯৪ সালে লিজাকে বিয়ে করেন জ্যাকসন। লিজা ছিলেন পিতা প্রেসলির যোগ্য উত্তরসূরী। অবশ্য তাঁদের বিয়ে টেকে মাত্র দুই বৎসর। প্রাক্তন স্বামী জ্যাকসনের মৃত্যুর পর লিজা প্রেসলি তাঁর নিজস্ব ব্লগে লিখেন—বহুদিন আগে জ্যাকসনের সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে নিবিড়ভাবে কথাবার্তায় জানতে চেয়েছিলেন বাবার জীবনের শেষ মুহূর্তের কথা। এলভিস প্রেসলিরও আকস্মিক মৃত্যুর কারণ ছিল অতিরিক্ত ওষুধ সেবন। এ কথা জেনে জ্যাকসন বলেছিলেন তিনিও একদিন ঠিক এভাবেই হঠাৎ করে চলে যাবেন। লিজার এ ব্লগটির শিরোনাম 'ও জানত'।

সেবিকা ডেবি রো-এর সঙ্গে বিয়ে হয় ১৯৯৭ সালে এবং বিচ্ছেদ ১৯৯৯ সালে। জ্যাকসনের তিন ছেলে-মেয়ের মধ্যে বড় ছেলে প্রথম প্রিন্স মাইকেল (১২) এবং মেয়ে প্যারিস (১১) এর মা ডেবি রো। অসম্ভব খামখেয়ালি জ্যাকসনের প্রথম আত্মজীবনী 'মুনওয়াক' বেরোয় ১৯৮৮ সালে। ঐ বছরই ক্যালিফোর্নিয়ায় ৩ হাজার একর জমিতে তৈরি করেন খামার বাড়ি 'নেভারল্যান্ড'।

সেখানেই পাঁচ বছর পর তাঁর দিদি শিশু নিগ্রহের অভিযোগ আনেন— পরে অবশ্য অস্বীকার করেন। এর পরেই মাদক নেওয়া শুরু করেন জ্যাকসন। ২০০৩ সালে আবার শিশু

নিগ্রহের পুনরাবৃত্তি ঘটে। ২০০৫ সালেও মামলায় জড়িয়ে পড়েন। জ্যাকসনের তৃতীয় সন্তানের বিষয়টি রহস্যাবৃত। তাকে 'ব্ল্যাঙ্কেট' নামে ডাকা হয়। সারোগেট মা হিসেবে ওকে যে মহিলা গর্ভে ধারণ করেছিলেন তাঁর নাম কখনো প্রকাশ্যে আসেনি। সিএনএন জানিয়েছে—সম্ভবত জ্যাকসনের জীবনের সাথে ঐ মা-র কোন সম্পর্ক নেই।

মাইকেল বরাবরই বিতর্কিত জীবন যাপন করেছেন। ইউরোপ-আমেরিকার বিনোদন সংবাদ মাধ্যমের শীর্ষে ছিলেন তিনি। বার্তা সংস্থা 'ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বিলাসবহুল জীবনযাত্রা এবং 'হাইপ্রোফাইল স্ক্যান্ডাল'-এ জড়িয়ে পড়ার জন্য তাঁকে ৫০০ মিলিয়ন খোয়াতে হয়েছিল। ৫০ বছরের জীবনে তাঁর গানের ৭৫০ মিলিয়ন কপি বিক্রির অনবদ্য রেকর্ড স্থাপন করে গেছেন। ১৯৮৫ সালেই এ টি ভি মিউজিক চ্যানেল থেকে জ্যাকসনের আয় হয়েছিল ৪৭.৫ মিলিয়ন ডলার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এ সংস্থা জন লেনন এবং পল ম্যাকার্টনির মত গায়কের ২৫১টি গানের চুক্তি ছিনিয়ে নিয়েছিল। ১৯৯৫ সালে ১৫০ মিলিয়ন ডলার আয় হয়েছিল সোনি চ্যানেলের ক্যাটেলগ স্বত্ব বাবদ। জীবনে পর্বত প্রমাণ অর্থ রোজগার করেও দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়েন। জ্যাকসনের আইনজীবী ও আর্থিক উপদেষ্টা জানিয়েছেন বেহিসেবি অর্থ ব্যয়ই এর একমাত্র কারণ। এক জায়গা থেকে অন্যত্র যাবার জন্য চার্টার্ড প্লেন নিতেও দ্বিধা করতেন না।

মাত্রাতিরিক্ত মাদক ওষুধ খাওয়ার ফলে পৌস্টিকতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি হয়। খাদ্য গ্রহণেব ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি উচ্চতার মাইকেল জ্যাকসনের ওজন ছিল ৫০ কেজিরও কম। কঙ্কালসার দেহ।

আমেরিকার কৃষ্ণকায় মানুষদের মনের ব্যথা দ্রুততার সঙ্গে যাঁরা বলেছেন তাদের মধ্যে একজন মাইকেল জ্যাকসন। ২৭-বৎসর বয়সে মাত্র দেড় দিনে আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য গান লেখেন-'উই আর্ দি ওয়ার্ল্ড'। ৪৫ জন শিল্পী এ গানে অংশ নিয়েছিলেন। সাড়ে সাত মিলিয়ন অ্যালবামের কপি বিক্রি হয় এবং পুরো টাকাটাই আফ্রিকানদের সাহায্য বাবদ দেওয়া হয়েছিল। জ্যাকসনের সমস্ত গানই ছিল মানবিক আবেদন পূর্ণ। প্রকৃতিকে রক্ষা, যুদ্ধ থামানো বা দুর্গতদের সাহায্যের আবেদন। তিনি ছিলেন মানবপ্রেমী।

মানুষের সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া মানুষ মাইকেল জ্যাকসন। স্টেজ শো যে জনসমুদ্রে পরিণত হতে পারে তা তিনিই দেখালেন। এলভিস প্রিসলি এবং জর্জ লেননের যথার্থ উত্তরসুরি। পপ সংগীতকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে রাঙিয়ে প্রমাণ করেছিলেন সৃষ্টির শেষ নেই। বাবার অত্যাচারে তাঁর শৈশবের স্মৃতি কন্টকিত। তাই তাঁর বেশিরভাগ ভিডিও অ্যালবামে ঘুরে ফিরে শিশুরা আসত এবং এভাবেই তিনি হারানো শৈশবকেই খুঁজতেন। দর্শকরাও ফিরে পেতেন তাঁর গানে নাচে নিজেদের সত্ত্বাকে। শিশু জ্যাকসনের রোজগারের পয়সায় মদে গলা ভেজাতেন পিতা জোসেফ জ্যাকসন। সে নষ্ট হওয়া দিনগুলির কথা মাথায় রেখেই মঞ্চে ওঠে উদাত্ত কণ্ঠে গাইতেন- 'ডাজ নট্ ম্যাটার হু ইজ্ রং অর রাইট'।

২৫ শে জুন বৃহস্পতিবার মারা যাবার দু'দিন আগে মঙ্গলবারের মহড়ায় তিনি পূর্বের ন্যায় ঝলসে ওঠেন। লন্ডনে ১৩ জুলাই থেকে অনুষ্ঠান করার কথা ছিল। ৫০টি অনুষ্ঠানের জন্য চলছিল শেষ প্রস্তুতি। সঙ্গী নৃত্য শিল্পীদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করছিলেন । যে আলোক চিত্রী ছবি তুলছিলেন — তিনি বলেন, মাইকেলের প্রতিটি পদক্ষেপ শিহরণ জাগাচ্ছিল। সঙ্গে মায়াবী কণ্ঠস্বর।

৮ বছর বয়স থেকেই জ্যাকসন স্টেজে গান গাইতে শুরু করেন। ক্ষুদে শিল্পী হিসেবে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই খ্যাত হয়ে যান কৃষ্ণাঙ্গ ক্লাবগুলিতে। তাঁকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৭২ সালে 'মোশন' গ্রুপ থেকে জ্যাকসনের চারটি একক অ্যালবাম বের হয় এবং এগুলি সমাদৃত হয়। ১৯৭৫ সালে যোগ দেন 'সি বি এস্ রেকর্ডস্'এ । পরবর্তী সময়ে এর নাম দেওয়া হয় 'দা জ্যাকসনস'। আট বছর এ গ্রুপের হয়ে প্রচুর লাইভ শো করেন এবং নাম আরও ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। তখন থেকেই মাইকেল লিখতে শুরু করেন। 'টিল ইউ গেট এনাফ', 'ডোন্ট ইউ স্টপ', 'রক ইউথ ইউ' - গানগুলি আমেরিকায় সেরা দশে জায়গা করে নেয়। ১৯৭৯ সালে এবং ১৯৮০ সালে তিনটি আমেরিকান অ্যাওয়ার্ড পান। রয়েলটিতেও তিনি রেকর্ড করেন। দেশের মোট রয়েলটির ৩৭ শতাংশ আসে তাঁর ঝুলিতে। ১৯৮২ সালে 'সামওয়ান ইন দা ডার্ক' গানটি শিশুদের সেরা হিসাবে গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। এর পরই মুক্তি পায় চূড়ান্ত হিট অ্যালবামটি 'থ্রিলার'। ৮০ সপ্তাহ ছিল সেরা দশের তালিকায়। 'থ্রিলার' এর বিশ্বব্যাপী প্রচারে এগিয়ে এসেছিল এম টি ভি। আমেরিকান রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগান সে বছল তাঁকে সংবর্ধনা দেন এবং তিনি গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড ৮টি পান।

'থ্রিলার' এর ভুবনজয়ী সাফল্যের আগে থেকেই তিনি রূপ পরিবর্তনের চিন্তায় ছিলেন। 'কৃষ্ণকায়' রূপ পরিবর্তনের জন্য চিকিৎসা শুরু করেন—পাশাপাশি ব্রেক ডান্সের উপযোগী শরীর গঠনের জন্য খাওয়া কমাতে শুরু করেন। দু'দিকেই সাফল্য আসে—চামড়া হয়ে ওঠে আদর্শ। মুখের আদল পরিবর্তনের জন্য বহুবার কসমেটিক অপারেশন করান এবং ইপ্সিত মেয়েলি রূপ নেন। গান -নাচ নিয়ে যেমন পরীক্ষা -নিরীক্ষা জীবনব্যাপী চালিয়েছিলেন —তেমনি নিজ শরীর নিয়েও।

এ আর রহমান অস্কার পেয়ে পপ সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে যান। বলেছিলেন 'উই আর দ্য ওয়ার্ল্ড' এর মতো একটি নতুন সঙ্গীত সৃষ্টি করতে। আড়াই দশক আগে লায়নেল রিচির সঙ্গে করা গানকে নতুন করে শুনতে চেয়েছিলেন। এ আর রহমান শ্রদ্ধায় মাথা নেড়ে আসেন। চার-পাঁচ সেকেন্ড গেয়েও দেখিয়েছিলেন এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

হলিউড-বলিউড উভয়ই তাঁর কাছে ঋণী। সিনেমা-সঙ্গীত জগতের দিকপালগণ ভক্ত ছিলেন। মিঠুন চক্রবর্তীর স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি সত্তরের দশক থেকেই

তাঁকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছেন। মিঠুন যা কিছু করে দেখিয়েছেন বা মানুষ গ্রহণ করেছেন- সেটা তাঁকে অনুসরণ করেই। তিনিই ভিডিও অ্যালবামের জনক। পপ সঙ্গীতের আইকন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন জ্যাকসনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকবার্তা পাঠান ২৬ জুন, ২০০৯। সারা বিশ্বই এ ঘটনায় হতবাক, স্তম্ভিত। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে গভীর শোক জানিয়ে বার্তা আসে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা শোকবার্তা পাঠান। শোকবার্তা আসে চিন, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া থেকে।

অনেকেই বিশ্বাস করেন মাইকেল জ্যাকসনের মৃত্যু হয়েছে খ্যাতি, অবিচার আর কুৎসার বিষে। এক দশক ধরে মাইকেলের বিরুদ্ধে মিথ্যা শিশুকামিতার অভিযোগ তাকে মানসিকভাবে ভেঙ্গে দেয়। মাইকেলের শিশু সুলভ সারল্যের সুযোগে তাঁর কাছ থেকে টাকা হাতানোর অভিপ্রায়ে সবই ছিল সাজানো অভিযোগ। প্রধান অভিযোগকারী শেরিফ শেল্ডন সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে মাইকেল জ্যাকসনকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। এমনকি কয়েকজন মা তাদের শিশুদের ব্যবহার করেছিল মাইকেলের কাছ থেকে টাকা নেবার ফন্দিতে—অনেক দূর সফলও হয়েছিল। পরে বিভিন্ন সময়ে নিজেরাই মিথ্যা অভিযোগের কথা স্বীকার করে। এমনকি আমেরিকার ক্ষুব্ধ আদালতও রায় দিতে বাধ্য হয় যে সবই ছিল সাজানো অভিযোগ। কয়েকজন বিখ্যাত তারকা আদালতে জ্যাকসনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে তাঁকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলেন। কয়েকটি টিভি চ্যানেল তাঁর বিরুদ্ধে চলে যায়। নানা কুৎসা রটনা করে তাঁর বিরুদ্ধে। শিশু কামিতা মামলার বিচারের শুরুর দিকে তাঁকে দেখা গিয়েছিল আদালতের সামনে ভ্যানের উপর নাচতে। আর বিচারের মাঝখানে তাঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। আর বিচারের শেষে নির্দোষ প্রমাণিত হলেন— কিন্তু তাঁর দেহ ততদিনে রুগ্ন-ভঙ্গুর। অনেকেই বিশ্বাস করেন মাইকেল জ্যাকসনের বিরুদ্ধে একটা পরিকল্পিত চক্রান্ত চলছিল তাঁর শিল্প সত্ত্বাকে ধ্বংস করা তথা মাইকেলকে মানসিকভাবে ছিন্ন-ভিন্ন করা। বয়স্কদের প্রতারণায় আহত হয়ে শিশু ও পশু পাখিদের নিয়ে ভুলে থাকতে চেয়েছিলেন এবং তাদের ভালোবাসতেন। কিন্তু এর জন্য তাঁকে কঠোর মাশুল দিতে হল। ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, বর্ণবাদী বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর যে মহান শিল্পী সুলভ অবদান তা অনেকেরই উপলব্ধিতে আসেনি। ন্যূনতম চল্লিশটি দাতব্য সংস্থায় তিনি অর্থদান করেছিলেন। যে সংস্কৃতি মাইকেলকে মাইকেল বানিয়েছিল—সেই সংস্কৃতিই তাঁর প্রাণঘাতী হল।

মৃত্যুর দু'দিন আগে তিনি যে মহড়ার যাদু দেখিয়েছিলেন, তা সকলের মধ্যে শিহরণ জাগিয়েছিল। শেষ মহড়ার ভিডিও প্রকাশ্যে আসায় দেখা যায় মহাশিল্পীর প্রত্যাবর্তনের সেই রাজকীয় চমক। তিনি দেহে মনে চির কিশোর 'পিটার প্যান' থাকতে চেয়েছিলেন। তিনি পিতার মতো কঠোর, পাশবিক পুরুষ হতে চাননি— হতে চেয়েছিলেন সম্ভবত অর্ধনারীশ্বর।

৭ জুলাই মঙ্গলবার ২০০৯ মাইকেল জ্যাকসনের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাবার প্রস্তুতি চলে

লস্ এঞ্জেলসের স্টেপল্‌স সেন্টারে, ১১ হাজার ভক্তের ব্যবস্থা হয় মাত্র। অধিকাংশ ভক্তই সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। কনসার্টের আয়োজক এ ই জি—লটারির মাধ্যমে টিকিট বিতরণ করে বিনামূল্যে— তবে আমেরিকায় বসবাসকারীরাই শুধু সুযোগ পায়। বিভিন্ন চ্যানেল সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করে। সেখানে মাইকেল জ্যাকসনের মরদেহ আনা হয়। সেই আবেগঘন মুহূর্ত টি.ভি. চ্যানেলের দৌলতে সারা বিশ্ব চাক্ষুস করে।

ইতিমধ্যেই একটি গুঞ্জন ওঠে চিকাগোর ফিল্ড মিউজিয়ামে প্রদর্শিত প্রাচীন মিশরীয় এক প্রস্তর মূর্তির সঙ্গে মাইকেল জ্যাকসনের চেহারার হুবহু মিল। মূর্তিটি তিন হাজার বছরের পুরনো। মাইকেলের অস্ত্রোপচারের পর তাঁর চেহারার সঙ্গে বেশ মিল দেখা যায়— বিশেষ করে নাক ও চোখের। জাদুঘরের কিউরেটর জানান, প্রচুর লোক এসে পপ সম্রাটের খোঁজ করে। তিনি পুরনো আবক্ষ মূর্তিটি দেখিয়ে দেন।

মিউজিক লেজেন্ড মাইকেল জ্যাকসনের তিন সন্তানের দেখভালের দায়িত্ব পেয়েছেন উনার মা ক্যাথরিন জ্যাকসন (৭৯) গত ৩ আগস্ট আদালতের রায়ে। পপ তারকার ২৫ জুন মৃত্যুর পর থেকে এ বিষয়ে জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছিল। মাইকেলের দ্বিতীয় স্ত্রী ডেবি রোয়ের সঙ্গে বোঝাপড়ার পরই আদালতের সিদ্ধান্ত বের হয়।

২০০২ সালে এক উইলে জ্যাকসন তাঁর অবর্তমানে সন্তানের দেখাশোনার দায়িত্ব মায়ের হাতে অর্পণ করেছিলেন। সে অনুযায়ী আদালতের সিদ্ধান্তে জুন মাস থেকেই তিনি মাসোহারা পান। মাইকেল জ্যাকসন ৫০০ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ সম্পদ রেখে গেছেন। এখান থেকে তিন সন্তান সহ ডেবি রোয়ে মাসোহারা পান।

জ্যাকসনের মা ক্যাথরিন ও বাবা জোসেফ জ্যাকসন হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটনে পারিবারিকভাবে গোয়েন্দা নিয়োগ করেছিলেন। লন্ডনে কনসার্ট আয়োজক সংস্থা 'এ ই জি'র সঙ্গে মাইকেলের যে চুক্তি হয়েছিল তাও খতিয়ে দেখে গোয়েন্দারা। লস্ এঞ্জেল্‌স্ রিহার্সেলের প্রায় একশ ঘন্টার ফুটেজ রয়েছে 'এ ই জি'র হাতে। এগুলি দিয়ে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি বানানোর প্রস্তাব দিয়েছিল জ্যাকসন পরিবারকে। অর্থাৎ তাদের অনুমতি চেয়েছে। এ বিষয়ে ৭ আগস্ট ২০০৯ 'এ ই জি' এবং কলম্বিয়া পিকচার্সের মধ্যে প্রাথমিক চুক্তি হয়েছে। কলম্বিয়া পিকচার্স ৬ কোটি ডলার ব্যয় করতে চেয়েছে। ছবিটি নির্মিত হলে যে লাভ আসবে তার শতকরা ৯০ ভাগ পাবে জ্যাকসন কোম্পানি এবং বাকিটা পাবে এ ই জি লাইভ।

পপ সম্রাটের মৃত্যুর পর আর এক কুয়াশার জাল সৃষ্টি হয়েছে এ ই জি লাইভ এবং বিমাকারী প্রতিষ্ঠান রবার্টসন টেইলরের মধ্যে। রবার্টসন টেইলরের চিকিৎসক ডাঃ ডেভিড স্লাভিট পরীক্ষা করে ঘোষণা দিয়েছিলেন মাইকেল পুরোপুরি সুস্থ। কিন্তু মাইকেল মারা যাবার পর জানা যায় তাঁর একটি পা ভাঙ্গা ছিল। কসমেটিক সার্জারিতে মারাত্মক সমস্যা ছিল। 'এ ই

জি'র ভূমিকা নিয়ে মাইকেলের পিতা জোসেফ প্রশ্ন তুলেছেন। ৩ আগস্ট 'এ ই জি'র সঙ্গে মাইকেলের যে চুক্তি হয়েছিল তা দেখার জন্য মাতা ক্যাথরিনকে আদালত অনুমতি দিয়েছে।

পপ সম্রাটের মৃত্যুর পর করোনার যে বিষক্রিয়াজনিত পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য তাঁর মস্তিষ্ক নিয়ে যায় তা ফেরৎ পায় মাইকেলের পরিবার। তারপর সেটি শবদেহে পুনঃসংযোজন করে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করার ব্যবস্থা করে। চূড়ান্ত গোপনীয়তার মধ্যে তাঁর দেহ সমাহিত করা হয়েছে। সমাধিতে কোন চিহ্ন রাখতেও আগ্রহী নয় তার পরিবার। মাইকেলের মৃত্যুর দু'মাস পরে তাঁর বন্ধু ডাঃ হয়েফ্রিন জানান পপ সম্রাটের মৃত্যুর ঘটনা প্রথম তিন ঘন্টা গোপন রাখা হয়। তাঁর মৃতদেহ শয়ন কক্ষে স্থানান্তর করা হয়,অতিরিক্ত প্রপোফল নিজেই সেবন করার কারনে মৃত্যু হয়েছে—একথা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। মাইকেলকে হত্যা করা হয়েছে। এ রায় সংশ্লিষ্ট আদালত দিয়েছে। কাজেই মৃতুর রহস্য আরও জটিল হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট রায়ে জানা যায় মাইকেলের শরীরে কালসিটে ছাপ পড়েছিল রক্ত জমে গিয়ে। মাইকেলের পরিবার চায় তাঁর মৃত্যু রহস্য বেরিয়ে আসুক। তাতে শুধু ডাঃ কনরাড মারে নয়,আরো অনেকের নেপথ্যে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ২৯ আগস্ট এক ব্রিটিশ প্রভাবশালী সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে তার ছোট ছেলে দ্বিতীয় প্রিন্স মাইকেল ওরফে 'ব্লাঙ্কেট' এর জৈবিক পিতা মাইকেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু 'দ্য হোম এলোন' ছবিখ্যাত হলিউড তারকা অভিনেতা ম্যাকাগুলে কালকিন। তাঁর শুক্রাণু থেকেই ব্লাঙ্কেট এর জন্ম হয়েছে এক অজ্ঞাত নারীর গর্ভে। ১৯৯০ সালে শিশু শিল্পী হিসেবে কালকিন বিশ্বখ্যাতি পাওয়ার পর জ্যাকসনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়।

মিউজিক লেজেন্ড মাইকেল জ্যাকসনকে ১৮ আগস্ট ২০০৯ সমাহিত করার খবর প্রকাশিত ও প্রচারিত করা হলেও শেষ পর্যন্ত ঐ দিন তাঁকে সমাহিত করা হয়নি। স্থির হয় ৫১তম জন্মদিন ২৯ আগস্ট ২০০৯ তাঁকে সমাহিত করা হবে। এ পরিকল্পনা মাইকেলের পরিবারের। মাইকেল জ্যাকসনের মরদেহ গোপনে একটি বিশেষ স্থানে বিশেষভাবে নির্মিত রেফ্রিজারেটরে রাখা হয়েছে—কারণ মা ক্যাথরিন জ্যাকসন আশঙ্কা করছেন তাঁর ছেলের দেহ চুরি হয়ে যেতে পারে। তাই মরদেহ হলিউড হিলসের মোটাউনে কিংবদন্তী ব্যারি গার্ডির পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রের ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষে সাময়িকভাবে রাখা হয়। পরে সেটি আবার একটি অন্য সমাধি ক্ষেত্রে সরিয়ে ফেলা হয় স্বর্ণ ও কাচ দিয়ে বানানো বিশেষ শবাধারে।

তদন্তের স্বার্থে পূর্ব নির্ধারিত ২৯ আগস্ট ২০০৯ একান্নতম জন্মদিনেও তাঁকে সমাহিত করা সম্ভব হয়নি। সেদিন পপ সম্রাটের স্মরণে মেক্সিকোতে প্রায় ১৩ হাজার ভক্ত নেচে বিশ্বরেকর্ড করে। মেক্সিকো সিটির কেন্দ্রস্থলে তাঁর জনপ্রিয় 'থ্রিলার' অ্যালবামের মতো পোশাক পরে ১২ হাজার ৯৩৭ জন নেচে বিশ্বরেকর্ড করে। আর নাচ দেখতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার দর্শনার্থী ভিড় করে। স্পেনের বার্সেলোনায় ৭০০ ভক্ত 'থ্রিলার' গানের অনুকরনে নেচেছে। এ দুটি প্রদর্শনী গিনিস বুক অব রেকর্ডস-এ জায়গা পাবার দাবি রাখে। ২৮ আগস্ট ২০০৯ করোনার কার্যালয় থেকে এক প্রতিবেদনে জ্যাকসনের মৃত্যুকে হত্যাকান্ড বলে মন্তব্য করে এবং ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে বলা হয়। পপ সম্রাটকে ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯ সমাহিত করার কথাও ঘোষণা দেওয়া হয়।

মাইকেলের মৃত্যুকান্ডে শোকাস্তব্ধ তাঁর পরিবার। মাইকেলের মৃত্যু নিয়ে অনেক অজানা তথ্য প্রকাশ্যে আনতে একটি বই লিখছেন বোন জেনেট জ্যাকসন। জানা গেছে,মাইকেলের মৃত্যুতে তাঁর তিন সন্তানের উপর কতটা প্রভাব পড়েছে বা তাঁর নিজের জীবনে মাইকেলের কতটা প্রভাব ছিল তা জেনেট জানাবেন। পপ রাজার স্মৃতিতে বিশেষ সংখ্যা বের করবে টাইম ম্যাগাজিন। ৯/১১র পর এটাই পত্রিকার প্রথম স্মারক সংখ্যা। ভারতের বালি ভাস্কর সুদর্শন পট্টনায়েক পপ সম্রাটের ১৫ ফুট দীর্ঘ গীটারসহ মুখমন্ডলের অবয়ব পুরীর সমুদ্র বীচে মূর্তি গড়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। সে মূর্তির ছবি ভারতীয় বিভিন্ন পত্রিকায় যথাযোগ্য মর্যাদায় ছাপা হয়েছে। এটি নির্মাণে ১০ টন বালি লেগেছিল—আর সময় লেগেছিল পাঁচ ঘন্টা। মৃত্যুর ৭০ দিন পর লস অ্যাঞ্জেলসের গ্রেনডেল শহরতলির ফরেস্ট লন সমাধিতে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন পপ সম্রাট মাইকেল জ্যাকসন ৩ আগস্ট ২০০৯। তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানায় পরিবারের সদস্যসহ নামকরা সব তারকারা। ভক্তদের ভিড় সামলাতে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। আগের দিন রাত থেকেই সমাধিস্থলের আকাশে টহল দেয় পুলিশের হেলিকপ্টার। সঙ্গে পাহারায় থাকে পুলিশের কুকুর ও সাধারণ পোশাক পরা পুলিশ। জ্যাকসনের মা,বোন,তিন সন্তানসহ আত্মীয় স্বজনরা ৩০টি গাড়িরও বেশি বহর নিয়ে সমাধিস্থলে পৌছান। এর কিছুক্ষণ পরই সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় জ্যাকসনের মৃতদেহ। অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রায় দু'শ অতিথি। জ্যাকসনের পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও অংশ নেন বিখ্যাত বহু গায়ক গায়িকা,অভিনেতা-অভিনেত্রী।

প্রাণঘাতী মাত্রার এনেসথেটিক প্রপোফেল গ্রহণের কারনে ২৫ জুন ২০০৯ লস অ্যাঞ্জেলস এ বেভারলি হিলসের তাঁর ভাড়া বাড়িতে মৃত্যু হয় ৫০ বছর বয়স্ক জ্যাকসনের। তাঁর মৃত্যু নিয়ে নানা রহস্য ও সমাহিত করা নিয়ে বেশ কিছুদিন বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা চলে। মাইকেল জ্যাকসনের পিতা ৭৯ বছর বয়স্ক জোসেফ জ্যাকসন সন্দেহ করেন তাঁর পুত্রকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করা হয়েছে। তাঁকে অচেতন অবস্থায় হাসপাতাল নেওয়া হয়েছে শুনে তিনি হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে কোন অপরাধ জড়িত এ ধারনা হয়। সরকারীভাবে একবার এবং পারিবারিকভাবে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করেও কোন সঠিক কারণ জানা যায়নি। লস অ্যাঞ্জেলস কাউন্টি করোনার তিন ঘন্টা ব্যাপী পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েও বিভ্রান্তমূলক কোন কারণ পরীক্ষকগণ খুঁজে পাননি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত করোনার অফিস থেকে জানানো হয় তিনি হত্যাকান্ডের শিকার।

২৯ আগস্ট পপ সম্রাটের ৫১তম জন্মদিনে সমাহিত করার কথা ছিল কিন্তু তাঁর পরিবার স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেনি বলে সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত লস অ্যাঞ্জেলসের ফরেস্ট লন সমাধিস্থলেই তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়—যেখানে বহু বিখ্যাত তারকারা রয়েছেন শায়িত। অ্যাটর্নি জেরিল কোহেন জানিয়েছেন শেষ কৃত্যানুষ্ঠানে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েছে। তাঁকেসমাহিত করতে ১২টি প্লেন কেনা হয় তাতেই বিরাট খরচা হয় আর এ ব্যয়ভার মেটানো হয় জ্যাকসনের সম্পত্তি থেকেই।

মাইকেলের জীবনে যত বিতর্ক এসেছে তা উজ্জ্বল প্রদীপের তলার সামান্য অন্ধকার বৃত্তের মতো যা নজরে আসেনা। দেদীপ্যমান শিখার আলো এত প্রখর। তিনি নিজের ইচ্ছেমতো নিজেকে ভেঙেছেন, গড়েছেন, জোড়া লাগিয়েছেন বারবার। আর এই ভাঙাগড়ার যন্ত্রণা ভুলতে খেয়েছেন

ব্যথা নাশক ঘুমের ওষুধ। নিজেকে তিনি স্বেচ্ছায় হারিয়েছেন বারবার—আবার জেগে উঠেছেন মহাকাব্যিক ঢঙে। গায়ের রঙ পাল্টে ফেলেছেন—কৃষ্ণকায় শিল্পী হয়ে ওঠেন শ্বেতকায়। বিশ্ব সঙ্গীতের ভান্ডারে তিনি যে প্রকৃত তত্ত্ব রেখে গেছেন তা চিরকাল গবেষণার বিষয় হয়ে থাকবে।

ধর্ম পাল্টে আচমকাই 'মাইকেল' থেকে 'মিকাইল' হয়েছিলেন। স্টেজে ওঠে নাচ-গান করতে করতে দর্শক শ্রোতার উদ্দেশ্যে টুপি,গ্লাভস,গেঞ্জি,জামা ছুড়ে দিয়ে দানবীর হয়ে উঠতেন। মঞ্চের সঙ্গে শিল্পীর সঙ্গে দর্শক শ্রোতার এই নিবিড় তত্ত্বের উদ্ভাবক তিনিই। আপোসহীন সঙ্গীত শিল্পী এম জে পপ সঙ্গীতকে পৌঁছে দিয়েছিলেন এক অবিশ্বাস্য মাত্রায়। মাইকেল ছিলেন এক প্রতিবাদী চরিত্র। মানব দরদি না হলে প্রতিবাদ করা যায় না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি সঙ্গীতের মাধ্যমে ভালবাসার দীপ জ্বেলেছেন। আর এই ভালবাসার টানেই নাতি-নাতনিরা এম জে-র মৃত্যুর পর তার বাবা-মায়ের কাছে স্নেহ স্নিগ্ধ আশ্রয় পায়।

দৈনিক আরোহণ— বৃহস্পতি-শনিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ ইং

সর্বকালের ভারতের যথার্থ প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা ছিল, আছে এবং থাকবে। মহাপুরুষগণ এক একটা যুগের সৃষ্টি করেন, না এক একটা যুগ তার উপযোগী করে মহাপুরুষ সৃষ্টি করে — এনিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এ দু'টি কথাতেই সত্য রয়েছে। গাছের উৎপত্তি বীজে আর পরিণতিও বীজে। মহাপুরুষগণ এক একটা বড় যুগের সৃষ্টিও বটেন আবার তার স্রষ্টাও বটেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনকাল যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি বড় যুগ-এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ আত্ম উপলব্ধি তাঁকে তাঁর জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল। গাছপালা, পশুপাখি বেঁচে থাকে। কিন্তু সত্যি সেই বাঁচে যার মন মননের দ্বারা উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথ বলতেন মানুষ শুধু প্রাণবান জীব নয়, মানুষ মনোবান। শুধু প্রাণ ধারণ করে বেঁচে থাকাকে তিনি 'শরমের ডালি' বলে ধিক্কার জানিয়েছেন। মানুষের জীবনে 'মনস্বিতা'ই আসল — এ ইঙ্গিত তিনি বহুবার করেছেন। আশি বছরের জীবনে মননের ক্ষেত্রে তিনি যে ঐশ্বর্য জমা করে গেছেন—তা অনন্ত —পাঁচশ বৎসরের সমান বললে বোঁধ হয় কম বলা হবে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন —

'আমার জীবনে লভিয়া জীবন

জাগোরে সকল দেশ।'

শরৎচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বড় ভক্ত। তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি বলেছিলেন যে বর্তমান কালের কোন সাহিত্যিককেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। সুবিশাল ভারতবর্ষে মহাকবি জন্মেছেন চারজন। প্রথম তিনজন ব্যাস, বাল্মীকি ও কালিদাস এবং চতুর্থ জন হলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, তিনি মহাকবি। বিশ্ববরেণ্য ইউরোপের হোমার, ভার্জিল, দান্তে, শেক্সপীয়ার — এসব মহা কবিগণের সমগোত্রীয় তিনি। অর্থাৎ পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করে বলেছিলেন —

'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে

দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে।'

বাস্তবে বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় শ্রীবৃদ্ধি করতে না পারলেও বিশ্বকবি সভায় ভাস্বর হয়ে আছেন। তাঁর উজ্জ্বল দীপ্তিতে অন্যদের যেন কিছুটা ম্লান করে দিয়েছেন — কারণ তাঁর

ছিল সর্বতোমুখী প্রতিভা — যা অন্যদের মধ্যে বিরল। পৃথিবীর ইতিহাসে একই প্রতিভার মধ্যে কবিত্বশক্তি, অভিনয়, নৃত্য, সংগীত, চিত্ররচনার নৈপুণ্য, দার্শনিক চিন্তার গভীরতা, রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও কর্মের ঐকান্তিকতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনন্য সাধারণ অনুরাগ, পল্লী ও সমাজসেবার চিন্তা — এত কিছু কি কখনো সমন্বিত হয়েছে? মানবরত্নের এমন পরিপূর্ণ বিকাশ মানবের ইতিহাসে এই প্রথম। সব বিভাগে হয়তো তিনি সর্বোচ্চ স্থান দখল করেননি — তবে এমন সমন্বয় সাধনে জগতের মধ্যে তিনি অদ্বিতীয় — এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

যে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কর্ষণ করেছেন তা অন্যান্য মহাকবিদের থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর জন্ম পরাধীন রাষ্ট্রে। সমগ্র জাতি দুঃখে-কষ্টে ম্রিয়মান, সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে পঙ্গু। দুর্বল ও আত্মঘাতী কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। যে ভাষায় তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন তা ছিল অর্ধ বিকশিত ও ব্যঞ্জনাশক্তিহীন। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সেবায় বাংলা ভাষা নিজস্ব স্বচ্ছল গতি পেয়ে পৃথিবীর সমৃদ্ধ ভাষাগুলির পাশে জায়গা করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় বাক্‌রীতি ও ছন্দকে সুগঠিত করার কাজ ও পাশাপাশি তাঁর সৃষ্টির কাজ চালিয়েছিলেন। সুতরাং সংগ্রামটা তাঁকে অনেক বেশী করতে হয়েছে অন্যান্য মহাকবিগণের তুলনায়।

তাঁর পূর্বসুরীগণ বাংলা ভাষার মার্জনা করেছেন, তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেম-নবীন, বিবেকানন্দ — বহু চন্দ্র আমাদের জাতীয় জীবনচক্র উজ্জ্বল ও মধুর করে তুলেছিল — কিন্তু কালরাত্রির অবসান হয়নি। কালরাত্রি অবসান হয় প্রখর তেজা রবির কিরণে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু সুন্দরের উপাসক ছিলেন না। সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তিনি শুধু শান্তির ললিতবাণী শোনাননি, প্রয়োজনে কঠিন রুদ্রবীণাতেও ঝংকার তুলেছেন, মৃত্যুর আগে তিনি বিকৃত সভ্যতার নাগপাশ থেকে সাবধান হতে আহ্বান জানিয়েছেন—

'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।'

তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল অসাধারণ, কারোর চেয়ে কম তিনি স্বদেশকে ভালো বাসতেন না। তবে মাতৃভূমিকে কখনোই তিনি বিশ্বসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। তাই তাঁর স্বদেশ বন্দনায় দেখতে পাই —

'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর তোমাতে বিশ্বমায়ের
আঁচল পাতা।'

ঈশ্বরকে জগৎ থেকে আলাদা করে দেখেননি। তাই তো উদাত্ত কণ্ঠে তিনি গেয়েছেন—

'বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো,
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে নয় বিজনে
নয়কো আমার আপন মনে
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়
সেথায় আপন আমারো।'

তাঁর মহান হৃদয় সমগ্র বিশ্বকে একান্ত আপন করে নিয়েছে —

'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরম আত্মীয়, তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।
আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে ঘরের বাসনা মিটাতে।
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায় চিরজনমের ভিটাতে।।'

বিশ্বজগৎকে তিনি নিজ বাসগৃহ এবং সমগ্র বিশ্ববাসীকে পরম আত্মীয় বলে বরণ করে নিয়েছেন। বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করে দেশবাসীর মন জয় করে নিয়েছেন স্বীয় জ্যোতিতে। পৃথিবীর আর কোন মনীষীকে এভাবে ভূপ্রদক্ষিণ করে বীরের মতো বিশ্বজয় অর্থাৎ বিশ্বমানবের হৃদয় জয় করতে দেখা যায়নি। ঈশ্বরকে তিনি মানুষ থেকে আলাদা করে দেখেননি। 'নরদেবতা'ই ছিল তাঁর উপাস্য। 'মানুষের দেবতা' কেই তিনি শেষ নমস্কার জানিয়ে গেছেন। মহামানব দেবতার ধর্মই তাঁর চরম ধর্ম। তাই তো তিনি দৃঢ়ভাবে 'Religion of Man' প্রচার করেছেন — 'Religion of God' এর পরিবর্তে। সহজভাবে তাই তিনি বলেছেন — 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।' যে প্রেম কল্যাণময় তাকেই তিনি ধর্মের আসনে বসিয়েছেন। মানুষের মহিমাকে বিশ্বে এমন উজ্জ্বল করে আর কেউ দেখিয়েছেন বলে জানা নেই। তবে আমাদের দেশে তাঁর এক পূর্বসুরী অন্যতম মনীষী স্বামী বিবেকানন্দকে এবিষয়ে অগ্রজ বলে স্বীকার করতে হবে। মানুষ ছাড়া ঈশ্বর নেই কোথাও। সংসার বিরাগী ভক্ত ঈশ্বর লাভের আশায় পত্নীপুত্র ত্যাগ করে গৃহ থেকে নির্গত হলে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া — "দেবতা নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, 'হায়, আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়।"

আবার অন্যত্র বলেছেন —

'অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহাকে তুই খুঁজিস সঙ্গোপনে।
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নেই ঘরে।'

তবে তিনি আছেন কোথায়? —

'তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।'

তবে তাঁকে পাবার উপায় কি? উপায় জীবনেব কর্মসাধনা —

'রাখো রে ধ্যান, থাক রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি,
কর্মযোগে তার সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে।'

কিন্তু কর্মে যে বন্ধন কর্মে মুক্তি হবে কি করে? তার উত্তর এই —

'মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি?
মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে
বাঁধা সবার কাছে।'

তাই তো তিনি অন্যত্র অকুণ্ঠিত ভাবেই ঘোষণা করেছেন —

'বৈরাগ্যে সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ....
মোহ মোর মুক্তি রূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তি রূপে রহিবে ফলিয়া।'

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা সর্বকালের ভারতবর্ষকে পেয়েছি। ভারতবর্ষের বাহ্যরূপ

এবং চিত্তরূপ উভয়ই তাঁর সৃষ্টিতে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে — যা ভারতবাসীর নিকট শ্রেষ্ঠ উপহার। পৃথিবীর আর কোন দেশে এমনটি ঘটেনি। বেদ উপনিষদের বাণী নূতন করে আবার তাঁর সাহিত্যে ঝংকৃত হয়েছে। গৌতম বুদ্ধ ও রাজর্ষি অশোকের মৈত্রী ও প্রেমের বার্তা রবীন্দ্র সাহিত্যের মাধ্যমেই আবার তা নূতন করে ভারতবাসী পেল। তক্ষশিলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে ফিরে পেল রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর মধ্যে। মধ্যযুগের কবীর-মীরা-নানক প্রমুখ সাধকগণের ভক্তি সাধনার তত্ত্ব 'গীতাঞ্জলি'তে সার্থকভাবে ডালি সাজিয়েছেন। কালিদাসের কালের কাব্য সাহিত্য রবীন্দ্র সাহিত্যের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে। ভারতের বিলীয়মান সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করে বিশ্বদরবারে পৌঁছে দিয়ে ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন। একাজ প্রাচীনকালে করেছেন বুদ্ধদেব ও রাজর্ষি অশোক। আর আধুনিককালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আলেকজান্ডার পশুবলের বিজয়বার্তা ঘোষণা করেছিল, তার পরিবর্তে মৈত্রীর পতাকা উড্ডীন করেছিল প্রিয়দর্শী অশোকের শান্তি বাহিনী।

সম্রাট কবি শাজাহান অন্তরের বিরহ-বেদনাকে চিরন্তন ধরে রাখার স্বপ্নে তাজমহল নির্মাণ করেছিলেন। তেমনি রবীন্দ্রনাথ একধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সার্থক করে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে তাজমহল সমাধি মন্দির আর বিশ্বভারতী জীবনমন্দির — বিশ্বমানবের মহামিলন তীর্থ — নামের সার্থকবার্তা সর্বত্র স্বীকৃত। পৃথিবীতে অনেক মহাকবি এবং মনীষী জন্মেছেন — কিন্তু আর কারো চিত্তে বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন আসেনি। সুতরাং এ বিষয়ে তিনি জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। একজন পাশ্চাত্য মনস্বী মন্তব্য করেছিলেন ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীকে জন্ম দিয়েছে এবং শুধু এ কারণেই ভারতের স্বাধীনতা পাওয়া উচিত। বৈদেশিকদের দ্বারা ভারতের রাষ্ট্র ও চিত্ত উভয়েরই পরাজয় ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের সাধনার দ্বারা চিৎরাজ্যের পুনরুদ্ধারই স্বরাজ্যের অধিকার অর্জনের নামান্তর — আর তাতেই রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের এক অখন্ড ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা সফল হবে। এ সফলতাকে তরান্বিত করার জন্য ব্যাকুল চিত্তে সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন —

'মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে,
আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।'

পাশ্চাত্যের দাম্ভিক ও নিষ্ঠুর পশুশক্তির বিরুদ্ধে তিনি নির্ভীকভাবে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের বাণী উচ্চারণ করেছেন — তাঁর বিরুদ্ধে মাথা তুলে প্রতিবাদ করার সাহস কেউ দেখায়নি। সবাই নীরবে মেনে নিয়েছে। তিনি বিশ্বের ন্যায় বিচারের আসনে সগৌরবে অধিষ্ঠিতও হয়েছেন এবং তাঁর লেখনীতে বহু রাষ্ট্রপ্রধানের অন্তরে গোপন ভীতির সঞ্চার হয়েছিল।

দৈনিক আরোহণ— শুক্রবার, ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ ইং

জীবন সরণির উজ্জ্বল অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ থেকে ১৯৪১ : তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সারদাদেবীর চতুর্দশ সন্তান আর পুত্রদের মধ্যে অষ্টম। তাঁকে মহর্ষির সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বলা হয় — কারণ তাঁদের নবম পুত্র বুধেন্দ্রনাথ মাত্র তিন বৎসর জীবন ধারণ করেছিলেন। অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৮৬৪ সালে বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভ আর হাতে খড়ির অনুষ্ঠান হয় পরে ১৮৬৬ সালে। তাঁকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয় ১৮৬৮ সালে। এ বৎসরই রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা যাঁকে তিনি নতুনদাদা বলে ডাকতেন — জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বধূরূপে তাঁর প্রিয় নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর আগমন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে।

১৮৬৯ সালে গৃহশিক্ষক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ইংরেজি শিক্ষা শুরু এবং ভাগ্নে সত্যপ্রকাশের উদ্যোগে কবিতা লেখার সূত্রপাত। ১৮৭০ সালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারী স্কুল ছেড়ে নর্মাল স্কুলে তাঁকে ভর্তি করা হয়। ১৮৭১ সালে বেঙ্গল একাডেমিতে স্থানান্তর। ১৮৭৩ সালে উপনয়ন হয়। শান্তিনিকেতনে আসেন এবং পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণ। প্রথম নাটক 'পৃথ্বিরাজ পরাজয়' এ বৎসরই রচনা করেন। ১৮৭৪ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। এ বছর তিনি শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' ও কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' অনুবাদ করে ফেলেন এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয় — নাম 'অভিলাস'। ১৮৭৫ সালে জননী সারদাদেবীর মৃত্যু হয়। ১৮৭৬ সালে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ১৮৭৭ সালে 'ভানু সিংহের পদাবলী প্রকাশ এবং এ বছরই সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক 'এমন কর্ম আর করব না' ও 'অলীকবাবু'তে তিনি অভিনয়ের দ্বারা নাট্যাভিনয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটান। ১৮৭৮ সালে 'কবি কাহিনী' প্রকাশ হয়। মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে প্রথমে আমেদাবাদ নিয়ে যান — তারপর বোম্বাই - তাঁর এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর বাড়ি। সেখানেই পাণ্ডুরঙ্গর তড়খরকর এর মেয়ে অন্নপূর্ণা (ডাক নাম আন্না) তড়খরকর এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। আন্না ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বয়সী এবং প্রথম রবীন্দ্র অনুরাগিনী হিসেবে পরিচিতা। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা — তাই রবীন্দ্রনাথেরও আন্নার প্রতি অনুরাগ জন্মে। ব্যারিস্টারী পড়ার উদ্দেশ্যে বিলেত যাত্রা করেন। প্রথমে ইংল্যান্ডের ব্রাইটন পাবলিক স্কুলে — তারপর লন্ডন ইউনির্ভাসিটি কলেজে পড়াশোনা করেন।

তবে পড়া শেষ না করেই ১৮৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি দেশে ফিরে আসেন। সাহিত্যে পূর্ণ সময় দিতে লাগলেন। একের পর এক নাটক, গীতিনাট্য, উপন্যাস, কাব্য তিনি

সৃষ্টি করে চলেছেন। ১৮৮৩ সালে বাংলা ২৪শে অগ্রহায়ণ ১২৯০ সাল, রবিবারে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয় মৃণালিনী দেবীর সাথে। একাধারে সাহিত্য সৃষ্টি এবং সে সঙ্গে স্বীকৃতিও পেলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজ গলার মালা রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দেন। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হন। আর সে বছরই অর্থাৎ ১৮৮৪ সালে তাঁর প্রিয় নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেন। কাদম্বরী দেবীর অকাল ও আকস্মিক মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে ভারাক্রান্ত করে তোলে।

১৮৮৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবীর প্রথম সন্তান মাধুরীলতার জন্ম। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গান শুনে তৃপ্ত হয়ে তাঁকে ৫০০ টাকার চেক উপহার দেন।

১৮৮৮ সালে প্রথম পুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্ম। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা শান্তিনিকেতনে। তিনি সোলাপুর বেড়াতে যান। ১৮৮৯ সালে ডাক পড়ে জমিদারি দেখার জন্য এবং সপরিবার শিলাইদহে যান।

১৮৯০ সালে অল্প সময়ের জন্য লন্ডন যান। কলকাতা জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ১৮৯১ সালে 'ইউরোপের ডায়েরি' প্রথম খণ্ডেরর প্রকাশ। তৃতীয় সন্তান রেণুকার জন্ম। 'সাধনা' ও 'হিতবাদী' পত্রিকায় যোগদান করেন। শান্তিনিকেতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ছোটগল্প রচনায় হাত দেন ঐ সময়ে।

১৯৯২ সালে কাব্য 'চিত্রাঙ্গদা' এবং প্রহসন 'গোড়ায় গলদ' প্রকাশ হয়। 'সোনারতরী' লিখতে শুরু করেন।

১৯৯৩ সালে গীতিনাট্য 'গানের বহি' 'বাল্মিকী প্রতিভা' এবং 'ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ হয়। কনিষ্ঠ কন্যা মীরার জন্ম।

১৯৯৪ সালে কাব্য 'বিদায় অভিশাপ', 'সোনার তরী' এবং গল্পগ্রন্থ 'বিচিত্র গল্প' ১ম খণ্ড প্রকাশ হয়। কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের জন্ম। 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে।

১৮৯৫ সালে 'সাধনা' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। ভাইপো বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে কলকাতায় স্বদেশী সামগ্রীর দোকান খোলেন এবং কুষ্ঠিয়ায় পাটের ব্যবসা শুরু করেন। এবছরই গল্পগ্রন্থ 'গল্প দশক' প্রকাশ হয়।

১৮৯৬ সালে কাব্যগ্রন্থ 'চিত্রা', 'নদী' এবং নাটক 'শালিনী'র প্রকাশ। 'সংস্কৃত শিক্ষা' নামক পুস্তকটি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষ্যে 'ভুবন মন মোহিনী' গানটি লিখেন।

১৮৯৭ সালে 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'পঞ্চভূত', 'গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'নরকবাস'

ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। 'কল্পনা' গ্রন্থের কবিতাও লিখতে শুরু করেন। সুবিখ্যাত দেশপ্রেমী নেতাজীর জন্মও ঐ বৎসর।

১৮৯৮ সালে কলকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। রবীন্দ্রনাথ 'রিলিফ' এর কাজে অংশগ্রহণ করেন। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে 'মুখুজ্যে বনাম বাঁড়ুজ্যে', 'কথা কাহিনী' ও 'কল্পনার' কিছু কবিতা রচনা করেন।

১৮৯৯ সালে সপরিবারে শিলাইদহে বসবাস করেন এবং 'ক্ষয়িষ্ণু' ও 'কথা' প্রকাশ করেন। শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

১৯০০ সালে শিলাইদহে কুঠি বাড়ির বাগানে কলম চাষের উদ্ভাবন করেন। 'বিসর্জন' নাটকের 'রঘুপতি'র ভূমিকায় অভিনয়ও করেন — সে সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টি অব্যাহত থাকে। কাব্যগ্রন্থ 'কণিকা', 'কল্পনা' 'গল্পগুচ্ছ ১ম খণ্ড' প্রকাশ হয়।

১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ কাব্য সাহিত্যর ডালি 'নৈবেদ্য' প্রবন্ধ 'উপনিষদ ব্রহ্ম' এবং 'গল্পগুচ্ছ ২য় খণ্ড' এর প্রকাশ। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় লেখা শুরু করেন। মাধুরীলতা ও রেণুকার বিয়ে দেন। শিলাইদহ ছেড়ে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন।

১৯০২ সালে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয় এবং কবির বয়স মাত্র ৪১ বৎসর।

১৯০৩ সালে দ্বিতীয় কন্যা রেণুকার ক্ষয়রোগে মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি' উপন্যাসটি লিখেন।

১৯০৪ সালে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রকাশ হয়। সংবাদপত্রের উপর সেন্সরশিপ চালু হয় রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা আইনে।

১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। অপরদিকে কাব্যগ্রন্থ 'স্বদেশ', প্রবন্ধ 'আত্মশক্তি' গান 'বাউল' আত্মপ্রকাশ করে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ও শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সোচ্চার হন এবং রাখীবন্ধন উৎসব পালন করেন। 'ভাণ্ডার' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন।

১৯০৬ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাঠান। কাব্যগ্রন্থ 'খেয়া' প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষ' এবং উপন্যাস 'নৌকাডুবি' সৃষ্টি করেন। রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে ব্রিটিশ পুলিশের হামলা হয়।

১৯০৭ সালে শ্রী অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা প্রকাশ করেন। কন্যা মীরার বিবাহ দেন। আর কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রের কলেরায় মৃত্যু হয়। 'লোকসাহিত্য', 'প্রাচীনসাহিত্য', 'চরিত্রপূজা', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'হাস্যকৌতুক' এসব তাঁর কলম দিয়ে বেরিয়ে আসে ঐ বৎসর।

১৯০৮ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিধবা বিবাহ সম্পন্ন করেন প্রতিমা দেবীর সাথে। ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয়। নাটক-'শারদোৎসব', 'মুকুট', প্রবন্ধ 'রাজাপ্রজা' উপন্যাস 'প্রজাপতিরনির্বন্ধ' সমাপ্ত করেন।

১৯০৯ সালে কাব্য — 'শিশু', নাটক 'প্রায়শ্চিত্ত'প্রবন্ধ 'শব্দতত্ত্ব', 'ধর্ম', 'বিদ্যাসাগর চরিত' এবং সংকলন গ্রন্থ 'চয়নিকার' প্রকাশ। 'গীতাঞ্জলি' গ্রন্থেরও কাজ শুরু করেন। এ বছরই ক্ষিতিমোহন সেন এবং নন্দলাল বসুর সাথে পরিচয় ঘটে।

১৯১০ সালে 'গীতাঞ্জলি' লেখা শেষ করেন। নাটক 'রাজা' এবং উপন্যাস 'গোরা' প্রকাশিত হয়। রোদেনস্টাইল জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসেন এবং রবীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় অভিনয় করেন।

১৯১১ সালে কিশোর গল্প সংকলন প্রকাশ করেন এবং 'ডাকঘর' নাটক লিখতে শুরু করেন।

১৯১২ সালে 'চৈতালি', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন', 'জীবনস্মৃতি', 'ছিন্নপত্র' প্রকাশিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি লিট উপাধি প্রদান করে। তিনি তৃতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন।

১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৯১৪ সালে মহাত্মাগান্ধী শান্তিনিকেতনে আসেন। প্রমথ চৌধুরী কর্তৃক 'সবুজপত্র' পত্রিকার প্রকাশ এবং 'অচলায়তন' নাটকের প্রথম অভিনয় সুসম্পন্ন হয়। 'ডাকঘর' নাটকের ইংরেজি অনুবাদন করেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায় 'দি পোস্ট অফিস' নামে। কবির অসামান্য সৃষ্টি 'গীতিমাল্য', 'গীতালি', 'গান', ধর্মসঙ্গীত' প্রকাশিত হয়।

১৯১৫ সালে বৃটিশ সরকার কবিকে 'নাইট হুড' উপাধিততে ভূষিত করে। 'বলাকা', 'ঝড়ের খেয়া' লেখার কাজ সমাপ্ত করেন।

১৯১৬ সালে 'বলাকা', 'ফাল্গুনী', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে', 'সঞ্চয়', 'গল্প সপ্তক' প্রকাশিত হয়।

১৯১৭ সালে বিদেশে থেকে স্বদেশে ফিরে আসেন। প্রবন্ধ 'কার্তার ইচ্ছায় কীর্তন' প্রকাশিত হয়।

১৯১৮ সালে কবির অতি আদরের প্রথম সন্তান মাধুরীলতার মৃত্যু হয়। রবীন্দ্র স্নেহধন্য অজিত কুমার চক্রবর্তীরও মৃত্যু হয়। কাব্য 'পলাতক' এবং নাটক 'তোতা কাহিনী' লিখেন।

১৯১৯ সালে 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার প্রকাশ করেন। প্রবন্ধ 'জাপান যাত্রী', 'দি ম্যান অব দি ফরেস্ট' এর প্রকাশ। ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের

প্রতিবাদে তিনি ইংরেজ সরকারের দেওয়া খেতাব 'নাইট হুড' ত্যাগ করেন।

১৯২০ সালে নাটক 'অরূপরতন' এবং গল্প 'পয়লা নম্বর' এর প্রকাশ। তারপর তিনি ইউরোপ আমেরিকা ভ্রমণে যান। ইংল্যান্ড, প্যারী, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, আমেরিকা দর্শনকালে বিভিন্ন মণিষীদের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় ঘটে।

১৯২১ সালে তিনি নিজের বেশ কিছু বাংলা রচনা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এবছরই গান্ধিজীর সাথে দু'বার সাক্ষাৎ হয় কবির। প্যারিসে রমাঁ রোলাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

১৯২২ সালে কাব্য 'শিশুভোলা নাথ', নাটক 'মুক্তধারা', গল্প 'লিপিকা' এবং বক্তৃতা সংকলন 'ক্রিয়েটিভ ইউনিটি' প্রকাশ হয়। শান্তিনিকেতনে নজরুল আসেন।

১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রিয় শিষ্য সুকুমার রায়ের মৃত্যু ঘটে। গীতিনাট্য 'বসন্ত', 'রথযাত্রা', প্রবন্ধ 'সমবায় নীতি'র প্রকাশ হয়।

১৯২৪ সালে 'রক্তকরবী' নাটকের ইংরেজিতে অনুবাদ 'রেড ওলিয়েণ্ডার' এবং প্রবন্ধ 'সিটি এণ্ড ভিলেজ' প্রকাশ হয়। শান্তিনিকেতন থেকে 'ভূমিলক্ষ্মী' পত্রিকা বের হয়।

১৯২৫ সালে কাব্য 'পূরবী', নাটক 'গৃহপ্রবেশ', গান 'গীতিচর্চা', 'প্রবাহিনী'র প্রকাশ।

১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সরকারের অমানবিক নীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেন। দমনপীড়ন ও বিনাবিচারে ভারতীয়দের আটক রাখার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানান। 'প্রজাপতি নির্বন্ধ' এবং 'শোধবোধ' এর নাট্যরূপ দেন 'চিরকুমার সভা' ও 'কর্মফল' নামে। এ বৎসর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। কবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে পূর্ববঙ্গে আসেন। গান্ধিজিও শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিদেশ ভ্রমণে যান।

১৯২৭ সালে কবি 'লেখক' এর বাংলা ও ইংরেজি কবিতা, গীতিনাট্য 'ঋতুরঙ্গ' এবং 'গল্পগুচ্ছ' ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

১৯২৮ সালে কবি 'গোড়ায় গলদ' নামক প্রহসনের 'শেষ রক্ষা' নাম দিয়ে অভিনয়যোগ্য করে প্রকাশ করেন। এ বৎসর কবির জন্মদিন ২৫শে বৈশাখ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে কলকাতার বিচিত্রাভবনে পালিত হয়।

১৯২৯ সালে কবি 'মহুয়া' কাব্য, 'পরিত্রাণ' নাটক, 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা' উপন্যাস এবং ভ্রমণ কাহিনী 'পশ্চিম যাত্রার ডায়েরি' ও 'জাভাযাত্রীর পত্র' প্রকাশ করেন।

১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ 'শিশুতীর্থ' কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি রূপান্তর 'দ্য চাইল্ড' নামে প্রকাশ করেন। শেষবারের মতো ইউরোপ ভ্রমণে যান। প্যারিসে চিত্র প্রদর্শনী ও ফরাসী রেডিওতে বক্তৃতা দেন। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হয়।

১৯৩১ সালে জানুয়ারির শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ৭০ বছরের জন্মোৎসব

পালিত হয় দেশে। সংস্কৃত কলেজ কবিকে 'সার্বভৌম' উপাধি প্রদান করেন।

১৯৩২ সালে কবির উপস্থিতিতে কবি রচিত 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' গান শুনে মহাত্মা গান্ধী অনশন ভঙ্গ করেন।

১৯৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথ কাব্য 'বিচিত্রিতা' নাটক 'চণ্ডালিকা', 'বাঁশরী', প্রবন্ধ 'মানুষের ধর্ম', 'ভারত পথিক রামমোহন', উপন্যাস 'দুইবোন', 'নৃত্যনাট্য তাসের দেশ' প্রকাশিত হয়।

১৯৩৪ সালে জওহরলাল নেহরুর একমাত্র কন্যা ইন্দিরা শান্তিনিকেতনে ভর্তি হন। উপন্যাস 'মালঞ্চ', 'চার অধ্যায়', গীতিনাট্য 'শ্রাবণ গাঁথা', প্রকাশিত হয়।

১৯৩৫ সালে কাব্য 'বীথিকা' ও 'শেষ সপ্তক' লিখেন — এগুলি কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

১৯৩৬ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ব্রিটিশ সরকার কবির 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থটি নিষিদ্ধ করে। জওহরলাল নেহরুকে কবি চিঠি লিখেন শান্তিনিকেতন আসার জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি লিট উপাধিতে ভূষিত করে। গান্ধিজি ৬০ হাজার টাকার চেক দেন বিশ্বভারতীর জন্য।

১৯৩৭ সালে কাব্য 'ছড়ার ছবি', প্রবন্ধ 'কালান্তর', 'বিশ্বপরিচয়', গল্প 'সে' লিখেন। এবছর রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে দিল্লিতে এক জাতীয় সম্মেলনে কবির বাণী পঠিত হয়।

১৯৩৮ সালে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কবি ইকবাল ও কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। কবি তাদের মৃত্যুতে গভীর শোক জ্ঞাপন করেন। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি লিট উপাধি প্রদান করে। বিপন্ন চিনের উদ্দেশ্যে চিনা দিবস উপলক্ষ্যে কবি সাহায্যের আবেদন করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ৫০০ টাকা দান করেন। কাব্য 'প্রান্তিক', 'সেঁজুতি', প্রবন্ধ 'বাংলা ভাষার পরিচয়', সংকলন পত্রধারা ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

১৯৩৯ সালে শান্তিনিকেতনে জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর কবির উপস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়।

১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ 'নবজাতক', 'সানাই', স্মৃতিমূলক গ্রন্থ 'ছেলেবেলা', 'রবীন্দ্র রচনাবলী' - ৩য়, ৪র্থ, ৫ম খণ্ড, নিজের আঁকাছবির সংকলন 'চিত্রলিপি' প্রকাশিত হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি লিট উপাধি দেন। কবি কালিম্পং ভ্রমণ করে। বিশ্বভারতীর দায়িত্বভার নেবার জন্য গান্ধিজিকে পত্র লিখেন। রবীন্দ্রভুক্ত এন্ড্রুজের মৃত্যু হয়- মন্দিরে প্রার্থনা সভায় তিনি ভাষণ দান করেন। ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

১৯৪১ সালে হল কবির দীর্ঘজীবনের অন্তিম বছর। এবছর 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য',

'জন্মদিনে' এবং শেষ ছড়া 'শেষ লেখা', প্রকাশিত হয়। ৮০তম জন্মদিন ২৫শে বৈশাখে ত্রিপুরার মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য শান্তিনিকেতনে এসে কবিকে 'ভারত ভাস্কর' উপাধি দিয়ে যান। কবি নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যে, কাব্যে, চিন্তাধারায় ত্রিপুরা রাজ্যের কল্যাণ কামনা করতেন এবং ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার আলোকস্তম্ভ স্বরূপ কবিকে এ বিরল সম্মানে ভূষিত করে মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য নিজেও সম্মানিত হলেন।

কবি রোগশয্যায় শায়িত শান্তিনিকেতনে উত্তরায়নের একটি ঘরে খোলা জানালার ধারে। দু'জন বিশিষ্ট চিকিৎসক রাম অধিকারি (এ্যালোপ্যাথ) এবং রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত চিকিৎসক কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ আসেন (৭ই মে) বিকেলে। রবীন্দ্রনাথ রোগভারে ক্লান্ত অসহায়ভাবে ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে বললেন —'দ্যাখো হে, তোমরা আমার কিছু করতে পার কিনা। শেষ কালে ওরা কি আমায় কাটা ছেঁড়া করে দেবে'? কবির দু'চোখ জলে ভরে উঠলো — শ্রাবণের জলভরা মেঘ চতুর্দিকে ছেয়ে ফেলল। ২৫শে জুলাই সকাল আটটা। পাকুড় প্যাসেঞ্জার বোলপুর স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। কবি শান্ত পায়ে গাড়িতে উঠলেন — সঙ্গে কন্যা মীরাদেবী, নন্দিনী কৃপালিনী এবং রাণী (নির্মলকুমারী) মহালানবিশ। হাওড়া স্টেশন থেকে তাঁকে মোটর গাড়িতে সোজা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে আনা হল। কৌতুহলী জনতার ভিড় এড়ানোর জন্য কবির কলকাতা আসার খবর গোপন রাখা হয়েছিল।

দুঃখের পরিহাস ভরা / ভয়ের বিচিত্র জলচ্ছবি—/ মৃত্যুর নিপুণ শিল্পে বিকীর্ণ আঁধারে।

— এ হল কবির জীবন সায়াহ্নের কবিতা। এর থেকে মানুষ দুঃখ যন্ত্রণা এবং বিপদজনক সংঘর্ষের মধ্যে বেঁচে থাকার সাহস ও সহিষ্ণুতা সংগ্রহ করবে চিরকাল। ১৯৪১ সালের ৩০ জুলাই সকাল ৯.৩০ মিনিট অপারেশন টেবিলে যাবার তিন ঘণ্টা আগে মহাকবি রচনা করলেন তাঁর শেষ কবিতা। অবশ্য স্বহস্তে লিখতে পারেন নি। লিখলেন রাণী চন্দ।

কবি বলেছিলেন — 'কিছু গোলমাল আছে পরে ঠিক করব 'খন'। কিন্তু শেষ রচনা আর সংশোধন করার সময় পেলেন না কবি। কবিকে ট্রেচারে করে আনা হল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বারান্দায়। এখানেই সাজানো হয়েছিল অপারেশন টেবিল, লোকাল অ্যানস্থেশিয়া দিতে সময় লেগেছিল ২৫ মিনিট — তাও পর্যাপ্ত না। স্বভাবতই অপারেশনের কাঁটাছেড়ায় কষ্ট পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অপারেশনের সময় কবির কোন কাতরোক্তি শোনা যায়নি। তিনি তাঁর কষ্ট কাউকে বুঝতে দেননি। শুধু ঘরে আনার পর একবার বলেছিলেন — 'আচ্ছা জ্যোতি (ডাঃ জ্যোতিপ্রকাশ) যে বলেছিল একটুও লাগবে না — তার মানে কি?'

এরপর যা ঘটল তা আরও মর্মান্তিক। অপারেশনের জায়গা দ্রুত বিষিয়ে উঠলো — সেপটিক হয়ে গেল। ৩রা আগস্ট কবির অবস্থার চরম অবনতি ঘটলো। ৫ আগস্ট কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন কবি। ৭ আগস্ট ১৯৪১ সাল, বাংলা ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ বেলা ১২টা ১০ মিনিটে সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হলো। কবি অস্তমিত হলেন ৮০ বৎসর ৩ মাস বয়সে।

কিছুক্ষণের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল জনতা কলাপসিবল গেইট ভেঙে খান খান করে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে। মহর্ষি ভবন থেকে কবির দেহ বের করে নিয়ে যায়। জনতা তাদের প্রিয় কবির উদ্দেশে মুহুর্মুহু শ্লোগান দিতে থাকে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি জয়'। জনতা রবীন্দ্রনাথের শবদেহ হাতের মুঠোয় পেয়ে তাঁর মাথার চুল আবক্ষ দাঁড়ি কাড়াকাড়ি করে ছিঁড়তে লাগলো। কবির স্মৃতিচিহ্ন সবাই রাখতে চায়। জনতার কবি জনতার ভিড়ে মিশে শেষ যাত্রায় রওয়ানা দিলেন। অগণিত মানুষ পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে নিমতলা মহাশ্মশানের দিকে।

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর কিছুদিন আগে বলেছিলেন — 'আমার মৃত্যুর মিছিলে যেন উন্মাদনা না হয়। আমার নামে কোন জয়ধ্বনি যেন না দেওয়া হয়।' তিনি যখন শ্মশানে এসে পৌছান তখন তার চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে জনতার ভালবাসার অত্যাচারে। শোনা যায় একমাত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথকে শত অনুনয় সত্ত্বে মুখাগ্নি করতে দেওয়া হয়নি। বিশ্বকবির পরাধীন ভারতে মৃত্যু বলেই বোধ হয় এ লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন উপযুক্ত উদ্যোগ নেয়নি শৃঙ্খলা রক্ষার — জনতাকে শৃঙ্খলিত করার। সারা জীবন কঠোর সংগ্রামের ভেতর দিয়েই তিনি সৃষ্টি করে গেছেন — মৃত্যুটাও এর ব্যতিক্রম হল না।

১৯০১ সালে প্রথম 'পাঠ ভবন' নামক বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। এটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। পরে একে একে স্থাপিত হয় — (১) পাঠ ভবন (মাধ্যমিক বিদ্যালয়), (২) শিশু ভবন (নার্সারি স্কুল), (৩) শিক্ষা ভবন (উচ্চমাধ্যমিক), (৪) বিদ্যাভবন (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মহাবিদ্যালয়), (৫) বিনয় ভবন (শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়), (৬) কলা ভবন (শিল্প ও চারুকলা মহাবিদ্যালয়), (৭) সঙ্গীত ভবন (সঙ্গীত ও নৃত্য মহাবিদ্যালয়), (৮) শ্রীনিকেতন (পল্লী উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান), (৯) শিক্ষাসত্র (গ্রাম্য বিদ্যালয়), (১০) শিল্পসদন (শিল্প শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়), (১১) চীনা ভবন (চীনা, তিব্বতী ইত্যাদি ভাষা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান)।

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন রূপায়িত হয়েছে। পাশ্চাত্যের শিল্প বিজ্ঞানের যা কিছু ভালো তার সঙ্গে ভারতের শিল্প ও কৃষ্টির মিলন ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাক্ষেত্রে অমর হয়ে আছেন। 'শিক্ষার হেরফের', 'তোতা কাহিনী', 'শিক্ষার সমস্যা', 'স্ত্রী শিক্ষা', 'শিক্ষার বাহন' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা পরিকল্পনায় কোন বিদেশী ধারা অনুসরণ করেননি। তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যে একান্ত বিশ্বাসী ছিলেন এবং প্রাচীণ ভারতের সংস্কৃতিকেই তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। তবে প্রচলিত সংস্কার ও কৃত্রিম আচার-বিচারের বিরোধী ছিলেন। পাশ্চাত্য দেশ থেকে বিজ্ঞানের যে জ্ঞান ভাণ্ডার ভারতে এসেছে রবীন্দ্রনাথ তাকে উপেক্ষা করেন নি। তাই তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষাকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বড় ত্রুটি হল প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে এর বিচ্ছিন্নতা। তাঁর মতে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। তাই প্রাচীন

ভারতের তপোবনের শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শান্তিনিকেতন স্থাপন করেছিলেন। প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে শিশুর মন ও দেহ সুসংগঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিশ্ব প্রকৃতি জলে স্থলে আকাশে ক্লাস খুলে আমাদের মনকে প্রবল শক্তিতে গড়ে তুলে। তিনি ছিলেন মানবপ্রেমিক। মানুষের মধ্যে কৃত্রিম ভেদাভেদকে তিনি স্বীকার করেননি। উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন সবাইকেই তিনি সমান জ্ঞানে ভালোবেসেছেন। তাই তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থায় ঐক্য ও সাম্য অগ্রাধিকার পেয়েছে। আনন্দে ও অবাধ স্বাধীনতায় শিশুরা শিখবে। স্বাধীনতা দিলে শৃঙ্খলা রক্ষার কোন সমস্যা থাকবে না, পাশাপাশি চিন্তা শক্তি ও বিচার শক্তির উন্মেষ ঘটবে — একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুন্দরের উপাসক। জগতের যত সৌন্দর্য্য অনুভূতির আনন্দধারা রয়েছে সে সবের সঙ্গে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া শিক্ষার কাজ বলে তিনি মনে করতেন। পাশাপাশি তার আত্মপ্রকাশ ঘটবে বিভিন্ন সৃজনমূলক কাজের মাধ্যমে। সার্বিক বিকাশের ব্যবস্থা থাকবে শিক্ষাঙ্গণে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন শিশুকে সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তাকে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অঙ্কন, শিল্পকলা, নৃত্য, সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি সব কিছুই শেখাতে হবে এবং শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ।' শিক্ষার্থী যাতে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে সেজন্য পাঠক্রমে সংস্কৃত ভাষা ও রামায়ণ-মহাভারত রাখতে গুরুত্ব দেন। বর্তমানে যে 'কর্মশিক্ষা'র কথা বলা হয় তা রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই শান্তিনিকেতনে শুরু করেছিলেন — কাঠের কাজ, অঙ্কন, বই বাঁধাই, তাঁতের কাজ ইত্যাদি। ছাত্ররা উচ্চ চিন্তা করবে আর সরল জীবনযাপন করবে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাজ নিজেরাই করবে — পোশাক পরিচ্ছদ ধোওয়া, ঘর পরিস্কার, বাসন মাজা এসব করবে। ফলে শ্রমের প্রতি মর্যাদা ও আত্ম নির্ভরশীল হয়ে উঠবে।

ত্রিপুরা দর্পণ— রবিবার, ৩০ আগস্ট, ২০০৯ইং

মহর্ষির ধর্মাশ্রম থেকে কবিগুরুর বিশ্ববিশ্রুত বিশ্বভারতী

১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর বোলপুরের শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচার্যশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রমের পরিধি ছিল ছোট। দক্ষিণে শ্রেণিবদ্ধ শালবীথি ও মাধবী বিতান, পূর্বে আম্রকুঞ্জ, পশ্চিমে তাল-জাম-নারকেল গাছের এখানে সেখানে অবস্থিতি, উত্তর-পশ্চিমে ছাতিমতলায় মার্বেল পাথরের বেদি যার সামনে ছিল প্রচুর ফাঁকা জায়গা। উত্তরে অতিথি ভবন, রান্নাঘর এবং একখানা ছোট একতলা পাকা বাড়ি। সেখানে সংগৃহীত ছিল পুরনো 'তত্ত্ববোধিনী' ও কিছু বইপত্র। এটিকে পরে দোতলা করে বর্তমানের লাইব্রেরির রূপ পায়। আর পূর্ব দিকে ছিল বোলপুর যাবার ছায়াশূন্য রাঙামাটির হাঁটাপথ। তখন বোলপুর শহরের রূপ পায়নি — কাজেই যান্ত্রিক সভ্যতার থাবাও ছিল না। ছিল প্রকৃতির নীরব নিস্তব্ধ শান্ত পরিবেশ - যেখানে আশ্রমের সূচনা হয়েছিল।

মহর্ষি নিজেই 'শান্তিনিকেতন' নামটি দিয়েছিলেন। তিনি আশ্রমটিকে ধর্ম সাধনার পীঠস্থান রূপে সর্বসাধারণের সম্পদ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ সেবায় তা পরিণত হয়েছিল বিশ্বমানবের মিলন মন্দির ও জ্ঞানতীর্থ 'বিশ্বভারতী'তে।

যেকোন শুভারম্ভের পেছনে থাকে মহতী ইচ্ছা, সীমাহীন ত্যাগ ও যন্ত্রণা এবং অবশ্যই আদর্শে অনুপ্রমাণিত হয়ে কিছু সাধকের আত্মোৎসর্গ — 'বিশ্বভারতী'র ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। রবীন্দ্রনাথ নিজ বিদ্যালয় জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক মণ্ডলির সান্নিধ্য লাভে অতৃপ্তির কারণে তিনি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিদ্যালয়ের প্রতি বিরূপ ছিলেন। দীর্ঘ জীবনের এ ধারণাটি সংকল্পবদ্ধ হয় শিলাইদহে সপরিবারে থাকাকালীন। সেখানে তিনি পুত্র-কন্যাদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে গৃহেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন গৃহ বিদ্যালয়ে। তিনি চেয়েছিলেন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণনাশী আবহাওয়া থেকে সন্তানদের মুক্ত রাখতে।

কবির মনের ইচ্ছা ও পরিকল্পনার কথা আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন — "শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীনকালের গুরুগৃহবাসের মত সমস্ত নিয়ম থাকিবে, বিলাসিতার নামগন্ধ থাকিবে না। ধনী দরিদ্র সকলেই ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হইবে।"

শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা হঠাৎ হয়নি। দীর্ঘদিনের লালিত ইচ্ছা পরিকল্পনার বাস্তব রূপ পেয়েছিল মাত্র। প্রকৃতির শ্যামলস্নিগ্ধ উন্মুক্ত অঙ্গনে ১৯০১ সালের ২২শে ডিসেম্বর (বাংলা ৭ই পৌষ ১৩০৮) তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয় আরম্ভ হয় মাত্র ছয়জন ছাত্র নিয়ে। এরমধ্যে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথও ছিলেন।

এ বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে কবির শিক্ষা সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা ও আদর্শ বিকশিত হয়েছিল।

তখনকার প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিরূপ ধারণা তাঁর লেখনীতে ধরা পড়েছে — "অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে ওঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে তুলবার জন্য যে একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে - যার নাম স্কুল, যেটার ভিতর দিয়ে মানব শিশুর শিক্ষায় সম্পূর্ণতা হতেই পারে না। এই শিক্ষার জন্য আশ্রম দরকার।" তিনি আরও বলেছেন - "আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার শিক্ষা।....আশ্রমের ছেলেরা চারিদিকের জগতের অব্যবহিত সম্পর্ক লাভে উৎসুক হয়ে থাকবে, সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে।"

পিতার ধর্মসাধনার পীঠস্থান আশ্রম এর সঙ্গে তিনি আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর পবিত্র উদ্দেশ্য 'প্রকৃত শিক্ষা প্রচার' এবং 'প্রকৃত মানুষ তৈরি করা।' দেহের অস্তিত্ব রক্ষায় খাদ্য ও পানীয় দরকার, মনকে সতেজ রাখার জন্য আনন্দ দরকার আর মস্তিষ্কের জন্য জ্ঞান। তবে জ্ঞান আবৃত্তির জন্য নয় শুধু — তা মন ও চিন্তাকে পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট করাতেই স্বার্থকতা পায়। বিদ্যা সঞ্চিত ধন হয়ে থাকে না — সৃষ্টির মূলধন হতে পারে। এটাই শিক্ষার সৃজনশক্তি বা উদ্ভাবনী শক্তি বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন।

আশ্রমের গঠন পর্বে ছিল নিদারুণ অর্থাভাব। বিদ্যালয়টি অবৈতানিক ও আবাসিক। ছাত্রদের বইপত্র, খাদ্য, বস্ত্র সব কিছুই কবি সরবরাহ করতেন। সরকারী সাহায্য বা জনগণের দান পাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কবির কল্পনা অনুযায়ী আদর্শ শিক্ষক বিনা বেতনে বা সামান্য পারিশ্রমিকে পাওয়া দুষ্কর ছিল। কেবল শিক্ষাব্রতী সাধকরাই রবীন্দ্রনাথের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসেছিলেন। প্রথম পর্বের ত্যাগী ও শিক্ষাব্রতী শিক্ষকরা হলেন আচার্য ব্রহ্মবান্ধব, সন্ন্যাসী রেবাচাঁদ, সতীশচন্দ্র রায়, অজিত চক্রবর্তী, জগদানন্দ রায়, মোহিত চন্দ্র সেন এবং নন্দলাল বসু। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন যথার্থ যোগ্য শিক্ষক এবং তাঁদের নিঃস্বার্থ অবদান স্মরণীয়। কবি তাঁদের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তাঁর "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" প্রবন্ধে। "সৎ যার ইচ্ছা ঈশ্বরই তার সহায়ক"— আপ্ত বাক্যটি এ ক্ষেত্রে সত্য রূপেই প্রকাশিত হয়েছিল। কেননা সৌভাগ্যক্রমে কবিগুরু প্রারম্ভিক পর্বের কঠিন সংগ্রামও সমস্যার দিনে তিনি পেয়ে যান সর্বত্যাগী শিক্ষকদের — 'যাঁরা কবির স্বপ্ন ও কল্পনার সঙ্গে ছিলেন একাত্ম। কবি তাঁদের কর্মসাধনা ও সংযোজনাকে সৃষ্টি কার্যের বৈচিত্রের অপরিহার্য বলে স্বীকার করেছেন।

ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের সূচনাতে ছিলেন ত্যাগী শিক্ষাব্রতী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং তাঁর সিন্ধীবন্ধু ও শিষ্য রেবাচাঁদ। ১৯০১ এর ডিসেম্বর থেকে ১৯০২ এর জুন পর্যন্ত ব্রহ্মবান্ধবই ছিলেন ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের প্রাণপুরুষ। তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী - তাই আর্থিক কোন সম্পর্ক ছিল না। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নীতি নির্ধারণ এবং পরিচালনায় ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায়ক ও অবলম্বন। আর ব্রহ্মবান্ধবের সুযোগ্য শিষ্য ও বন্ধু রেবাচাঁদ ছিলেন তাঁর সহযোগী। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় গড়ার কথা বললে ব্রহ্মবান্ধবের কথা একটু বলতে হয়।

তাঁর জীবন বিচিত্র এবং বিপুল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল, ১৮৬১ সালে হুগলী জেলার খন্যান গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গৃহজীবনের নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষা শেষ করে গোয়ালিয়র গিয়ে তিনি যুদ্ধ বিদ্যা শেখেন এবং বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসে হন নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত। আবার কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি সিন্ধুপ্রদেশে গিয়ে প্রথমে প্রোটেস্টান্ট পরে ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে ব্রহ্মবান্ধব হন। খ্রিস্টান হলেও তিনি হিন্দু সন্ন্যাসীর মত গৈরিক বসন পরতেন। হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যাতেও তিনি ছিলেন পারঙ্গম। প্রাচীন ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা, বেদান্ত চিন্তা এবং ব্রহ্মবাদের প্রতি গভীর অনুরাগের কারণে তাঁর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। তিনিই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করেন। ১৯০১ সালে তিনি বিলেতের অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু দর্শন সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে স্বদেশে ফিরেই একদিকে 'সন্ধ্যা' পরিত্রকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন আর অন্য দিকে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের রূপকার হন। ১৯০১ থেকে ২৯০২ এর জুন পর্যন্ত তিনি ছিলেন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। তারপর অগ্নিবর্ষী ভাষায় স্বাধীনতার বাণী প্রচারের অপরাধে রাজরোষে পড়েন। ১৯০৭ সালে বিচার চলাকালীন আদালতে অসুস্থ হন এবং কয়েকদিন পরেই ক্যাম্বেল (বর্তমান এন, আর এস) হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। তিনি একজন সুলেখকও ছিলেন।

প্রথম পর্বের পরে যে দু'জন তরুণ যুবক এসে আশ্রম বিদ্যালয়টিকে ত্যাগব্রতী শিক্ষা সাধনায়ও বদান্যতায় ফলেফুলে সমৃদ্ধ করেছিলেন — এঁরা হলেন অজিত কুমার চক্রবর্তী ও সতীশ চন্দ্র রায়। অজিত কুমার চক্রবর্তী ছিলেন সাহিত্য সমালোচক। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত দার্শনিক ব্রজেন্দ্র শীলের ছাত্র। অজিত কুমারের উপর ন্যস্ত ছিল ইংরেজি ও দর্শন পড়াবার ভার। তিনি আশ্রমে ১০ বৎসর শিক্ষকতা করেন। তিনিই আশ্রমের নিপুণ স্থপতি। তাঁর জন্ম ১৮৮৬ সালে ফরিদপুর জেলার মঠবাড়ি গ্রামে এবং অকালমৃত্যু ১৯১৮ সালে। স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কবিগুরুর আশ্রমে যোগ দিয়েছিলেন। দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তিনি অল্প বয়সেই বৃত্তি লাভ করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যান পড়াশোনার জন্য। রবীন্দ্র সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ। তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' এবং 'কাব্য পরিক্রমা' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

অজিত কুমার চক্রবর্তীর বন্ধু সতীশ চন্দ্র রায়। তিনিই প্রথম সতীশকে নিয়ে আসেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে তাঁর কবিতা সংশোধন করাতে। অসীম সম্ভাবনা দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে মিষ্টি কথায় ফিরিয়ে না দিয়ে লেখাগুলিকে যথার্থভাবে সংশোধন করে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে আশ্রমের কথা ওঠে। সতীশ তখন বি এ ক্লাসের ছাত্র। বি এ পরীক্ষা না দিয়ে এই আত্মভোলা সাধক আশ্রমের শিক্ষক হয়ে যান এবং তাঁর উপর ভার পড়ে ইংরেজি শিক্ষার। তিনি ছিলেন একদিকে প্রকৃতি প্রেমিক ও অন্যদিকে সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ। ছাত্রদের নিয়ে তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যরাজ্যে বিচরণ করতেন এবং সে সঙ্গে চলত শিক্ষাদান কার্য। ছাত্ররা পেয়ে যেত মনের খাদ্য। সার্থক হয়েছিল তাঁর শিক্ষা ও ত্যাগ। কবি গোপনে তাঁর পিতাকে কিছু অর্থ পাঠিয়ে দিতেন। সতীশচন্দ্র ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক ও শিক্ষাসাধক। কাব্য

সাধনার প্রতি তাঁর যেমন ছিল অনুরাগ তেমনি সংসার সম্পর্কে ছিলেন নিস্পৃহ। এই আত্মভোলা শিক্ষকের গায়ে কোন জামা থাকত না — শুধু একটি চাদর থাকত। পরিচ্ছদের জীর্ণতা তাঁর মনকে স্পর্শ করত না। প্রকৃতির রসময় অফুরন্ত সাগরে অবগাহন করে জীবনে পূর্ণতা পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলতেন শিক্ষার জন্য বনের যেমন প্রয়োজন তেমনি সহৃদয় শিক্ষকেরও দরকার। "যে গুরুর অন্তরের ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে — তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য" বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বলাবাহুল্য, সতীশচন্দ্র ছিলেন সেই রূপ ছেলে মানুষ — সজীব ও প্রাণবন্ত। তাঁর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ছিল নিকট সান্নিধ্য ও আত্মিকযোগ। ছিল মানব শিশুকে উপযুক্ত ভাবে বিকশিত ও পুষ্ট করার মতো দক্ষতা। তাই তিনি কেবল শিক্ষক ছিলেন না — ছিলেন শিক্ষার সাধক। তাঁর কবি প্রতিভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "সতীশ বঙ্গসাহিত্যে যে প্রদীপটি জ্বালাইয়া যাইতে পারিল না, তাহা জ্বলিলে নিভিত না।" কারণ তিনি আশ্রমে যোগ দিয়েছিলেন ১৯০২ সালে — আর মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই ১৯০৩ সালে বসন্ত রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। কবির মনে সে বেদনার স্মৃতি আজীবন জাগরুক ছিল। তিনি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বলেছেন — "আশ্রমে যাঁরা শিক্ষক হবেন, তাঁরা মুখ্যত হবেন সাধক, আমার এই কল্পনাটি সম্পূর্ণ সত্য করেছিলেন সতীশ।"

এরপরে এসেছিলেন জগদানন্দ রায়। তিনি ছিলেন বিজ্ঞান শিক্ষক। তাঁর একটি প্রবন্ধ পড়ে কবি মুগ্ধ হন এবং জমিদারীর কাজে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু যোগ্য লোককে উপযুক্ত স্থানে বসাবার জন্য কবি তাঁকে আশ্রমের শিক্ষক পদে এনে বসালেন। তাতে তাঁব মনের তৃপ্তি হয় এবং প্রতিভার বিকাশ হয় নানা ভাবে। একজন আদর্শ, দরদী ও হৃদয়বান শিক্ষক হিসেবে তার খ্যাতি ও অবদান বিশাল ছিল। জমিদার পুত্র হয়েও জ্ঞান সাধক জগদানন্দ আর্থিক অস্বচ্ছলতাকে উপেক্ষা করে কবির আহ্বানে সাড়া দেন। শিক্ষাদানে তিনি অকৃত্রিম তৃপ্তি পেতেন। তাই গণিত-বিজ্ঞান ইত্যাদি কঠিন বিষয়কেও যেমনি তিনি ছাত্রদেব নিকট আকর্ষণীয় করে তুলতেন, তেমনি ছাত্রদের কাছে আত্মদানে কোন কৃপণতা ছিল না।

আশ্রমের মধ্যপর্বে প্রখ্যাত অধ্যাপক মোহিত চন্দ্র সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদ ছেড়ে সামান্য বেতনে নিম্নশ্রেণীতে পড়াতে আসেন এবং কয়েক মাস থাকেন। শুধু তাই নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকের দক্ষিণা রূপে প্রাপ্ত এক হাজার টাকা শ্রদ্ধার অঞ্জলি হিসেবে কবিগুরুর হাতে তুলে দেন। স্বল্প দিনে আশ্রমের জন্য নিয়মকানুন তৈরী করে দিয়ে তিনি রূপকারের মর্যাদা লাভ করেন। মৃত্যুতে তাঁর শিক্ষাব্রত অকালে সমাপ্ত হয়।

বিকাশ পর্বে আসেন শিল্পী নন্দনাল বসু। তাঁর অবদানের শেষ নেই। তিনি ছিলেন ছাত্রবন্ধু। তাঁর অবদান শুধু শিক্ষকতায় নয়, সর্বপ্রকার বদান্যতায়। তিনি ছিলেন ছাত্র বৎসল — তাদের সুখে-দুঃখে-অভাবে রোগে অকৃত্রিম বন্ধুর মতো পাশে থাকতেন।

আশ্রমের রক্ষী ছিলেন এক ডাকাত দলের সর্দার ঋজু দীর্ঘ দেহধারী বৃদ্ধ আর তার পুত্র হরিশ ছিল বাগানের একমাত্র মালী। ডাকাত দলের সর্দার শিক্ষাঙ্গণে এসে বিশ্বস্ত ভৃত্যে

পরিণত হয় — রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের এমনই জাদুকাঠি ছিল।

অতিথি ভবনের একতলায় থাকতেন কবির ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বীপেন্দরনাথ অন্যান্যদের সাথে আর দোতলায় থাকতেন কবি সস্ত্রীক। ভবনটি ছিল উত্তরে আমলকি বনে আর তারই সন্নিকটে কদম গাছের ছায়ায় রান্নাঘখর। প্রতিষ্ঠাকালে পঠন-পাঠন চলত আম্রকুঞ্জে এবং জাম গাছতলায়। কবিগুরু নিজে পড়াতেন জাম গাছ তলায়। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের বর্ণনা থেকে জানা যায় সিমলা রোডে সন্ন্যাসী রেবাচাঁদের একটি পাঠশালা ছিল — যার ছাত্র সংখ্যা ছিল পাঁচজন। এরাই এসে আশ্রম বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিল এবং রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে ছাত্র সংখ্যা হয়েছিল ছয়জন। পুরনো লাইব্রেরির নীচের তলার তিনটি ঘর ও বারান্দায় ছাত্র ও শিক্ষকরা থাকতেন। ছাত্রদের সরল কঠিন জীবনযাত্রা ছিল আবশ্যিক। ব্রহ্মচর্য পালন, নিরামিষ আহার, ব্রহ্মোপাসনা ছিল বাধ্যতামূলক। জুতা ও ছাতার ব্যবহার ছিল নিষিদ্ধ। প্রাতে ও সন্ধ্যায় ধ্যান করতে হতো। প্রাতঃস্নানের পর ভুবন ডাঙ্গার বাঁধে হত উপাসনা, ফিরে এসে করতে হত বেদ মন্ত্র পাঠ। সঙ্গে থাকতেন সাধক শিক্ষকবৃন্দ। তারপর আরম্ভ হত অধ্যাপকদের পদধূলি নিয়ে গাছের তলায় অধ্যয়ন। রন্ধন ও জলতোলা ছাড়া প্রায় সকল শ্রমসাধ্য কাজ করতে হত ছাত্রদের।

১৯১৯ সালে ব্রহ্মবিদ্যালয় 'বিশ্বভারতী'তে রূপান্তরিত হয়। আর ১৯২০ সালে গ্রীষ্মাবকাশের পর সর্বপ্রথম মাসিক ছাত্র বেতন ধার্য হয় ১৫ টাকা। বর্তমানে শান্তিনিকেতনে উচ্চতর শ্রেণিতে শ্রেণিকক্ষ থাকলেও পঠন-পাঠন চলে প্রধানতঃ গাছের ছায়ায়।

রবীন্দ্রনাথের কবি মানস ও কল্পনাতুর কবিহৃদয় আধুনিক ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় মর্মাহত হয়ে বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। তিনি প্রাচীন ভারতের তপোবন, তপোবনের শান্ত সুন্দর পবিত্র ও জ্ঞানদীপ্ত জীবন ফিরে পাবার আকুতি প্রকাশ করেছেন।

যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব
মৃত্যুহরণ শঙ্কাতারণ দাও সে জীবন নব।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শৈশবকালীন অবস্থা নিয়ে পরে রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিচারণমূলক তিনটি প্রবন্ধ লেখেন — ১) আশ্রমের শিক্ষা, ২) আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা, ৩) আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ১৩৪৮ সালে (১৯৪১ খ্রিঃ) প্রবন্ধ তিনটিকে স্মারকরূপে 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' নামে গ্রন্থাগারে প্রকাশ করে।

দৈনিক আরোহণ— শুক্রবার, ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ ইং

শান্তিনিকেতনের বেড়ে ওঠায় নিজস্ব পরব ও মেলা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬৩ সালে রায়পুরের সিংহদের কাছ থেকে কুড়ি বিঘা জমি নিয়ে শান্তিনিকেতন বাড়ি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চারদিকে অনন্ত দিগন্ত — শুধু কিছু তাল ও খেজুর গাছ যেন কালাহারির মরুভূমি। জায়গাটা হয় ব্রহ্মোপাসকদের তীর্থস্থান। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত আর ১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিরোপা লাভ। আশ্রম হয়ে গেল বিশ্বভারতী। খোয়াই বুজে যেতে লাগল। ছাত্রের সংখ্যা শিক্ষকের সংখ্যা বাড়তে লাগল। তৈরি হল রতন পল্লী, সেবা পল্লী। উত্তরায়নের বাড়িতে উপাচার্য ও কর্মসচিবের অফিস। রথীন্দ্রনাথ হলেন প্রথম উপাচার্য — সে উপলক্ষ্যে মৌলানা আজাদ এসেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কর কলা ভবনের অধ্যক্ষ, শান্তিদেব ঘোষ সঙ্গীত ভবনে, হীরেনদা হলেন কলেজেব প্রিন্সিপাল। হঠাৎ রথীন্দ্রনাথ ১৯৫৩ সালে উপাচার্যের পদ ত্যাগ করে দেরাদুন চলে যান। ক্ষিতিমোহন সেন হলেন অন্তর্বর্তী উপাচার্য। তারপর পাকাপাকি ভাবে ডঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচি হলেন। বিদ্যাভবনে নূতন বিভাগ হল।

১৯৪০ সালে গান্ধীজি কস্তুরবা সহ শান্তিনিকেতন আসেন। তাঁর থাকার জায়গা স্থির হয় উত্তরায়নের ভিতর মাটির বাড়ি 'শ্যামলী'। এটি তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়। সেবারই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর আর্থিক চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে একটি বন্ধ খামে গান্ধীজিকে অনুরোধ করেন তাঁর অবর্তমানে যেন শান্তিনিকেতনের দায়িত্ব নেন। রবীন্দ্রনাথ মারা গেলেন ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট। গান্ধীজি তখন জেলে। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই তিনি শান্তিনিকেতন আসেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ মতো শান্তিনিকেতনের দায়িত্ব দেন জওহর লাল নেহরুকে। তাই দেশ স্বাধীন হবার পর প্রধানমন্ত্রী নেহরু সংসদে আইন পাশ করে বিশ্বভারতীর যাবতীয় আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের সঙ্গে গান্ধীজির যোগ ১৯১৫ সাল থেকে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তিনি এসেছিলেন ১৯৪৫ সালে। প্রতিষ্ঠানটি কেমন চলছে দেখার জন্য এবং এটাই তাঁর শেষ দেখা। গান্ধীজি কয়েকদিন থাকবেন এখবরে শান্তিনিকেতনে 'সাজ সাজ' রব পড়ে যায়। গান্ধীজী নামে যে কী জাদু তা তখনকার ছাত্র-শিক্ষকরা টের পেয়েছেন। তিনি স্পেশাল ট্রেনে বোলপুর স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে শান্তিনিকেতনে পৌছান। ছাত্র-ছাত্রীরা

তাঁকে স্বাগত জানাতে আশ্রমের ভিতরে রাস্তার দু'ধারে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। গান্ধীজি ভুবনডাঙা পেরিয়ে নিচু বাংলো পাশে বড় রাস্তা বরাবর হিন্দিভবনের লাগোয়া আশ্রমের সদর ফটক দিয়ে ঢুকলেন। তারপর নেপাল রোড ধরে চীনভবন, বেণুকুঞ্জ পেরিয়ে এগোতে লাগলেন চৈত্যের দিকে। তাঁর সঙ্গে প্রচুর লোক। এরমধ্যে সুশীলা নায়ার ও আভা গান্ধীর কাঁধে ভর দিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন। পায়ে স্যান্ডেল, হাঁটুর উপরে সাদা ধবধবে ধুতি, কোমরে গোঁজা ট্যাকঘড়ি, খালি গা — আর মুখে বিশ্ববিখ্যাত সেই শিশুর হাসি। ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁকে প্রণাম জানায়। তিনি চলে গেলেন সোজা গৌর প্রাঙ্গণে। সেখানে আগেই উপাসনার ব্যবস্থা করা ছিল। গান্ধীজি বসলেন ছোট্ট একটা মঞ্চের উপর খোলা আকাশের তলায়। চারদিকে ছাত্ররা বসে পড়ে। প্রথমে 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম ....' গানটি গাওয়া হয়। এরপর শান্তিদেব ঘোষ তাঁর অবিস্মরণীয় কণ্ঠে পশ্চিমের লাল আকাশ, শাল বীথি, আম্রকুঞ্জ, গৌর প্রাঙ্গন — সব কাঁপিয়ে দিয়ে চড়া গলায় গান ধরলেন — 'ওই আসন তলে মাটির পরে লুকিয়ে রবো।' গান্ধীজি সামান্য মাথা নত করে গান শুনছেন। সেই মুহূর্তে নন্দলাল বসু ক্ষিপ্রবেগে এঁকে ফেললেন সেই পরিচিত বিখ্যাত ছবি — 'প্রার্থনা সভায় গান্ধীজি'।

গান শেষ হবার পরও তার রেশ যায়নি। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো যে যার স্থানে। গান্ধীজি শুরু করলেন প্রার্থনা শেষের ভাষণ — 'শান্তিনিকেতন কী মেরে ভাইয়ো, আউর বাহিনো।' একজন মহাপুরুষের সামনাসামনি ভাষণ শুনে সবাই আচ্ছন্ন হয়ে রইলো। তাঁর ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি এতটাই সম্মোহনী।

গান্ধীজি সদলবলে 'শ্যামলী'তে উঠলেন। তবে তাঁর বেশী সময় কাটত 'শ্যামলী' আর 'কোনার্ক' এর মাঝখানের চাতালে। সকালবেলা রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতেন। অন্ধ গায়ক কালু মিএগ প্রায়ই গান্ধীজিকে সকাল-সন্ধ্যা গান শোনাতেন। গান শুনে বেড়াতে যেতেন খোয়াই এর দিকে। ফিরে এসে কাজকর্ম সারতেন। সেবার গান্ধীজি শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের মাঝখানে দীনবন্ধু এনড্রুজ হাসপাতালের শিলান্যাস করেন। এনড্রুজ ছিলেন গান্ধীজির প্রাণের বন্ধু। গান্ধীজি হেঁটেই শ্রীনিকেতন যেতেন এবং এত দ্রুত হাঁটতেন যে আশপাশের ভলানটিয়ার ছাত্রদের তাঁর সঙ্গে তাল মেলানো কঠিন ছিল। তিনি একদিন শিল্পী মুকুল দে'র স্টুডিও দেখতে গিয়েছিলেন। নন্দলাল বসুর সঙ্গেও কলা ভবনে দেখা করতে যান একদিন।

একদিন গান্ধীজি উত্তরায়নে দুপুর বেলা গায়ে তেল মাখছেন। নাতি কনু গান্ধী দাদুর গায়ে তেল ম্যাসেজ করছিল। এমন সময় এক ফটোগ্রাফার এসে বলল, ভেতরে যাবে। এদিকে উত্তরায়নের দায়িত্বে ছিলেন সে সময়ের ছাত্র অমিতাভ চৌধুরী ভলানটিয়ার হিসাবে। তিনি ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেননি। ফটোগ্রাফার বললেন যে তিনি আনন্দবাজারের বীরেন সিংহ। কিন্তু কিছুতেই যাবার অনুমতি মিলল না। ফটোগ্রাফার ও দমবার পাত্র নন। অন্য লোক নিয়ে এসে হম্বিতম্বি শুরু করে দেয় ভিতরে প্রবেশের অনুমতির জন্য। অগত্যা

ভলানটিয়ার ছাত্র অমিতাভ চৌধুরী রথীন্দ্রনাথের স্মরণাপন্ন হলেন এবং তাঁর নির্দেশে ফটোগ্রাফারকে ভেতরে যাবার অনুমতি দিলেন। সেবার রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারের টাকা তোলা সম্পর্কে গান্ধীজির সঙ্গে কথা বলার জন্য কানাই লাল মজুমদারও এসেছিলেন।

শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যাবার দিন সকালবেলা উত্তরায়নে উদয়ন বাড়ির সামনে বিশ্বভারতীর সমস্ত কর্মীর সঙ্গে তিনি মিলিত হন। কীভাবে চলতে হবে সে বিষয়ে তিনি কর্মীদের উপদেশ দেন। দু-চার জন অধ্যাপককে তিনি কটু কথাও বলেন। বুদ্ধি পরামর্শ নির্দেশের কাজ সেরে তিনি হেঁটে রওয়ানা হন বোলপুর স্টেশনের উদ্দেশ্যে।

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী গান্ধীজির মৃত্যু সংবাদে শান্তিনিকেতনের সবাই সেই গৌর প্রাঙ্গনে মিলিত হয়েছিলেন যেখানে গান্ধীজির শেষ উপাসনা সভা বসেছিল এবং ক্ষিতিমোহন সেন মশাই গান্ধীজির মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন। এ সংবাদে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই অঝোরে কেঁদেছিলেন। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত।

বিদ্যাভবন আগে ছিল শুধু গবেষণা বিভাগ। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে যাবার পর এম এ ক্লাসও এর মধ্যে ঢুকে পড়ে। শান্তিনিকেতনে অনেক বিদেশী সস্ত্রীক থাকতেন। সে সময়ে শান্তিনিকেতনে উচু ক্লাসের ছাত্ররা নানা নামে নানা ধরনের পত্রিকা বের করতেন। ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহের অন্ত ছিল না। 'ঋতুপত্র' ছিল সাহিত্যের পত্রিকা, 'গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে' পত্রিকায় রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বরলিপি প্রকাশ হত। রবীন্দ্র সদনে রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত গল্প —'মুসলমানীর গল্প' পাওয়া যায় এবং তা 'ঋতুপত্র'-এ ছাপা হয়। এটা দেখে দেরাদুন থেকে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৈফিয়ত চেয়েছিলেন — তাঁকে না জানিয়ে কেন গল্প ছাপা হল? ডঃ বাগচী এ খবর দিলে পত্রিকার সম্পাদক রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বিষয়টি মিটিয়ে নেন। ১৯৫৫ সালে কে এম পানিকর সমাবর্তন ভাষণ দিতে আসেন। ১৯৫৬ সালে ডঃ বাগচী মারা যান। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। লেখাপড়া আর প্রশাসনিক কাজের চাপে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। তাছাড়া একমাত্র পুত্রের বালক বয়সে মৃত্যু তাঁকে আরও ভেঙ্গে দেয়। সকালে পুত্রের শ্রাদ্ধ সেরেই আসেন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। এর কয়েকদিন পরই তাঁর মৃত্যু হয়। ডাঃ বাগচীর পর কিছুদিন অন্তর্বর্তী উপাচার্য হলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। তারপর সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনি নানা অঘটনের পর মেয়াদ শেষ হবার আগেই বিদায় নেন। আবার অন্তর্বর্তী উপাচার্য হলেন ক্ষিতীশ চন্দ্র চৌধুরী। ১৯৬০ সালে এলেন সুধীর রঞ্জন দাস। তাঁর কার্যকালে শান্তিনিকেতন পুরো বিক্রমে চলতে থাকে। তাঁর সময়কালেই ঘটা করে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। বহু মানী ও গুণী ব্যক্তি এসেছিলেন, আসেননি রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি স্বেচ্ছা নির্বাসনে দেরাদুন ছিলেন এবং কিছুদিন পর সেখানেই মারা যান।

সে সময়ে শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলার জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে থাকতেন সবাই। পৌষ মেলা বাংলার দুর্গা পূজার মতো আকর্ষণীয়। দুর্গা পূজায় সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী তেমনি শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলা হতো সাতই, আটই, নয়ই, দশই পৌষ। দশই পৌষ মেলা ভাঙায় যেন দশমীর করুণ সুর। ছয়ই পৌষ যেন ষষ্ঠী মেলার বোধন — সবার মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে যেত। উত্তরের পিচ করা রাস্তা ঘেঁষে মিষ্টির দোকানের সারিতে নানা রকমের মিষ্টি সাজানো, তারপর রেস্তোরার সারি। এখানেই বেশি ভিড়। শীতের পোশাকের বাহার, নানা রকমের শাড়ি, নেকটাই, লেটেস্ট ডিজাইনের পোশাক-আসাক। মনোহারী জিনিস, খেলনা, শ্রীনিকেতনের তৈরি জিনিস, হাতির দাঁতের কাজ, কাঠের কাজ, কাশ্মীরি শাল, কটকী শাড়ি ইত্যাদি নানা ধরনের জিনিস দোকানগুলিতে সাজানো। আর মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় যাত্রা, কীর্তন, কবিগানের আসর বসত। পুঁতির মালা, সাঁওতালি গয়না, জুতো, জামা, বাসনকোসন, ফটো, স্টুডিও, বটতলার বই, লোহালক্কর — দোকানের পর দোকান। বিদ্যাভবন হোস্টেলের কাছে মাটির হাড়ি, কাঠের ফার্নিচার। মন্দিরের পাশে মেলা অফিস, টিকে দেবার ঘর। ঝুরি নামা বটের তলায় বসত বাউলের আড্ডা। অর্থাৎ গানের পর গান চলছে। বাউলরা বলত 'রবি ঠাকুরের মেলা।' বাঁশি, দড়ি, বেলুন ও চানাচুর নিয়ে গ্রামের লোকেরা আসত। নাগরদোলা বসত। ১৯৪৫ সালে জওহরলাল নেহরু কন্যা ইন্দিরাকে নিয়ে এসেছিলেন — তখন তিনি নাগরদোলা চড়েছিলেন। কিন্তু ১৯৫৫ সালে মেলায় আসা কে এম পানিকব বযস নেই বলে নাগবদোলা এড়িয়ে গেলেন, চড়েননি। তবে মাঠে ছড়ি হাতে ছেলে-মেযেদেব ঘোবাঘুবি করতে দেখে ছড়িব জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। শান্তিনিকেতনে তাল পাতায তৈবি বিশেষ একধরনেব টুপি নাম 'টোকা' পাওয়া যেত। এর খোঁজ করলেন তিনি। মেলায় 'টোকা' পাওয়া যেত না। অনেক খোঁজাখুজি করে তাঁকে একটা জোগাড় করে দেওয়া হল — তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা মাথায় দিলেন।

মেলায় প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ভিড় জমাতেন। কলকাতা থেকে নিমন্ত্রিত অতিথিরা আসতেন। গ্রামের লোক তো থাকতেনই। ৮ পৌষ সকাল সাড়ে আটটায় আম্রকুঞ্জে সমাবর্তন হয়েছিল। প্রধান অতিথি পানিকড়ের ভাষণ গতানুগতিকতার উর্ধে ছিল। নূতনত্বের স্বাদে উত্তীর্ণ। তিনি স্পষ্ট ও নির্ভীকভাবে উল্লেখ করেন ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনের আদর্শ সম্পর্কে। তিনি বলেন নানা সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্পর্শে ও নিজস্ব ক্ষমতার বলে ভারতে এক নূতন সভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কেউ যদি মনে করেন ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য তপোবনের আদর্শে বিশুদ্ধ ভারতীয় জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন, তবে তা অর্থহীন হবে। ভারতে যে নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা শুধু পুরানের ধারাবাহিকতা নয়। তাই যাঁরা ভারতবর্ষকে ভালবাসেন তাঁদের উচিত হবে নূতন সভ্যতাকে শক্তিশালী করা যা বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে। সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষ হয়েছিল সাড়ে দশটায়। এরপর প্রধান অতিথি পানিকর মেলা দেখতে যান।

১৯৬৫ সালে নূতন উপাচার্য হলেন ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য। যেমন সজ্জন তেমনি সদালাপী ভদ্রলোক। সে সময়ে এলামৃণি অ্যাসোসিয়েশনের ভোটে নির্বাচিত হলেন অমিতাভ চৌধুরী এবং বিশ্বভারতীর কর্মী সমিতিতেও তিনি নির্বাচিত হলেন। অমিতাভ চৌধুরী ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে শান্তিনিকেতনে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালে বি এ পাশ করে কলকাতায় চলে আসেন এম এ পড়ার জন্য। কিন্তু সেটা ছিল তাঁর কাছে নির্বাসন। শান্তিনিকেতনের ধূলিকনা, গাছ-গাছালি, ফুল-লতা-পাতা রাস্তাঘাট তাঁর নখদর্পনে, অস্থিসজ্জায় হৃদয়ে নিবিড় অবস্থানরত। কাজেই সুযোগ পেলেই চলে আসতেন শান্তিনিকেতনে। ১৯৫১ সালে এম এ পাশ করে বাংলার অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। এভাবে তাঁর উত্তরণ ঘটে — ছাত্র থেকে অধ্যাপক, তারপর কর্মী সমিতিতে।

১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হবার পর প্রথম উপাচার্য হন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর মতো দক্ষ ও সার্থক উপাচার্য আর কেউ হননি। ১৯৫৩ সালে শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যাবার পরই বিশ্বভারতীর অন্য রূপ ক্রমশ আসে। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হবার পূর্বে বিশ্বভারতীর ডিগ্রি স্বীকৃতি ছিল না তবে কয়েকটি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত ছিল। ছাত্ররা নন-কলেজিয়েট ছাত্র হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতেন। ক্ষিতিমোহন সেনের দৌহিত্র অমর্ত্য সেন শান্তিনিকেতনেই পড়াশোনা করেছেন। তিনি ১৯৫১ সালে আই এস সি'তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হন আর বিহার থেকে ফার্স্ট হয়ে আসা দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় হয়েছিলেন দ্বিতীয়।

অধ্যাপক ও কর্মীদের ছাত্ররা দাদা বলে ডাকতেন। তাঁরাও সে ডাকের মর্যাদা দিতেন। তাঁদের সঙ্গে ছাত্রদের বেশি সম্পর্ক ছিল ক্লাসের বাইরে। ছাত্ররা অধ্যাপকদের যোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিতেন। শান্তিনিকেতনে রসিকতার চর্চা প্রথম থেকেই। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সরস কথার রাজা। প্রতি কথায় রস। তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন। উনার বংশগত পেশা ছিল কবিরাজী — তাই একজন প্রশ্ন করেছিলেন অধ্যাপনার সঙ্গে কবিরাজী করলেও তো পারেন। তিনি হেসে জবাব দেন — "কবিরাজী করার ইচ্ছে তো ছিল, কিন্তু কবি রাজী হলেন না।" শিল্পী মুকুল দে'র কোন একটা কাজ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, "আরে মুকুল ভাল হইব কি কইর‍্যা, মুকুলের মূলের মাঝখানেই যে 'কু'।" শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাটক অভিনীত হত। একবার এক নাটকে ক্ষিতিমোহন সেন ঠাকুরদার পার্ট করেছিলেন। তারপর থেকে তাঁর স্ত্রী, কিরণবালা সেনকে সবাই ডাকত 'ঠানদি'। ক্ষিতিমোহন সেন ছিলেন শক্ত সমর্থ সুপুরুষ। আর তাঁর স্ত্রী ঠানদি ছিলেন ছোটখাটো রোগা। এ সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন বাবুর মন্তব্য "বাইরে রোগা, ভিতরে দা রোগা"।

শান্তিনিকেতনের ক্ষৌরকার ভরত থাকত পান্থ নিবাসের পেছনে একটি ছোট্ট ঘরে। তার বাড়ি মুঙ্গের জেলায়। কবে যে শান্তিনিকেতন এসেছিল বলতে পারত না। এর আগে

ছিল আব্বাস নামে এক ক্ষৌরকার। সেকালের ছাত্র প্রথমনাথ বিশীর ভাষায় তার তিনটি ক্ষুর ছিল — দেয়ালঠেসিনী, হাডভেদিনী এবং রক্তকিঙ্কনী। আর ভরতের ক্ষুর একটিই ছিল — দেয়ালঠেসিনী।

সাধারণ লোক বাদ দিয়ে বহু রথী-মহারথী ভরতের নিকট মাথা নত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেনরা তো বটেই প্রমথ চৌধুরী মশাইও ছিলেন ভরতের বড় খদ্দের। রোজ যেত প্রমথ চৌধুরীর দাড়ি কামাতে। যখন পঙ্গু লোকের সাহায্য ছাড়া চলাচল করতে পারতেন না তখনও ভরত গিয়ে ক্ষৌরকর্ম করে দিয়ে আসত। প্রমথবাবু ছিলেন চেইন স্মোকার সব সময় মুখে সিগারেট থাকত। তবে ভালো করে টানতে পারত না বলে মাঝে মাঝে নিভে যেত। তখন ইন্দিরাদেবী বা অন্য কেউ এসে ধরিয়ে দিতেন। সিনিয়ার ছাত্ররা ভরতকে প্রশ্ন করত আর কার কার দাড়ি কামিয়েছে। সে বলত "রথীবাবু, সুরেনবাবু, নন্দবাবু, অবনীবাবু — সোব সোব। অবনীবাবু একবার আসলেন লম্বা লম্বা দাড়ি নিয়ে। আমার বখশিস নষ্ট হয়ে গেলো।"

রবীন্দ্রনাথের দাড়ি কামিয়েছে নাকি প্রশ্ন করলে ভরত হেসে বলত — "রসিকতা হামি সমঝে, গুরুদেববাবুর দাড়ি কৌন কাটবে? লেকিন হাঁ, গুরুদেববাবুর পায়ের নোখ আমি দুবার কেটেছি।" ভরতের আফসোস ছিল রবীন্দ্রনাথের দাড়ি ছিল বলে — না হলে তাঁর দাড়ি কেটে পুণ্য অর্জন করতে পারত। রবীন্দ্রনাথের বন্ধুদের লম্বা লম্বা দাড়ি। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, এন্ড্রুজ সাহেব এবং দ্বিজেন্দ্র নাথেরও লম্বা দাড়ি। ফলে দাড়ি কাটার বখশিস মিলত না। ভরত গর্ব করে বলত গান্ধীজি, মদনমোহন মালব্যজির দাড়ি কেটেছে। শুধু তাই নয় জওহরলাল নেহরুর নাতি রাজীবেরও একবার চুল কেটেছিল। ১৯৪৫ সালে নেহরুর সঙ্গে ইন্দিরা আসে শিশুপুত্র রাজীবকে নিয়ে বেড়াতে তখনই ভরতের সে সৌভাগ্য হয়।

শান্তিনিকেতনে ছুটির দিন বুধবার। ঐদিন সকালবেলা শিশু বিভাগের ছেলেরা লাইন বেঁধে মাথা পেত দিত ভরতের হাতের হাড়িকাঠে। একটু নড়াচড়া করলে ধমক দিয়ে বলত — "আঃ! গণ্ডগোল কর না। ঠাণ্ডা হয়ে বোসো।"

শান্তিনিকেতনের বহু বাড়িতে সে তিন-চার পুরুষের চুল-দাড়ি কেটেছে একাদিক্রমে। শুধু তাই নয় প্রাক্তন ছাত্ররাও পৌষ মেলায় এলে ভরতকে দিয়ে বছরের চুল ছাঁটিয়ে নিত। কলেজের প্রিন্সিপাল অনিল কুমার চন্দ ১৯৫২ সালে ভোটে জিতে মন্ত্রী হয়ে দিল্লি চলে যান। তবে শান্তিনিকেতন আসলে ভরতকে ডেকে পাঠাতেন।

পরে শান্তিনিকেতনে চেয়ার বসানো আয়না টাঙানো এক সেলুন হলো — অনেকেই সেলুনে গিয়ে চুল-দাড়ি কাটত। তাতে ভরতের অভিমান হত। তখন ভরত ভালো চোখে দেখে না — তবু পুরনো অনেকেই ভরতের আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারত না।

অবনীন্দ্রনাথ হুইল চেয়ারে আশ্রমে বেড়াতে বেরোতেন। তখন তিনি আচার্য। শিশু বিভাগের ছেলে-মেয়েদের গল্প বলতেন। তিনি কথা অর্ধেক বলতেন আর বাকি অর্ধেক বোঝাতেন আঙুলের ভাষায়। সবাই বুঝত। হুইল চেয়ারে বেরোতেন প্রমথ চৌধুরীও সঙ্গে থাকতেন স্ত্রী ইন্দিরাদেবী। 'বীরবল' তখন বলহীন অসুস্থ। কথা প্রায় বলতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ওঁরা দু'জন শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে চলে আসেন। ইন্দিরাদেবী অর্থাৎ সকলের 'বিবিদি' দীর্ঘজীবী। তখনকার আশ্রমজননী। তিনি ছিলেন খুব স্নেহ পরায়ণ। যেমন রূপবতী তেমন গুণবতী। চেহারা কথাবার্তায় অভিজাত। তিনি ঘড়ি পরতেন শাড়ির সঙ্গে বুকের কাছে ব্রোচের মতো করে। তাঁরা থাকতেন 'পুনশ্চ'তে।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী প্রতিমাদেবী ছিলেন সকলের বৌঠান। অসাধারণ রূপসী। শুধু উত্তরায়ন নয়, গোটা শান্তিনিকেতনের গৃহকর্ত্রী। তিনি নাটকও করাতেন।

কবি-কন্যা মীরাদেবী এবং কবি দৌহিত্রী নন্দিতা কৃপালনী আশ্রমের কর্মী হিসাবে যুক্ত না থাকলেও সব সময় তাঁদের আশ্রমে দেখা যেত।

রথীন্দ্রনাথ চোখের আড়ালে থেকে সব কাজ চালাতেন দক্ষতার সঙ্গে। তিনি থাকতেন গুহাগৃহে। বাগানের নূতন রূপ দিতে, কাঠের কাজ করতেন। পারফিউম বানানো, ছবি আঁকা — এসবে ব্যস্ত থাকতেন। হাফহাতা ধবধবে পাঞ্জাবী-পাজামা পরে থাকতেন আর মুখে থাকত দামী সিগারেট। তিনি খুব কম কথা বলতেন। মনে হত লাজুক — চলনে বলনে বিরাট আভিজাত্যের ছাপ। ফাইলপত্র নিয়ে দীর্ঘ সময় কাটাতেন। রবীন্দ্রনাথের পুত্র না হলে তাঁর খ্যাতি ও স্বীকৃতি আরো ছড়িয়ে পড়ত।

সকালে ক্লাসের আগে উপাসনা ও প্রাতরাশ হত। উপাসনা মানে বৈতালিক। এক এক সপ্তাহে এক একটি ভবনের উপর ভার থাকত। 'ওঁ পিতা নোহসি' মন্ত্র শুরু কবত পাঠ ভনেব ছেলে-মেয়েরাই তারপর গান। পুবনো লাইব্রেবীর বাবান্দার সামনে ছাত্র-ছাত্রীরা লাইন কবে দাঁড়াত। মাস্টার মশাইগণও আসতেন। দুপুর এগারোটায় দুপুরের খাবার। বিকেল আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটা ক্লাস। অনার্স কিংবা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস। যাবা অন্য ভবনে গিযে নাচ, গান, ছবি আঁকা বা বিদেশী ভাষা শিখতে চায় তার জন্য নিখরচায় ব্যবস্থা ছিল বিকেলে। একটি ছাত্র কলেজে ক্লাস করে অনায়াসে সেতার, চিত্রাঙ্কন ও জার্মান ভাষা শিখতে পারত। টিফিনের পব খেলা বেড়ানো যা খুশি। পাঠ ভবনের ছেলেরা করত আবার সন্ধ্যা উপাসনা। তারপব পড়াশোনা বা নাটক বা সাহিত্য সভায় আহ্বান আসত। রাত সাড়ে আটটায় রাতের খাবার। রাত ন'টার পর শ্রীভবনের বাইরে যাবার অনুমতি কারও ছিল না। তখন শান্তিনিকেতনে টিমটিমে বিজলি আলো ছিল এবং রাত দশটার পর তা নিভিয়ে দেওয়া হত।

আশ্রমের সব কাজ চলত ঘণ্টার বৈচিত্র্যে। পাঠভবনের একজন ছাত্র পালা করে ঘণ্টা

বাজাত। ঘণ্টাটি সিংহসদনের শীর্ষে। তার কাছে থাকত টেবিল ক্লক। সে নির্দেশ অনুযায়ী সময়মত ঘণ্টা বাজাত। কখনো এক দুই, কখনো তিন দুই, কখনো দুই তিন। চারটা করে ঘণ্টা বাজলে বুঝা যেত কোন অনুষ্ঠান। পাঁচটা বাজলে বিপদ — কোথাও আগুন লেগেছে বা দুর্ঘটনা ঘটেছে। পাঠ ভবনের ছাত্রদের উপর নানা দায়িত্ব থাকত। আদ্য, মধ্য, শিশু — এই তিন বিভাগের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছিল নির্বাচিত ক্যাপটেন। ক্যাপটেনরা ছিল সর্বেসর্বা — তাদের নির্দেশ না মানলে শাস্তি পেতে হত। আর আশ্রম সম্মিলনীতে নিত্যকার কাজকর্মের যাচাই হতো — পাশাপাশি বিচারসভাও বসত। ছাত্ররাই সব।

সে সময়ে কলেজ হস্টেলে নিয়মিতভাবে কয়েকজন আসতেন। একজন নবীন দাস বাউল। পূর্ণ দাসের বাবা। এক হাতে একতারা, অন্য হাতে ডবকি, পায়ে ঘুঙুর মাথায় পাগড়ি, গায়ে রঙিন জোব্বা — এভাবে এসে নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে গান গাইতেন। পরে বালক পূর্ণ দাসকেও সঙ্গে নিয়ে আসতেন। কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ ও লাবনি। শ্রীনিকেতনে তৈরি মোড়া বিক্রি করতে আসতেন নিশাপতি মাঝি। তিনি টোকাও বিক্রি করতেন। তখন তালপাতার টোকা মাথায় পরা ছিল আভিজাত্যের ব্যাপার। শান্তিদেব ঘোষের টোকার সংগ্রহ ছিল বিশাল। রোদ এবং জল আটকাতে এই টোকা ছিল সাহায্যকারী — তদুপরি এটা ছিল শান্তিনিকেতনী পোশাকের অঙ্গ। এই নিশাপতি মাঝি ১৯৪৬ সালে বীরভূম থেকে দাঁড়িয়ে এম এল এ হন। বোলপুরের বালেশ্বর ভকত মশাইর কর্মী তারাপদবাবু আসতেন। তাঁকে ছাত্ররা ভকতভাই ডাকত। ছাত্রদের খাতা-কলম-বই বা জামা কাপড় যা দরকার হত তাঁর কাছে অর্ডার দিয়ে দিলে তিনি কলকাতা থেকে আনিয়ে দিতেন। শান্তিনিকেতনে শ্রীশ দর্জির দোকান 'তনুশ্রী' খোলার পূর্ব পর্যন্ত এই তারাপদবাবুই ছাত্রদের পোশাক পরিচ্ছদ বানিয়ে দিতেন।

শান্তিনিকেতনে র‍্যাগিং বলতে যা বোঝায় তা কোনদিনই ছিল না। বড় বড় ছেলেরা হস্টেলে বড় জোর ভূতের ভয় দেখাত কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় খাটসুদ্ধ বের করে মাঠে রেখে দেওয়া — এসব। হস্টেলের চারপাশে ধোপাদের গাধা ঘুরে বেড়াত। এই গাধাকে ছেলেরা নানা কাজে ব্যবহার করত। রাত্রে অন্ধকার ঘরে কারোর খাটের পায়ার গাধা বেঁধে বাইরে থেকে গাধাকে ঢিল ছুড়লে গাধা তো প্রাণের ভয়ে বিকট চিৎকার শুরু করে দিত এবং চিৎকার শুনে ঘাটের মালিক হাউ মাউ করে বেরিয়ে আসত। একবার গাধার অভাবে একটি কুকুরকে এক ছাত্রের লেপের তলায় ঢুকিয়ে দেয়। ঘুমন্ত ছাত্র পাশ বালিশ মনে করে কুকুরকে জাপটে ধরে — আর কুকুর ঐ ছাত্রের পায়ে কামড়ে দেয়। ঐ ছাত্র ভীষণ ভয় পেয়ে যায় কুকুরের কামড় খেয়ে — ভেবেছে জলাতঙ্ক বুঝি হয়েছে। ভয়ে জল খাওয়া স্নান করা বন্ধ করে দেয়। ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা যায় কিছুই হয়নি। তবে ব্যাপারটা গুরুতর নালিশ যায় ভাইস প্রিন্সিপাল বিনয় গোপাল রায়ের কাছে। বিনয়বাবু খোঁজ-খবর নিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন ভাগ্য ভাল গাধা যে কামড়ায় নি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তিনি তাঁর আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃতির রঙমহলে পৌঁছে দিয়েছেন গানে গানে। গীতবিতান এর প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস এই শান্তিনিকেতন। প্রকৃতি পর্যায়ের গানগুলি ছড়িয়ে আছে পলাশের ডালে, শিউলি তলায়, বকুলের গন্ধে, ঘাসের শিশিরে। ঋতুর সোহাগে সব জীবন্ত কথা বলে। বর্ষার মাতন, বসন্তের আগুন, সুনীল শরৎ, কুহেলিবিহীন হেমন্ত, পাতাঝরা শীত এবং দারুণ অগ্নিবানের প্রখর গ্রীষ্মকে বুঝতে হলে যেতে হত শান্তিনিকেতনে। ঋতু বৈচিত্র্যের অনুভূতি শিরায় শিরায় অনুভূত হত। ঋতু বৈচিত্রের গানের ডালি ছাত্র-ছাত্রীরা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ উপহার দিতেন। সে সময়ে শান্তিনিকেতনে যাঁরা সশরীরে উপস্থিত ছিলেন তারা জীবনের রসদ , জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছেন। গান আর প্রকৃতি মিলিয়ে শান্তিনিকেতনের বেশিরভাগ উৎসব। বৃক্ষরোপন, হলকর্ষণ, বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব।

একবার বাইশে শ্রাবণ — গুরুদেবের মৃত্যুবার্ষিকী সকালে পালিত হল — প্রথমে উপাসনা ক্ষিতিমোহন সেনের — তারপর গান — 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' নীলিমা গুপ্তের (সেন) — যারা শুনেছে কেউই ভুলতে পারেনি নিশ্চয়ই। বিকেলে কলেজ হস্টেলের ভিতরে বৃক্ষরোপন। শিশু বৃক্ষকে চতুর্দোলায় নিয়ে এসে 'মরু বিজয়ের কেতন ওড়াও' গানের সঙ্গে নৃত্যশোভাযাত্রা। তারপর 'আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল' গানটি হল -- মনের স্মৃতিতে স্থায়ী দাগ কাটে। পরদিন সকালে শ্রীনিকেতনে 'হলকর্ষণ' — বিশেষ অতিথি হয়ে এলমহার্স্ট সাহেব এসেছিলেন। তারপর সুসজ্জিত ষাঁড়কে দিয়ে লাঙল টানানো হল সঙ্গে গান গাওয়া হল 'ফিরে চল মাটির টানে' — এ দৃশ্য দেখে গ্রামের ছেলেদেরও অন্য অভিজ্ঞতা হল।

শান্তিনিকেতনে সবচেয়ে উজ্জ্বল অনুষ্ঠান বসন্তোৎসব। আম্রকুঞ্জে ফাগের খেলার সঙ্গে গান। মেয়েরা সব হলুদ শাড়ি আর ছেলেরা হলুদ ধুতি পাঞ্জাবি। 'খোল দ্বার খোল', 'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়' এসব গানের সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের নাচ। অনেক বেলা অবধি বিভিন্ন নাচ গান চলতে থাকে। রাতে খোলা আকাশের নীচে অতন্দ্র চন্দ্রকে সাক্ষী রেখে নৃত্যনাট্য বা গীতিমুখর নাটক অভিনীত হত। পুজোর আগে চলত একটানা নানা নাটক নানা ভবনের। রবীন্দ্র নাটক বলে কোন কথা নেই — যেকোন নাটক হত। শান্তিনিকেতন থেকে নাটকেব দল প্রতি বছর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও শহরে যেত অভিনয় শৈলি দেখাতে। কলকাতা, পাটনা, বোম্বে, দিল্লি এসব জায়গায়। ডাকঘর, চন্ডালিকা, তাসের দেশ, চিত্রাঙ্গদা, বাল্মীকি প্রতিভা, মুক্তধারা, ফাল্গুনী, অরূপরতন, বিসর্জন ইত্যাদি নাটক বার বার অভিনীত হত।

ঋতু উৎসব ও নাটক বাদ দিয়ে আর একটি আনন্দের দিন ছিল 'গান্ধী পুণ্যাহ'। প্রতি বছর ১০ই মার্চ আশ্রমের ছেলে-মেয়ে ও শিক্ষকরা অন্যদিনকার রুটিন বাদ দিয়ে মেথর,

ঝাড়ুদার, মালি, ঠাকুর, চাকর, পিওন, বেয়ারাদের ছুটি দিয়ে ওদের সব কাজ করে থাকেন। ঐদিন শান্তিনিকেতনে বিরাট উৎসব। নন্দলাল বসু বরাবর পায়খানা সাফের কাজ করতেন। ছেলেরা বাসন মাজত — সঙ্গে গল্প হৈচৈ। গান্ধীজি ১৯১৫ সালে শান্তিনিকেতনে এসে বলেন, ঠাকুর চাকর কেন ছাত্ররা নিজেরা নিজেদের কাজ সারা বছর করুক। রবীন্দ্রনাথ এক কথায় রাজি। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ফল উল্টো হলো। মাস্টার মশাইরা ক্লাসে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আর পান না। কেউ কুটনো কুটছে, কেউ রান্না করছে, কেউ বাসন মাজছে, কেউ জল তুলছে। পড়াশোনা আর হয়না। এ ব্যবস্থা বাতিল করে বছরে একদিন ১০ই মার্চ 'গান্ধী পুণ্যাহ' নাম দিয়ে পালন করার রীতি করলেন রবীন্দ্রনাথ।

পৌষ সংক্রান্তির দিন 'শ্রীভবন' এর বড় মেয়েরা এসে পিঠে বানাত। সবাই খেত আনন্দ করে। আর পুজোর ঠিক আগে একদিন বসত 'আনন্দ বাজার'। বেশির ভাগই খাবার দোকান, অন্য সমগ্রীও থাকত। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা গোপন রেখে আগে থেকেই প্রস্তুতি চালাত। একার, দলের বা বিভাগের হত। পাঠভবন, শিক্ষাভবন, বিদ্যাভবন, কলাভবন, সঙ্গীতভবন — সকলেরই আলাদা আলাদা। ফলে জোর প্রতিযোগিতা। মেলার দিন ভোরবেলা থেকে শুরু হয় প্রস্তুতি দোকান ঘর সাজিয়ে। যার যার প্রয়োজনীয় সামগ্রী টেবিল-চেয়ার, খাটিয়া এনে নিত। কিছু বেলা হলেই দেখা যেত নানা নামের নানা দোকান সেজে উঠেছে। বড় মেয়েরা পর্দার আড়ালে বসে নানা স্বাদের খাবার বানাতে লেগে যেত। পিঠে, স্যান্ডউইচ, চপ, কাটলেট, কেক, সরবৎ ইত্যাদি। ছোট ছোট মেয়েরা উত্তরায়নের ফুলের বাগানের ফুল সাবাড় করে মালা গেঁথে মালা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ফিরি করতে। কয়েকজন সং সাজত। ফকিরের ছদ্মবেশে কেউ কেউ বসে যেত গাছ তলায়। মৌনী বাবা সাধু সেজে একজন বসে গেল ঘণ্টাতলায়। নানা গয়না নিয়ে এক ফেরিওয়ালা বেরিয়ে পড়ল ডালা সাজিয়ে।

আনন্দবাজার শুরু হয় সেই ১৯১৬ সাল থেকে। প্রথমবার রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না — তিনি ছিলেন জাপানে। এরপর থেকে তিনি শান্তিনিকেতনে থাকলে আনন্দবাজারে যেতেনই এবং চড়া দামে জিনিস কিনতেন। তিনি সাধারণত লটারি, পুতুলের দোকান, ফুলের দোকান ইত্যাদিতে যেতন। তাঁর উপস্থিতি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়িয়ে দিত। শ্রীমতি রাণু মুখোপাধ্যায়কে লেখা 'ভানু সিংহের পদাবলী'র একটি চিঠি থেকে জানা যায় তিনি কিভাবে আনন্দবাজারে গিয়ে আনন্দ করেছিলেন এবং চার আনার রুমাল এক টাকা দিয়ে কিনেছিলেন।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা ছাত্র-ছাত্রী উভয়ই খুশি হত। কারণ বিশাল বপু দিলদরিয়া এই মানুষটি অকাতর পয়সা খরচা করতেন এই ক্ষুদ্র মেলায় এসে। তাঁকে নিয়ে খাবার দোকানে ঢুকলে পকেটের পয়সা খরচ হত না অন্য কারও যত চড়া দামই হোক

না কেন তিনি সব মিটিয়ে দিতেন। জুতা পালিশের নাম করে একবার একটি ছাত্র তাঁর থেকে পুরো এক টাকা আদায় করেছিল। পূর্বে আনন্দবাজার বসত শালবীথি ও আম্রকুঞ্জ ঘিরে। পরে গৌর প্রাঙ্গন এ হয়। প্রথমবার হয় মাধবী বিতানে যেখানে জগানন্দ রায় অংকের ক্লাস নিতেন।

১৩২৬ সালের 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা' থেকে জানা যায় সে বছর আনন্দবাজারে ছাত্ররা একটি জাদুঘর খুলেছিল — যার নাম দেওয়া হয়েছিল প্রত্নতত্ত্বগিরি। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন প্রমথনাথ বিশি। পত্রিকায় লেখা হয়েছিল — "শালের ছায়াবীথিতে ছাত্রদের একটি আনন্দবাজার বসিয়াছিল। ছাত্ররা নিজেরাই নানা রকম খাবার দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দোকান করিয়াছিল। অনেক ছাত্র নানাবিধ গাছের কাঁটা সংগ্রহ করিয়া একটি পরিদর্শিনী খুলিয়াছিল। যেসব ছাত্র গান গাইতে জানে, তাহারা প্রত্যেক দোকানে দোকানে গান গাহিয়া পয়সা সংগ্রহ করিয়াছিল। আর একদল ছেলে এক প্রত্নতত্ত্বাগার খুলিয়াছিল। সেখানে ছিল রামের পাদুকা (অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দবাবুর জুতা), অশোকের হস্তলিপি (জনৈক বর্তমান ছাত্রের নাম অশোক), বুদ্ধের পাদনখকণা (জনৈক বর্তমান ছাত্রের নাম বুদ্ধদাস) ইত্যাদি। প্রত্যেক দোকানদারের লাভের অংশ অর্ধেক দরিদ্র ভাণ্ডারে আর অর্ধেক পত্রিকা বিভাগের তহবিলে দেওয়া হইবে।"

১৯৫০ সালে ছাত্ররা একটি প্রদর্শনী খুলে সবাইকে চমকে দেয়। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অমর্ত্য সেন। প্রদর্শনীতে ছিল গীতার পাণ্ডুলিপি (জনৈক ছাত্রী গীতা সেনের হাতের লিখা), শিবের জটা (ছাত্র শিবকৃষ্ণ করের আঠা লাগানো চুল) — এরকম আরো বিচিত্র সব সম্ভার।

১৯৫২ সালে অমিতাভ চৌধুরী একটি ছড়ার দোকান দিয়েছিল নাম 'অন্নপূর্ণা কবিতা ভাণ্ডার।' "সাইবোর্ডের নিচে লেখা ছিল — এখানে সুলভে ফরমায়েসে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কবিতা লেখা হয়। অর্ডিনারী চারি আনা, স্পেশাল আট আনা।" সাইবোর্ড লিখে ও এঁকে দিয়েছিলেন রাণী চন্দ। সাইনবোর্ডের ওপরে ছিল সিদ্ধিদাতা গণেশের উল্টানো ছবি। দোকানের সামনে কাউন্টারে বসেছিলেন অমিতাভ চৌধুরীর পক্ষে অমর্ত্য সেন যিনি বর্তমানে নোবেল জয়ী অর্থনীতির অধ্যাপক এবং তার সহপাঠী মৃণাল দত্ত চৌধুরী যিনি পরে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক হন। ছিলেন একজন রিসেপশনিস্ট — মঞ্জুলা দত্ত। দোকানের পেছনে ঘেরাটোপে বসেছিল অমিতাভ চৌধুরী কাগজ-কলম নিয়ে। অমর্ত্য সেন ও মৃণাল দত্ত চৌধুরী চেঁচিয়ে খদ্দের জোগাড় করতেন — আর মঞ্জুলা দত্ত অর্ডার নিতেন নাম বা বিষয়, স্পেশাল না অর্ডিনারী — এসব চিরকুটে লিখে অমিতাভ চৌধুরীর কাছে ভিতরে দিয়ে আসতেন। এভাবে ৮৭টি ছড়া লিখে ফেলেন অমিতাভ চৌধুরী। তার মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে।

এরপর ঘেরাটোপ থেকে পালিয়ে যান এক খাবারের দোকানে। অমিতাভ চৌধুরীর খদ্দেরদের মধ্যে ছিলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচি, অনিল কুমার চন্দ, রাণী চন্দ, সেকালের চিত্র তারকা সুপ্রভা মুখার্জী, পরবর্তীকালের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট দেবকান্ত বড়ুয়া, শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ।

শ্রীনিকেতনে প্রতি বছর মাঘ মাসে ছোটখাটো মেলা বসত। গ্রামের প্রচুর লোক আসত। তবে শান্তিনিকেতনে সবচেয়ে বড় পরব পৌষ উৎসব। শ্রীনিকেতনের মেলায় শাক-সব্জীর প্রদর্শনী হত। পৌষ মেলা যেমন আকারে বেড়েছে তেমনি প্রকারেও। ১৯৫১ সাল থেকে মেলা চলে আসে ছাতিমতলায়। তখন অতিথিদের খাওয়ানো হত জেনারেল কিচেনে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে শাল পাতায় খিচুড়ি-ডালনা-চাটনি-ভাজা। ছাত্ররা পালা করে পরিবেশন করত। অতিথিদের থাকতে দেওয়া হত শান্তিনিকতেন বাড়িতে, সিংহসদনে, সংগীত ভবনে। শীত আটকাতে মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া হত খড়। বার্ষিক সমাবর্তন বরাবর পৌষ মেলার সময়ে হত। নেহেরু আসতেন। সত্যেন বসু উপাচার্য হবার পর ১৯৫৭ সালে একটি বার মাত্র সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় উত্তরায়নের ভিতর — কলকাতার কায়দায় প্যান্ডেল তৈরি করে। এসেছিলেন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়। প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ। নেহেরু স্থান পরিবর্তনে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর ভাষণে বলেন বিশ্বভারতী অনেক বড় হচ্ছে বটে কিন্তু সরে যাচ্ছে তার মূল স্থান থেকে। "We are going far away from mango-groves." নেহরুর জন্যই সমাবর্তন ফেব চলে আসে আম্রকুঞ্জে। মেলার সময় প্রধান আকর্ষণ ছিলেন নেহরু। তিনি কখনো ছুটে যেতেন মেলারমাঠে আবার কখনো রান্নাঘরে সবার সাথে বসে খিচুড়ি খেতেন বা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সাথে খেলা শুরু করে দিতেন। সরোজিনী নাইডু বিশ্বভারতীর আচার্য থাকাকালীন অনেকবারই এসেছেন। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে যাবার পর নেহরুর সঙ্গে নিয়মিত ইন্দিরা আসতেন। সঙ্গে থাকত ফুটফুটে দুই পুত্র রাজীব ও সঞ্জিব ধবধবে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী পরে।

দশ পৌষ অর্থাৎ দশমীর দিনে বড়দিন। মন্দিরে খ্রিস্টোৎসব। মোমবাতি জ্বালিয়ে ক্রিসমাস ক্যারোল। সঙ্গে গান 'একদিন যারা মেরেছিল তারে গিয়ে'। দশমীর বিষাদ শুরু হতে না হতেই আবার আনন্দের হিল্লোল। একদল মেলা শেষে দোকানপাট ভেঙ্গে গোছগাছ করছে। আর কিছু ছাত্র রাতেই এক্সকার্সন এ বেরোত ট্রেইনে চেপে। এক একটি ভবন এক এক জায়গায় যেত। শিক্ষা ভবনের দলনেতা বরাবর অনিলদা। সঙ্গে রাণীদি ও ছোট্ট অভিজিৎ। কলা ভবন বরাবর রাজগীর যেত। এছাড়া ভুবনেশ্বর, দুমকা, কোডার্মা, ভীমবাঁধ। এসব জায়গায়ও যেত। এক্সকার্সন ছাড়াও পিকনিক হত। কোপাই নদীর ধারে, গোয়ালপাড়ায় কিংবা কার্তিকবাবুর বাগানে।

সারা বছর বিশেষ করে পৌষ মেলার সময় কত যে জ্ঞানী-গুনী ও মানী ব্যক্তিগণ শান্তিনিকেতনে আসতেন তা নাম লিখে শেষ করা যাবে না। শান্তিনিকেতনের মাটির টানে

প্রাক্তনীরা আসতেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরও তাঁর ছোঁয়া স্পর্শ অনুভূত হত শান্তিনিকেতনের লতায়-পাতায়-ডালে-গাছে-ফুল-মঞ্জরিতে বিভিন্ন পথে ও বাড়িতে। প্রাক্তনীরা তাঁর অদৃশ্য প্রাণের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতেন যা ছিন্ন হবার নয় কোনভাবেই। আশ্রমিকরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে।

দেশে ফিরলে একবার শান্তিনিকেতন আসা। পৌষ উৎসবটা ছিল প্রাক্তনীদের একটা মিলন উৎসব। 'আমাদের শান্তিনিকেতন, আমাদের সব হতে আপন' — গানটি করতে ভুলতেন না — সমবেত কণ্ঠে গেয়ে উঠতেন। সিনেমা জগতের সঙ্গে যুক্ত প্রাক্তন ছাত্র সত্যজিৎ রায়, হরিসাধন দাশগুপ্ত, সুশীল মজুমদার, রামানন্দ সেনগুপ্ত, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় মাঝে মাঝে আসতেন। পক্ষিবিশারদ প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত এসে বাইনাকুলার নিয়ে এ গাছ থেকে ও গাছে তাকাতেন।

রাজশেখর বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, প্রশান্ত মহলানবিশ, কালিদাস নাগ, অপূর্ব কুমার চন্দ আসতেন। সস্ত্রীক আসতেন সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র। বুদ্ধদেব বসু সপরিবারে এসে পঁয়তাল্লিশ সালের গোড়ায় প্রাক্তনী বাড়িতে ছিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায় শান্তিনিকেতনের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী প্রায়ই আসতেন তাঁদের সেদিনের ছোট্ট মেয়ে নবনীতাকে নিয়ে। মৈত্রেয়ীদেবী, বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল এসে সাহিত্যিকায় অংশগ্রহণ করতেন। সৈয়দ মজুতবা আলি ও শান্তিনিকেতনের স্থায়ী বাসিন্দা হন। ১৯৪৮ সালে রবিশঙ্কর এসে সেতার বাজিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। জর্জদা-দেবব্রত বিশ্বাস ৭ পৌষ মাঝ রাত্রে ট্রেনে এসে পৌঁছতেন। তাঁকে দেখে সবাই চিৎকার করে বলত 'জর্জদা এসে গেছেন'। মুখে পান আর কাঁধে লম্বা ঝোলায় থাকত কম্বল। কালোর দোকানে বসে একের পর এক গান করতেন। সিনেমা জগতের অসিতবরণ, অমর মল্লিক, ভারতী দেবী, মলিনা দেবী, জলু বড়াল, জহর রায় আসতেন।

পি সি সরকার (সিনিয়র) শ্রীনিকেতনে একবার ম্যাজিক দেখান। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সলিল চৌধুরী এসেছিলেন এবং গানে মাতিয়ে দেন মেলা প্রাঙ্গন। ১৯৫৫ সালে নির্মলেন্দু চৌধুরী দলবল নিয়ে এসে লোকসংগীতের তুফান তুলেন। শান্তিনিকেতনবাসীরা পায় নূতন স্বাদ। উত্তম কুমার আসতেন আউটডোর সুটিং এর ফাঁকে। শহীদুল্লাহ, জাসিমুদ্দিন, আবদুল ওদুদকে শান্তিনিকেতনে দেখা গেছে। জসিমুদ্দিন শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় কবির লড়াই শুরু করেন। দুই বন্ধু অরুণ কুমার চন্দ ও ফকরুদ্দিন আলি আমেদ হঠাৎ এসে উপস্থিত হন কলেজে মুনলাইট পিকনিকে। খ্যাতনামা বিপ্লবী রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ আসলে আশ্রমে হৈ চৈ পড়ে যায়। মনীশ ঘটক, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এসেছেন কয়েকবার। পূর্ণেন্দু পত্রী একবার পৌষ মেলার শীতের রাতে এসে সারা রাত মেলার স্কেচ নিয়েছিলেন। গরুর গাড়ির তলায়

শুয়ে আছে সাঁওতাল, জিলিপি ভাজছে ময়রা, খড় জ্বালিয়ে আগুন পোহাচ্ছে গাঁয়ের লোক। চিত্র পরিচালক বিমল রায় ও ক্যামেরাম্যান সৌরীন সেন এলেই সর্বত্র ছবি তুলতেন।

১৯৫৩ সালের সাহিত্য মেলায় দুই বাংলার নামকরা সবাই এসেছিলেন। এর উদ্যোক্তা ছিলেন অন্নদা শঙ্কর রায়। মোতহার হোসেনের সরস বক্তৃতায় সকলে মুগ্ধ হয়েছিলেন। গান্ধীজির ছেলে দেবদাস গান্ধী কন্যা তারাকে নিয়ে আসেন পঞ্চাশের দশকে ভর্তি করাতে। অর্থনীতিবিদ ডঃ জ্যোতি ভট্টাচার্যের সঙ্গে তখনই তারা গান্ধীর বিয়ে হয়। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে অসুস্থ ইউসুফ মেহেরালি বিশ্রামের জন্য শান্তিনিকেতন আসেন। তিনি মালঞ্চ বাড়িতে অনেকদিন ছিলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ আসেন স্ত্রী প্রভাবতী দেবীকে নিয়ে। রাজা গোপালাচারি, রাজেন্দ্র প্রসাদ, রাধাকৃষ্ণাণ, কৃষ্ণ মেনন, সৈযদ মাসুদ, বিনোবা ভাবে এসেছেন বিভিন্ন সময়ে। প্রফুল্ল ঘোষ বীরভূম থেকে নির্বাচনে দাঁড়ান এবং প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন — তিনিও আসেন। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের কন্যা ঋতা এখানকাব ছাত্রী ছিলেন — তিনিও এসেছেন বেশ কয়েকবার।

সরোজিনী নাইডু আচার্য ছিলেন — প্রতি বছরই আসতেন। তিনি যেমন হাসি খুশি থাকতেন তেমনি রসিকতা করতেন। আসলে থাকতেন উদয়নে। একদিন বিকেলে অনিল চন্দের বাড়ি যান। তাঁর স্ত্রী রানী চন্দের তখন খুব নাম ডাক। তাঁর আঁকা ছবি বিদেশে প্রদর্শিত হচ্ছে। পরিহাস কবে আচার্য সরোজিনী নাইডু বলেন — "অনিল, তুমি কিচ্ছু না। দেখ তো রাণীর কত নাম ডাক।" তৎক্ষণাৎ জবাবে অনিল চন্দের জুড়ি নেই — বললেন "ঠিকই বলেছেন ম্যাডাম। আমার অবস্থা অনেকটা আপনার স্বামীরই মতো। আই অ্যাম সরোজিনী নাইডুস হাসব্যান্ড।" সরোজিনী নাইডু হাসতে হাসতে অনিল চন্দের গালে একটি মিষ্টি চড় মারেন। ১৯৪৫ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আচার্য কৃপালনী শান্তিনিকেতন আসেন। তাঁর শাশুড়ি প্রেমবালা মজুমদার শান্তিনিকেতন থাকতেন — তাই বলেন 'শ্বশুরবাড়ি এসেছি।'

বিখ্যাত সরোদ বাদক আলাউদ্দিন খাঁ অতিথি অধ্যাপক পদে শান্তিনিকেতন আসেন। ছুটির দিনে সকালে এবং অন্য দিন সন্ধ্যায় তিনি নাতি আশিসকে সঙ্গে নিয়ে সরোদ বাজাতেন। বাজনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি আত্মকথা বলতেন। এই কথাগুলি ছাত্র শুভময় টুকে রাখতেন এবং এ নিয়ে 'আমার কথা' নামে তাঁর জীবনী গ্রন্থ লিখে ফেলেন। তিনি তবলা ও বেহালা বাজাতেন — আবার গানও গেয়ে উঠতেন — "মন মাঝি বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারলাম না।"

এসরাজ, সেতার ও উচ্চাঙ্গ সংগীতে অতুলনীয় অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন থাকতেন। তিনি বিষ্ণুপুরের অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাতি। নৃত্যনাট্যে তিনি একাই জমিয়ে রাখতেন ফাঁক পূরণের বাজনায়। আবার তিনি কলা-গলা দলের হয়ে মাঠে নেমে দুর্ধর্ষ

হাকব্যাক খেলতেন। আর আসতেন সুচিত্রাদি কি ঘরোয়া আসর কি পোশাকি আসর সবখানেই অদ্বিতীয়া। তিনি নাগরদোলা চড়তেন, কালোর দোকানে গান গাইতেন, রাত জেগে যাত্রা দেখতেন, পায়ে হেঁটে খোয়াই ছুটতেন — এমন অফুরন্ত প্রাণবন্ত মানুষ কমই দেখা যায়।

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হবার পর প্রথম 'দেশিকোত্তম' দেওয়া হয় এলিনোর রুজভেল্টকে। ১৯৫৭ সালে চু এন লাই দেশিকোত্তম হন। তিনি শান্তিনিকেতনে একদিন থাকেন এবং একদিনেই শান্তিনিকেতনের আপনজন হয়ে উঠেন। কিচেনে গিয়ে খেয়েছিলেন এবং সংগীত ভবনে মন্দিরা বাজিয়ে মণিপুরী নাচ নেচেছিলেন। সেদিন ইতালির চিত্র পরিচালক রোজেলিনিও এসেছিলেন।

রতনকুটির-এর দু'পাশে দু'টি বাড়ি তৈরি হয়েছিল — স্কলার্স ব্লক। ওখানেই থাকতেন বেশিরভাগ বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী। মার্কিন দূত চেষ্টার বোলজের মেয়ে সিনথিয়াও ছিলেন ছাত্রী। সিনথিয়া সালোয়ার পাঞ্জাবী দোপাট্টা পরতেন। চমৎকার বাংলা শিখেছিলেন — হাতের লেখা ছিল মুক্তার সারি। সিনথিয়া শান্তিনিকেতন নিয়ে একখানা চমৎকার বাংলা বই লিখেছিলেন এবং বলতেন ভারত তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি। লিলি মি, লুসি মি দুই বোন ছিলেন। চীনা অধ্যাপক তান সাহেবের দুই মেয়ে তান ওয়ান, তান চামেলি একেবারে বাঙালি বনে গেছিলেন। তান ওয়ান দিল্লিতে বাংলার অধ্যাপিকা হন। শান্তিনিকেতনে তখন বিদেশ থেকে বা অন্য রাজ্য থেকে যারা পড়তে আসতেন সবাই বাংলা শিখতেন। কালোর দোকানে দেখা যেত পাঞ্জাবের রানা, গুজরাটের ধীরুভাই, কেরলের বিক্রম নায়ার বাংলাতেই আড্ডা মারতে। জাপানী অধ্যাপক কাসুগাইয়ের ছেলে-মেয়েরা বাংলায় ভালো রচনা লিখত। তিব্বতি অধ্যাপক লামাজির ছেলেমেয়েরাও চেহারায় নাহলেও চাল-চলন কথাবার্তায় খাঁটি বাঙালি ছিল। আফ্রিকার ছেলেদের বাংলা আয়ত্ত্ব করতে খুব কষ্ট হত। তবে খেলার মাঠে ফুটবল দুর্দান্ত খেলত কেনিয়ার ওকেলো। মাথার চুল ছিল কাঁঠালের গায়ের মতো। পরবর্তী জীবনে ওকোলো কেনিয়ার ফিনান্স মিনিস্টার হয়ে যান। বালি দ্বীপের ইডা বাগুস মন্ত্র আই এ ক্লাসে ভর্তি হয়ে ডক্টরেট হয়ে বেরিয়ে যান। পরে ইন্দোনেশিয়া সরকারের সংস্কৃত দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল হন। বিদেশীদের সঙ্গে এ দেশীয়দের মেলামেশা ছিল খুব। আলাদা কোন বিশেষ খাতির বা অপরিচয়ের দূরত্ব কোনটাই ছিল না। ওরাও আস্তে আস্তে সবার সাথে কিচেনেই বসে খাওয়া-দাওয়া করত। ওরা যে বিদেশী দু'দিন পরে চলে যাবে তেমন কোন কিছু এদেশের ছাত্ররা ভাবত না। কোন অনুষ্ঠানের শেষে কিংবা দল বেঁধে বাইরে থেকে বেরিয়ে ভুবনডাঙ্গার কাছাকাছি এসে সবাই মিলে গান ধরতেন — 'আমাদের শান্তিনিকেতন, আমাদের সব হতে আপন' সহযাত্রী বিদেশীরাও এ গানে গলা মেলাতেন। বিদেশী-দেশি মিলেমিশে একাকার। কোন তাফাৎ থাকত না।

১৯৪৯-৫০ সালে শান্তিনিকেতনে এন সি সি চালু হয়। সামরিক শিক্ষা অর্থাৎ এন সি

সি চালু হওয়ায় ইংরেজির অধ্যাপক এস কে জর্জ শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যান। এন সি সি অবশ্য পুরোদমে চলেছে। পূর্বপল্লীতে তাদের নতুন বাড়ি হয় নাম 'কুমার সদন' — নামাকরণ করেন ক্ষিতিমোহন সেন।

উত্তরায়ণের সামনে পেছনে বাগান, লতানো আম ও পেয়ারা গাছ, জাপানী লেক। বাগানে ছিল ময়ূর ও সারস। দেশী-বিদেশী সব রকমের ফুল ও ফলের গাছ। উদয়ন বাড়ির স্থাপত্য দেখার মতো। উদয়নেই থাকতেন রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী। আর রথীন্দ্রনাথের গুহাগৃহ যেন স্বপ্নের বাড়ি। চারদিকে রকমারি ফুল। চন্দন, শিমুল, মুচকুন্দ, পলাশ, পারুল যেন উজ্জয়িনীর উদ্যান। রথীন্দ্রনাথ কত বড় শিল্পী ছিলেন এ উদ্যান না দেখলে বুঝা যেত না। আর এ উদ্যান কোন দৈত্যের বাগান নয় সেখানে ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ প্রবেশাধিকার। সামনে ছিল গোলাপ বাগান। শ্যামলীব পাশে কাঠ গোলাপ, কোনার্কের গায়ে নীলমণিলতা ও বিরাট শিমুল গাছ। মনোরম শোভায়, ফুলের গন্ধে ও রঙে ছাত্র-ছাত্রীরা আবিষ্ট হয়ে যেত — আর ভাবত সারা জীবন এখানে থেকে গেলে হয়। একেবারে পশ্চিমে ছিল 'প্রান্তিক' — সেখানে থাকতেন রবীন্দ্রনাথের শ্যালক নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী — সবাই বলত মামাবাবুর বাড়ি। 'প্রান্তিক' এর আগে খড়ের বাড়ি 'বাসবী'তে থাকতেন সেবকদা ও নন্দলাল দুহিতা যমুনা সেন। তিনি ভালো নাচতেন। তাঁরই দিদি গৌরী 'নটীর পূজা'য় নটী সেজে কলকাতার মঞ্চে নেচেছিলেন ১৯২৫ সালে। ভদ্র ঘরের মেয়ের মঞ্চে নাচা এই প্রথম। অবশ্য এর পূর্বে মঞ্চে নেচে বদনাম কুড়িয়েছিলেন সাগব-নৃত্য-খ্যাত রেবা রায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'রক্ত করবী'র অভিনয়ে নন্দিনী চবিত্রের জন্য মনোনীত করেছিলেন।

টাটা বিল্ডিং এর পিছনে ছিল তিনটি পাকা বাড়ি ও দু'টি খড়ের বাড়ি। পাকা তিনটি বাড়িতে থাকতেন ব্রজকান্ত গুহ, শিবদাস রায় ও সুধীন ঘোষ। পাকা বাড়ির অনেক পেছনে খোয়াই এর কাছে একটি বাড়ি কিনেন হৃষিকেশ চন্দ এবং অন্যটি শঙ্খ চৌধুরী। শঙ্খ চৌধুরীর পরে রামকিঙ্কর বেইজ থাকতেন। শ্রীনিকেতনে যাবার পথে তাঁর ভাস্কর্য — হাটের পথে সাওতাল পরিবার অসাধারণ। কাপড় শুকোতে শুকোতে বাড়ি ফেরার মূর্তি তৈরি করেন পরে। দুপুর রোদে টোকা মাথায় খাকি হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি পরে কিঙ্করদার ভাস্কর রূপ তাঁর ভাস্কর্যের চেয়ে কম আকর্ষক ছিল না। সংগীত ভবন প্রাঙ্গণে জয়া আপ্পাস্বামীর আদলে সুজাতা, কলাভবন প্রাঙ্গণে গান্ধীজি, শ্রীভবনের লাগোয়া বুদ্ধমূর্তি এবং আরও কিছু মূর্তি শান্তিনিকেতনের প্রকৃতিকে করেছিল মনোমুগ্ধকর।

রামকিঙ্কর বেইজের বাড়ির আরো পরে শ্মশানের কাছে ছোট্ট একটা বাড়িতে থাকতেন শিল্পী কিরণ সিংহ বিদেশিনী স্ত্রীকে নিয়ে। তিনি কদাচিৎ বেরুতেন ও কথা বলতেন। লম্বা রঙিন জোব্বা পরে দ্রুত পায়ে বোলপুর বাজারে যেতেন আর পেছনে ছুটতেন তাঁর শাড়ি পরা মেম বউ। ১৯৮১ সালে ইন্দিরা গান্ধী তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে আবার সকলের সঙ্গে

পরিচিত করে তোলেন। এ জায়গাগুলিকে মনে হত দূর এক সময়ে এগুলি হয়ে গেছে আস্তে আস্তে শান্তিনিকেতনের ডাউনটাউন।

উত্তরায়ণ ছাড়া আর ছিল হাওয়া গড়ের রাজার বাড়ি। চারদিকে এত আলো বাতাস দেখে বুদ্ধদেব বসু নাম দিয়েছিলেন 'হাওয়াগড়'। এটা ছিল বিশ্বভারতীর আচার্যের জন্য নির্দিষ্ট। ফাঁকা খোয়াই আর তাল গাছের সারির কাছাকাছি এক কোনে থাকতেন ওমরখৈয়ামের সেই বিখ্যাত অনুবাদক কান্তি চন্দ্র ঘোষ এবং তাঁর হাঙ্গেরিয়ান স্ত্রী এটা ঘোষ। শান্তিনিকেতনে ধুতি-পাজামা-পাঞ্জাবীর পরিবেশে তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী — তিনি প্যান্ট-শার্ট পরতেন। মাথায় হ্যাট, মুখে চুরুট, লাঠি ঠক ঠক করে বিকালে বেড়াতে বেরুতেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই খুব মিশুকে ছিলেন।

উত্তরায়নের ভেতরে 'উদীচি' ছিল। 'পুনশ্চ'তে থাকতেন প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী। 'শ্যামলী'তে পরে এলেন সুধীরেন্দ্র নাথ ঠাকুরের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা। 'কোনার্ক' এ অনিল চন্দ, রাণী চন্দ ও অভিজিৎ। 'মালঞ্চ' এ কবি-কন্যা মীরা দেবী এবং নন্দিতা ও কৃষ্ণ কৃপালনী। শ্রীভবন এর লাগোয়া বুদ্ধ মূর্তির পরের বাড়িতে থাকতেন শান্তিদেব ঘোষ, তাঁর স্ত্রী, মা ও ভাই-বোনেরা। শান্তিদা ওরা ছয় ভাই এক বোন। সবাই এক হলে মহোৎসব শুরু হত। শান্তিদা পড়া, লেখা, গান সমান তালে চালাতেন। আবার দেখা যেত সাইকেলে বোলপুর ঘুরে আসছেন। ভাই সাগরময় ঘোষ এর গানের গলা চমৎকার। যদিও পরে গান ছেড়ে দেয়। অন্য ভাইয়েরা সমীরদা, সলিলদা, সুবীরময়, শুভময়। কনিষ্ঠ শুভময় ছিলেন সেবায়, গানে, আবৃত্তিতে চলনে-বলনে প্রকৃত আশ্রম বালক। তাদের একমাত্র বোন বুড়িদি—সুজাতা মিত্র — ভাল নাচিয়ে। 'শ্যামা', 'চিত্রাঙ্গাদয়' বহুবার অভিনয় করেছেন। তাঁর মেয়ে আঁখিও চমৎকার নাচত। আর আঁখির মেয়ে কুঁড়ি। 'তাসের দেশ' নাটকে বুড়িদি, আঁখি ও কুঁড়ি — তিন পুরুষ এক সঙ্গে নেচেছিলেন রবীন্দ্র সদনে। অমলা সরকার সে সময় গান শেখাতেন পাঠ ভবনে। গানের গলা ছিল মনোহর আর কারুশিল্পে তো তিনি নামজাদাই ছিলেন।

অজীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অমিতা ঠাকুর প্রায়ই মেয়ে স্মিতাকে নিয়ে আসতেন। অজিনদা নানা বয়সীর সঙ্গে মিশতে পারতেন। মজার মজার গল্প ঠোঁটস্থ। অভিনয়ও করতেন ভালো। অমিতাদির অভিনয় তো ঐতিহাসিক। 'তপতী'তে ছিলেন মহিষী। ভাল লিখতেনও। সন্তোষ মিত্র নামকরা শিল্পী ছিলেন। অভিনয়েও সেরা, বিলেতও গেছেন। দড়ি পাকানো শরীরে খালি গায়ে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে মাঠে গরু চেড়াতেন মাটি কোপাতেন। সত্যজিৎ রায় 'অশনি সংকেত' সিনেমায় তাঁকে দিয়ে অভিনয় করিয়েছেন।

ক্ষিতিমোহন সেনের দুই কন্যা মমতা ও অমিতা। মমতা দাশগুপ্তা 'লাবু' নামেই বেশি পরিচিতা। ভাল অভিনয় করতেন। রবীন্দ্রনাথ আদর করে ডাকতেন 'পুষ্পলাবী'। আশুতোষ সেন ও অমিতা সেনের কন্যা মঞ্জু এবং পুত্র অমর্ত্য। অমিতা সেন তাঁদের শৈশবের শান্তিনিকেতন নিয়ে দু'খানা অসাধারণ বই লিখেছেন।

গুরুপল্লী — খড়ের বাড়ির সারি। প্রথম বাড়িতে থাকতেন অজিত কুমার চক্রবর্তী — তাঁর স্ত্রী লাবণ্যলেখা। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি অসাধারণ রূপসী ছিলেন। গুরুপল্লীতে থাকতেন সুখময় শাস্ত্রী, মোহরদির বাবা সত্যদা, প্রমদা রঞ্জন ঘোষ, ভুজঙ্গদা, সুখময়দা, গোঁসাইজি, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। হরিবাবু একা লিখেন 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' — ১৯৪৪ সালে তাঁর কাজ শেষ হয়। এরপরও তিনি পুরো লেন্সের চশমা পরে রোজ বিদ্যাভবনে বা লাইব্রেরিতে যেতেন এবং বই ঘাঁটাঘাঁটি করতেন। বয়স আশির কোঠায় পৌঁছে গেলেও লাঠিতে ভর দিয়ে পুরনো অভ্যাস মতো লাইব্রেতিতে যেতে ভুল করতেন না।

রচনা সূত্র ঃ— শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনী অমিতাভ চৌধুরীর অসাধারণ স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'শান্তিনিকেতনের সুখের বারমাস্যা'র আকর আঁকড়ে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। ঘটনার বর্ণনা মূলতঃ চল্লিশের দশক থেকে ষাটেব দশকেব। তবে শান্তিনিকেতনের নিজস্ব পরব ও মেলা আজও অটুট আছে।

প্রজাপরায়ণ রবীন্দ্রনাথ

মাত্র আটাশ বৎসর বয়সে দুই সন্তানের জনক রবীন্দ্রনাথের উপর জমিদারী দেখা শোনার ভার পড়ে। ১৮৮৮ সালে কবি সপরিবারে শোলাপুর বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানেই পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে ডেকে পাঠান। ১৮৮৯ সালে কবি স্ত্রী-পুত্র -কন্যা নিয়ে শিলাইদহে যান জমিদারীর তদারকির জন্য।

মহর্ষির জমিদারী বেশ বিস্তৃতই ছিল। বাংলায় ছিল তিনটি পরগনা তিন বিভিন্ন জেলায়। পাবনা জেলার শাজাদপুরে, রাজশাহির কালিগ্রামে এবং নদীয়ার বিরাহিমপুরে। এছাড়া উড়িষ্যাতেও ছিল আরও তিনটি ছোট ছোট জমিদারী। বাধ্য হয়েই তাঁকে সাহিত্য সৃষ্টির কেন্দ্রস্থল কলকাতা ছাড়তে হলো জমিদারী দেখাশোনার তাগগায়। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহেই তাঁর কার্যালয় স্থাপন করলেন এবং সপরিবারে সেখানেই থাকা স্থির করলেন। বাংলাদেশ নদী প্রধান দেশ— নদী পথেই তিনি শাজাদপুর ও কালিগ্রাম, কুষ্ঠিয়া, কুমারখালি, পতিসর এবং অন্যান্য জায়গায় যাতায়াত করতেন। শিলাইদহে পদ্মানদীতে 'পদ্মা' নামে বোট থাকত— এ বোটে করে তিনি খাল বিল পার হয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতেন—উদ্দেশ্য মানুষের অবস্থা দেখা এবং মানুষকে জানা। জমিদারী দেখার সুবাদে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের খবরে বিচলিত হতেন, এসবের বর্ণনা তাঁর লেখায় ফুটে ওঠত।

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন দেশ সেবা মানেই লোকসেবা। আর গ্রামের মধ্যেই ভারতের উন্নতি। দেশের কর্ণধারদের প্রতি তিনি বার বার সাবধান বাণী ও পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি তাঁর জমিদারীর অন্তর্গত গ্রামে প্রজাদের নানা ভাবে উন্নয়নের চিন্তা করতেন—শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ও কৃষির।

শান্তিনিকেতনে চলে আসেন ১৯০১ সালে। তবে পাশাপাশি জমিদারী, সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনেও জড়িয়ে পড়েন। স্বদেশী গান লিখে ও বিভিন্ন সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে তিনি দেশবাসী ও নেতৃবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলেন—"দেশে আমাদের যে বৃহৎ কর্মসংস্থানকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে, কেমন করিয়া তাহা আরম্ভ করিব ? উচ্চ চূড়াকে আকাশে তুলিতে গেলে তাহার ভিত্তিকে প্রশস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আমাদের কর্মশক্তির চূড়াকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে যদি অভ্রভেদী করিতে চাই তবে প্রত্যেক জেলা

হইতে তাহার ভিত গাঁথার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।"

আবার অন্যত্র লিখেছেন—"মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই; এইখানেই প্রাণের নিকেতন; লক্ষ্মী এইখানেই তাঁহার আসন সন্ধান করেন" কৃষকদের আর্থিক দুরাবস্থার জন্য দায়ী অনউন্নত কৃষি পদ্ধতি—তাই তিনি পুত্র রথীন্দ্রকে ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে আমেরিকায় পাঠান ১৯০৬ সালে উন্নত কৃষি পদ্ধতি শিখে আসার জন্য। জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেও সেখানে পাঠিয়েছিলেন এক বৎসর পর একই উদ্দেশ্যে। শিক্ষা সমাপ্ত করে একে একে তিনজনই ফিরলেন। প্রথমেই রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে গেলেন শিলাইদহে। সেখানে তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে জমিদারীর অবস্থা, কৃষকদের অবস্থা ও সমস্যা পুত্রকে বুঝান। তিনি কী কী কাজ শুরু করেছেন এবং কী কী কাজ বাকি আছে।

১৯০৭ সালে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর ভাষণের এক জায়গায় বলেছিলেন—"গ্রামের মধ্যে চেষ্টার কোন লক্ষণ নাই। যে জলাশয় পূর্বে ছিল আজ তাহা বুজিয়া আসিতেছে। কেননা দেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ। যে গোচারণের মাঠ ছিল তাহা রক্ষণের কোন উপায় নাই; যে দেবালয় ছিল তাহা সংস্কারের কোন শক্তি নাই। যে সকল পণ্ডিত সমাজের বন্ধন ছিলেন তাঁহাদের গন্ডমূর্খ ছেলেরা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যবসায় ধরিয়াছে;................ পরস্পরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় গ্রাম উন্মাদের মতো নিজের নখে নিজেকে ছিন্ন করিতেছে, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার কেহ নাই; জঙ্গল বাড়িয়া উঠিতেছে, ম্যালেরিয়া নিদারুন হইতেছে, দুর্ভিক্ষ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; আকাল পড়িলে পরবর্তী ফসল পর্যন্ত ক্ষুধা মিটাইয়া বাঁচিবে এমন সঞ্চয় নাই................ তাহার পর যা খাইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে তাহার কী অবস্থা! .... অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, ভরসা নাই, পরস্পরের সহযোগিতা নাই, আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া মরি, অবিচার উপস্থিত হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি এবং আত্মীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকি।"

জমিদারী দেখা শোনার কাজ আরম্ভ করে প্রথমেই তিনি গ্রামের প্রজাদের মধ্যে সালিশী বিচারের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি বিচার সভা স্থাপন করেন। নিজেদের মধ্যে কোন বিবাদ বাধলে ঐ বিচার সভায় উপস্থিত হতে হবে উভয় পক্ষকে। শুধু ফৌজদারী হলে আদালতে যাবে। এ নিয়ম ভঙ্গ করলে প্রজারা তাকে এক ঘরে করবে। বিচারে অসন্তুষ্ট হলে আপীলের ব্যবস্থা থাকবে। প্রজাদের সম্মতিক্রমে সমস্ত পরগণার জন্য পাঁচজন সভ্য নিয়ে একটি আপীলসভা নির্বাচন করে দেন। এই পাঁচজনকে বলা হত পঞ্চপ্রধান। আর পঞ্চপ্রধানের বিচারে সন্তুষ্ট না হলে শেষ আপীল ছিল স্বয়ং জমিদারের নিকট। বিচারের জন্য

বাদী-বিবাদী কোন পক্ষেরই ব্যয় বহন করতে হত না। এরূপ বিচার ব্যবস্থার সুবিধা প্রজারা বেশ বুঝতে পারে এবং তাদের থেকে পূর্ণ-সহযোগিতাও ছিল। দেওয়ানি বিচারের ভার প্রজারা এভাবে নিজেরাই বহন করত। তাদের মামলা বেশি হতো জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের।

শিলাইদহের চারপাশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদভাব বিশেষ ছিল না— ফলে অবিশ্বাস জন্ম নেয়। প্রজারা সরল মনোভাব হারিয়ে ফেলে কুষ্ঠিয়া, কুমারখালি অঞ্চলে। নতুন কিছু করতে গেলে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যেতনা। কুষ্ঠিয়াতে অবশ্য বয়নশিল্প প্রতিষ্ঠান ভালোভাবে চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কালিগ্রাম পরগণাতে বেশি মনোযোগ দিতে পেরেছিলেন— কারণ সেখানকার প্রজাদের মধ্যে উদ্যম ও একাগ্রতা ছিল। কাজের সুবিধার জন্য এই পরগণাকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেছিলেন। কালিগ্রাম পরগণার প্রজাদের দ্বারা 'কালিগ্রাম হিতৈষী সভা' এবং বিভাগে একটি করে 'বিভাগীয় হিতৈষী সভা' গঠন করেন। শান্তিনিকেতন থেকে তিনি প্রতিটি বিভাগে কর্মী পাঠিয়ে ছিলেন কাজ দেখাশোনা করার জন্য। প্রতিটি গ্রামের একজন বয়জ্যেষ্ঠ গ্রামপ্রধান হতেন এবং সমস্ত গ্রাম প্রধানদের নিয়েই বিভাগীয় 'হিতৈষী সভা' গঠিত হত। তিন বিভাগের প্রধানেরা পাঁচজন 'কেন্দ্রীয় হিতৈষী সভা'র সভ্য নির্বাচন করত। তাদের বলা হত পরগণার পঞ্চপ্রধান। বৎসরে একবার কেন্দ্রীয় হিতৈষীসভার মিটিং হত। সেখানে একজন জমিদারের প্রতিনিধি থাকতেন। মিটিং-এ গেল বছরের বিভিন্ন কাজের হিসাব পরীক্ষা এবং কোন খাতে কত ব্যয় হয়েছে দেখা হত। এছাড়া আসছে বছরের কাজের পরিকল্পনা ও খরচের হিসাব প্রস্তুত করা ইত্যাদি। এছাড়া জমিদারের কর্মচারীর কোন ত্রুটি বা প্রজাদের প্রতি অত্যাচারের নজির থাকলে জমিদার মহাশয়কে তা জানানো।

টাকায় তিন পয়সা হিতৈষীসভার জন্য রাখা হত। তাতে বার্ষিক পাঁচ/ছয় হাজার টাকা আয় হত। রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য এস্টেট থেকে আরো দুই হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নিকট 'শিক্ষা' বিষয়টি ছিল সর্বাগ্রে। কালিগ্রাম পরগণার মধ্যে কোন স্কুলই ছিলনা। হিতৈষীসভা অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন গ্রামে পাঠশালা, তিনটি বিভাগে তিনটি মধ্য ইংরেজি ও পতিসরে একটি হাইস্কুল স্থাপন করেন। স্কুলবাড়ি ও ছাত্রাবাস নির্মাণের মতো টাকা হিতৈষীসভার ছিল না। এ টাকা তিনি এস্টেট থেকে দিয়েছিলেন।

শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবার কথাও চিন্তা করেছিলেন। তিনটি বিভাগে ডাক্তারসহ ডিসপেনসারি স্থাপন করেন। এগুলিতে প্রতিদিন বহু রোগী চিকিৎসার সুযোগ পেত।

বর্ষাকালে ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে নৌকা চালালে শস্যের ক্ষতি হয়— তাই তিনি রাস্তা তৈরি করে দেন। পতিসর থেকে আত্রাই স্টেশন পর্যন্ত সাত মাইল রাস্তা নির্মাণে বিপুল

অর্থের প্রয়োজন— তা তিনি এ্যাস্টেট থেকে দিয়ে সম্পন্ন করে ছিলেন। এছাড়া ডোবা-পুকুর সংস্কার করা, জঙ্গল পরিষ্কার করা, পানীয়জলের জন্য কূপ খনন ইত্যাদি নানা কাজ হিতৈষীসভা করেছিল। পতিসরে একটি ধর্মগোলার ব্যবস্থা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে রথীন্দ্রনাথ কৃষি সম্পর্কে নানা চিন্তাভাবনা শুরু করলেন। উন্নত পদ্ধতি ও বিভিন্ন ধরনের চাষ সম্পর্কে কৃষকদের শিক্ষণের কাজে ঝাপিয়ে পড়েন। শিলাইদহে কুঠিবাড়ির নিকটে খাস জমিতে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেন। আমেরিকা থেকে চাষবাসের কয়েকটি যন্ত্রপাতি ও উন্নত বীজ এনে কৃষি কাজে লাগানো হল। ধান ছাড়া অন্যান্য ফসল ভুট্টা, আলু, টমেটো চাষ কৃষকদের শেখানো হয়। মাটি পরীক্ষার জন্য রাসায়নিক ল্যাবরেটরী গড়ে তুলেন। সারের ব্যবহার শেখান। শিলাইদহে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হয়। কিন্তু পতিসরে বর্ষার জল নেমে গেলে আর কোন চাষ কবা সম্ভব হচ্ছিল না দেখে তিনি প্রজাদের বাড়ির চারপাশে ও ক্ষেতের আইলে নানা স্থানে আনারস, কলা, খেজুর গাছ লাগাবার জন্য উৎসাহিত করেন। বলেন, আনারস বিক্রয় যোগ্য ফল এবং পাতা থেকে ভালো সূতা তৈরি হয়।

আত্রাইতে একটি খাদি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। বন্যায় গবাদি পশুর মৃত্যু হয়— ফলে চাষবাসের অসুবিধা হয়। তাই কিছু ট্রাকটবের ব্যবস্থা করেন। গ্রামে প্রথম ট্রাক্টর দেখে গ্রামের মানুষের আনন্দের সীমা ছিল না। কবিপুত্র বথীন্দ্রনাথ নিজে ট্রাক্টর নিয়ে কালিগ্রাম পরগনার মাঠে নেমেছিলেন— কারণ কেউ চালাতে জানত না। যখন চাষবাসের কাজ থাকেনা তখন যাতে কৃষকরা বিভিন্ন ধরনের কুটীবশিল্পেব কাজ করে তার ব্যবস্থা ও পরামর্শ দিয়েছিলেন। কালিগ্রামে ভালো তাঁতি ছিলনা— মোটা রকমের গামছা বুনতে পারত। তাঁদের কয়েকজনকে শান্তিনিকেতনে পাঠানো হল ভালো ডিজাইনের তাঁতের কাপড় বুনা শেখার জন্য। তারপর পতিসরের মাটি শক্ত এঁটেল—চাষের পক্ষে সুবিধের নয়—পটারীর কাজটাকে কুটীর শিল্পে পরিণত করার পরিকল্পনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ছাপ তৈরি শেখাতে পারলে গ্রামের মানুষের উপরকারে আসবে এ চিন্তা তাঁর মাথায় ছিল।

নানাভাবে চাষীদের উন্নয়নের চিন্তা করেও তিনি দেখলেন তাদের অর্থাভাব দুর করা যাচ্ছে না। দেনায় ডুবে থাকে, ঋণ তাদের জীবনের সঙ্গী। অবস্থাপন্ন লোক গ্রামে খুবই কম। প্রজারা মহাজনদের টাকা শোধ করার চেষ্টা করত। কিন্তু সুদের মাত্রা এত বেশি—সুদ দিতেই প্রাণান্তকর অবস্থা—আসল কোনদিনই শোধ হতনা। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় চালাতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত। এদিকে চাষীদের আর্থিক দুরবস্থা দেখে তিনি বিচলিত। এ অবস্থায় ধারদেনা করে পতিসরে একটি কৃষি ব্যাঙ্ক খুলেন। তিনি শতকরা ৮ টাকা সুদে টাকা ধার নিয়েছিলেন ব্যাঙ্কের জন্য- আর চাষীরা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিত ১২ টাকা সুদে। এ অবস্থায় ব্যাঙ্কের কোন

লাভ থাকত না আনুসঙ্গিক খরচ মিটিয়ে। এ অবস্থায় নোবেল পুরস্কারের ১০৮০০০ টাকা তাঁর হাতে আসে। তিনি দ্বিধায় পড়ে গেলেন—টাকাটা শান্তিনিকেতনের উন্নয়নে লাগাবেন না চাষীদের। সুরেন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথের পরামর্শে টাকাটা শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নামে পতিসর কৃষি ব্যাঙ্কে জমা রাখেন। এ বিরাট মূলধন পেয়ে ব্যাঙ্কের খুব সুবিধা হল। অনেকে টাকা ব্যাঙ্কে আমানত রাখত। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বৎসরে আট হাজার টাকা করে পেত। কালিগ্রাম পরগণা থেকে মহাজনরা তাদের কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। অনেক কৃষক ঋণমুক্ত হয়েছিল। কিন্তু কৃষি ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধ হয়ে যায় যখন Rural Indebtedness আইন প্রবর্তন হয়। প্রজাদের ধার দেওয়া টাকা আর আদায় হয়নি। সে সঙ্গে নোবেল প্রাইজের আসল টাকাও আর বিশ্বভারতীকে কৃষিব্যাঙ্ক ফেরত দিতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় ও পরিকল্পনায় গ্রামবাসীদের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। যেসব জোলারা গামছা বুনতে পারত তারা ধুতি, শাড়ি, বিছানার চাদর বুনতে শেখে। উন্নত মাছ ধরার জাল ও খাঁচা বানাতে শেখে। কুমোররা নানা ধরনের মাটির বাসন বানাতে পারত। পতিসরের হাইস্কুলে ছাত্র জায়গা হতনা—পড়াশোনায় গ্রামবাসীদের এমনই উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল।

কৃষি এবং কৃষকের উন্নতি অর্থাৎ গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতি চিন্তা থেকে সমবায় পদ্ধতিতে চাষের ধারণা পরিচিতি লাভ করে। সমবায়ের মাধ্যমে চাষের জন্য শিক্ষিত লোকেদের আগে আগ্রহী করে তোলা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' (১৯০৪) প্রবন্ধে কম্যুনিটি প্রজেক্টের নীতির উপর আলোকপাত করেন। প্রাকৃতিক বা অন্য কোন বিপর্যয়ে সরকারের নিকট ভিক্ষা প্রার্থী হওয়ার কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন সাধারণ ভারতবাসীর নিকট রাষ্ট্রের চেয়ে বড় হল সমাজ বা কম্যুনিটি। 'সমাজ'কে যদি সংগঠনের বা সমবায়ের কার্যপদ্ধতির ধারক হিসাবে মেনে নেওয়া যায় তবে সরকারের মূলনীতিগুলি মানুষ সহজে বুঝতে পারবে।

স্বদেশী সমাজের চিন্তাধারার পরের ধাপই সমবায়। ভারতবর্ষে প্রথম সমবায় আইন তৈরি হয় ১৯০৪ সালে ঋণদান সমিতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও সাহায্য করার জন্য। তারপর ১৯১২ সালে সর্বপ্রকার সমবায় সমিতি সম্পর্কে আইন পাশ হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সমবায়ের ক্ষেত্রে ঋণদানের চেয়েও বড় প্রয়োজন উৎপাদন সংহতির। তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলেছেন—"আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সমবায় প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লান হয়ে আছে, মহাজনী গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিত শোধিত আকারে বহন করেছে, সম্মিলিত চেষ্টা জীবিকা-উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগল না।"

—রাশিয়ার চিঠি, ১৩৬৩ সংস্করণ, পৃ-১১৭।

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পল্লী উন্নয়ন প্রচেষ্টা 'শ্রীনিকেতন' এর প্রতিষ্ঠা করেন ১৯২২ সালে।

সমবায়ের কর্মপন্থা মনে প্রাণে গ্রহণ করাই বড় প্রয়োজন— অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতার কথা তাঁর মনে বিশেষ স্থান পায়নি। তিনি বলেছেন—"সমবায় প্রণালীতে চাতুরী কিংবা বিশেষ একটা সুযোগে পরস্পর পরস্পরকে জিতিয়া বড়ো হইতে চাহিবে না। মিলিয়া বড়ো হইবে। এই প্রণালী যখন পৃথিবীতে ছড়াইয়া যাইবে তখন রোজগারের হাটে আজ মানুষে মানুষে যে একটা ভয়ঙ্কর রেষারেষি আছে তাহা ঘুচিয়া গিয়া এখানেও মানুষ পরস্পরের আন্তরিক সুহৃদ হইয়া, সহায় হইয়া, মিলিতে পারিবে।"

—সমবায়নীতি, পৃ-১২।

রবীন্দ্রনাথ আবেদনের চেয়ে স্বাবলম্বনে বেশি বিশ্বাসী ছিলেন। তবে উৎপাদনের চিরকালীন পদ্ধতিগুলি ত্যাগ করা আবশ্যক ছিল তাঁর নিকট। আর্থিক অসাম্য তাঁর চোখে বড় অন্যায়। রাশিয়া ভ্রমণের ফলে সোভিয়েত আর্থিক ব্যবস্থার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেখানকার আর্থিক অসাম্যনীতিতে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। ভ্রমণের প্রথম দিকেই তিনি লিখেছেন—"এখানে এসে যেটা সবচেয়ে আমার চোখে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে এই ধন গরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব।"

স্বাধীনতা হারাবার ইতিহাস ও পুনরুদ্ধারের প্রয়াস

দেশের কৃতী সন্তানদের আত্মবলিদান ও ত্যাগের ফলে দেশ স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট মধ্যরাত্রে। দেশ কীভাবে স্বাধীন হয়েছে এর যেমন ইতিহাস আছে — তেমনি দেশ কীভাবে পরাধীন হয়েছিল — তারও ইতিহাস আছে।

১৭৫৭ সালের জুন মাসে পলাশীর প্রান্তরে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীন নবাব সিরাজদৌল্লার সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাঁধে এবং নবাবের পরাজয় হয়। পলায়নরত অবস্থায় বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের নির্দেশে তাঁর পুত্র মিরণ সিরাজদৌল্লাকে হত্যা করে শাসনব্যবস্থা করায়ত্ত করে। ক্লাইভ বাংলার গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। বাংলার সূর্যাস্ত হওয়া মানে সারা ভারতের সূর্যাস্ত হওয়া। দেশীয় রাজাদের পরস্পর হানাহানি ইংরেজদের গদি দখল সহজ হয়েছে। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে মীরকাসিমের পরাজয় ইংরেজদের উত্থানের পথ আরো সুগম হয়। ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ লর্ড উপাধিতে ভূষিত হন এবং পুনরায় তাঁকে বাংলার গভর্নর জেনারেল করে পাঠানো হয়। বক্সারের যুদ্ধে দিল্লিব মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম পরাজিত হন ইংরেজদের নিকট। ক্লাইভ দ্বৈত শাসননীতি প্রবর্তন করেন এবং এর কু-প্রভাবে বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়-এতে এক তৃতীয়াংশ মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা চরমে ওঠে।

১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসেন। তিনি কোম্পানির প্রাধান্য বজায় রাখতে দেশীয় রাজ্যগুলির শক্তি হরণ প্রক্রিয়ায় মনোযোগ দিলেন। ১৭৭৩ সালে Regulating Act পাশ হয়-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ অধিকৃত স্থান সমূহের সংহতি স্থাপন করা এবং প্রশাসনিক ঐক্যের গোড়া পত্তন করা। অল্প সময়ের মধ্যে যে বিরাট পরিমাণ ভূ-খন্ডের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল তার রাজনৈতিক সংহতি সাধনের জন্য Regulating Act বা কেন্দ্রীকরণ আইন অত্যন্ত জরুরি ছিল। এদিক দিয়ে বিচার করলে ওয়ারেন হেস্টিংস এর শাসনকাল ব্রিটিশ প্রশাসনিক সংহতি ও কেন্দ্রীয়করণের কাল বলা যেতে পারে। কিছুদিন যাবার পর ব্রিটিশদের কাছে মনে হল এ আইনটিও যথেষ্ট নয়। কারণ গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের সম্পর্ক ও ক্ষমতা এবং বিভিন্ন প্রেসিডেন্সির কাউন্সিলের পারস্পরিক সম্পর্কের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এ আইনে ছিলনা বলে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হয়। তাই ১৭৮৪ সালে পিট এর 'ভারত আইন' পাশ হয়। এর দ্বারা একটি বোর্ড অব কন্ট্রোল গঠন করা হয়। একজন সেক্রেটারি, অর্থমন্ত্রী, চারজন প্রিভিকাউন্সিলের সদস্য নিয়ে। বোর্ড

অব কন্ট্রোলের অনুমতি ভিন্ন গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিল কোন যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি স্থাপন করতে পারবেনা। বোর্ড অব কন্ট্রোলকে ভারতের যাবতীয় রাজস্ব, সামরিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১৭৮৬ সালে বাংলায় লর্ড কর্ণওয়ালিস গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন। তিনি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন স্থাপন করেন, বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশি ব্যবস্থায় সংস্কার করেন। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ব্যবস্থা তিনিই চালু করেন ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে বাংলা এবং বিহারে, পরে উড়িষ্যা, বেনারস প্রভৃতি জায়গায়।

ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের পর ভারতে অবাধ বাণিজ্য নীতি চালু করে। ফলে দেশীয় শিল্পের বিনাশ ঘটে। বিশেষত বস্ত্র শিল্প ধ্বংস হয়ে যায় যা বিগত দুই হাজার বৎসর যাবৎ বিশ্ব দরবারে সমাদৃত ছিল। বিভিন্ন হস্ত শিল্পও প্রতিযোগিতায় আস্তে আস্তে পিছিয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডে মেসিনে প্রস্তুত পণ্য সামগ্রীর সঙ্গে দেশীয় হাতে তৈরি সামগ্রী এঁটে উঠতে পারেনি। ভারত ব্রিটেনে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রীর বাজারে পরিণত হল। আর ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বলতে এখান থেকে কাঁচামাল অতি সস্তায় ব্রিটেনে রপ্তানি হত।

ইংরেজ শাসনে ভারতীয়দের শোষণ, পীড়ন ও লুণ্ঠনের মাত্রা চরমে গিয়ে পৌঁছে। ভারতীয়রা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ করতে শুরু করল। কৃষক বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ (১৮৩১), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫) হয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ মহা বিদ্রোহ ঘটিয়ে ছিল। ইংরেজ ও ভারতীয় সিপাইদের মধ্যে বেতন বৈষম্য ছিল। এছাড়া রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামরিক— সব কারণই ছিল। বাংলার ব্যারাকপুরে ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ মঙ্গল পান্ডে নামক সিপাহি প্রথম বিদ্রোহের সূচনা করেন। ক্রমে বিদ্রোহের আগুন সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। মীরাট থেকে বিদ্রোহীরা দিল্লি পৌঁছে— মুঘল বংশধর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। ঝাঁসির রাণী ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দেন। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে বন্দি করে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়।

সিপাহি বিদ্রোহ শুধু সিপাহিদের নয়— এটা ছিল সমগ্র জাতির আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ। এ বিদ্রোহকে দেশ বিদেশের বহু পন্ডিতগণ জাতির প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন।

১৮৫৭ সালের পর ভারতীয় মনীষীগণের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হয়। ১৮৫৪ সালে বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড্ এর 'ডেসপাচ্' বা 'নির্দেশনা' ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার 'মহাসনদ' বলে অভিহিত। এ মহাসনদ এর প্রস্তাব মূলে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বেতে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয় ১৮৫৭ সালে। এর ফলে ভারতের সর্বত্র উচ্চশিক্ষা বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৮৮২ সালে 'হান্টার কমিশন' গঠনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়া হয়।

লর্ড কার্জনের রাজত্বকালে 'বঙ্গভঙ্গ'র প্রতিরোধে সর্বাত্মক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মসমাজ (১৮৬৫), প্রার্থনা সমাজ (১৮৬৭), আর্যসমাজ (১৮৭৫)— সমাজ সংস্কারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। হিন্দুদের যেমন পথ প্রদর্শক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, মুসলমানদের ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ। তাঁর আলিগড় আন্দোলন মুসলিম সমাজকে আধুনিকতার পথ দেখিয়েছিল।

১৮৭৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতরম্' সংগীত রচনা করেন— যা স্বদেশমন্ত্রে পরিগণিত হয়।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। কংগ্রেস নেতৃবর্গ ভারতের জাতীয় সমস্যার প্রতি নজর রেখেছিলেন। ইংরেজ সরকারের জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করাই ছিল উদ্দেশ্য। ভারতীয়দের দাবিদাওয়ার প্রতি কর্ণপাত না কারই স্বভাবে দাঁড়িয়েছিল। এদিকে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সুকৌশলে বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিল। "Divide and Rule" নীতি দ্বারা জাতীয় কংগ্রেসকে দুর্বল করার চেষ্টা তো ছিলই। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 'বয়কট' ও 'স্বদেশী' আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়। ঐদিন কলকাতায় 'অরন্ধনব্রত' প্রতিপালিত হয়। বাঙ্গালিরা উপোস থেকে জাতীয় শোক দিবস পালন করে। দলে দলে গঙ্গাস্নানের পর হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান নির্বিশেষে পরস্পরের হাতে রাখি বেঁধে "বাংলার মাটি, বাংলার জল............" গান গাইতে গাইতে শোভাযাত্রা করে জনসভায় যোগদান করে। ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথ মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ২৭টি স্বদেশগীতি রচনা করে বাঙ্গালির মধ্যে গভীর উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে 'স্বরাজ' এর দাবি ওঠে। তিলক ও অ্যানি বেসান্ত পৃথক পৃথক 'হোমরুল লীগ' স্থাপন করেন। 'স্বরাজ' ও 'বয়কট' প্রসঙ্গে কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে অভিজ্ঞতাপুষ্ট হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রথমে শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। সকলকে জাতীয় আন্দোলনে শামিল করার প্রস্তুতি নেন। 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলনই ছিল তাঁর পথ।

১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার 'রাওলাট আইন' বলবৎ করে— এ আইনে যে কোন ব্যক্তিকে আটক, যথেচ্ছভাবে দন্ডদান, নির্বাসন ও সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা— প্রভৃতি ক্ষমতার অধিকারী হয়। মহাত্মা গান্ধি ভাইসরয় চেম্‌স্‌ফোর্ডকে এ আইন বলবৎ না করার অনুরোধ জানান। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। এতে গান্ধিজি মর্মাহত হয়ে দেশবাসীকে

সত্যাগ্রহ এর পথে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার আহ্বান জানান। এমনই এক শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের একটি ফাঁকা উদ্যানে। পাঞ্জাবের সামরিক জেনারেল ডায়ার নিরস্ত্র নরনারীর উপর গুলি করার নির্দেশ দেন— দশ মিনিটে ১৬০০ গুলি বর্ষিত হয় তাতে প্রায় এক হাজার (সরকারি হিসেব মতো ৬৭৮) নরনারী নিহত হন। এ জঘন্য নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ঘৃণা ও প্রতিশোধ গ্রহণের মনোভাব সর্বত্র সৃষ্টি হয়। এ হিংস্রতার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্যার' উপাধি পরিত্যাগ করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে বহুগুণে শক্তিশালী করেছিল।

১৯২০ সালে বহুজন কাম্য আই,সি,এস, পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে ঐ চাকুরি ত্যাগ করে (মে, ১৯২১) ১৬ জুলাই ১৯২১ সালে সুভাষচন্দ্র বোম্বাই এসে পৌঁছে মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গান্ধিজি তাঁকে কলকাতায় এসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেশের কাজ করার পরামর্শ দেন। মহাত্মা গান্ধির নির্দেশে ও নেতৃত্বে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলনে খুব সাড়া পড়েছিল। চৌরিচৌরার ঘটনায় ১৯২২ সালে পুলিশ চৌকিতে অগ্নিসংযোগের ফলে ২২ জন পুলিশ এর মৃত্যু হয়— তাতে গান্ধিজি এ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন অহিংস আন্দোলন সহিংস হয়ে পড়েছে। তাঁর যুক্তি ছিল নীতি ও আদর্শভ্রষ্ট হলে জাতীয় আন্দোলনে সাফল্য আসবে না। কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাগণ— জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। এমতাবস্থায় মহাত্মা গান্ধিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচারে ৬ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়।

১৯২২ সালে স্বরাজ পার্টি গঠিত হয়। সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সম্পাদক মতিলাল নেহরু। কংগ্রেসের প্রথম সারির বহু নেতা আইনসভায় প্রবেশের পক্ষে ছিলেন— তাঁরা স্বরাজপার্টির হয়ে কাজও শুরু করলেন। কংগ্রেস ও শেষ পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া গেল। বাংলা এবং মধ্যপ্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হল— বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ (উত্তর প্রদেশ), আসামে যথেষ্ট সংখ্যক আসন দখল করতে সমর্থ হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১০৫টির মধ্যে ৪৮টি আসন দখল করতে সমর্থ হয়। আর মহম্মদ আলি জিন্নাহর নেতৃত্বে 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট' নামে ২৪ জন নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজপার্টির নেতৃত্বে ছিলেন মতিলাল নেহরু। 'স্বরাজ' ও 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট' পার্টির সহায়তায় জাতির স্বার্থ বিরোধী বহু প্রস্তাব বাতিল করা সম্ভব হয়েছিল। অনুরূপভাবে বাংলা ও মধ্যপ্রদেশ জাতির পক্ষে বহু প্রস্তাব পাশ ও বিপক্ষে বাতিল করতে সমর্থ হয়েছিল।

১৯২৭ সালে কংগ্রেস দেশের জন্য সংবিধানের একটি খসড়া প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে 'পূর্ণ স্বরাজ' এর দাবি উত্থাপিত হয়। এমতাবস্থায় ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারি দিনটি

ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়— উদ্দেশ্য স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ জনপ্রিয় করে তোলা।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৯ সালে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি নূতন দল গঠন করেন। এ জন্য তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে তাঁকে নিরাপত্তার কারণে গ্রেপ্তার করে। সুভাষচন্দ্র জেলে অনশন করতে শুরু করেন। তারপর তাঁকে স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণে গৃহবন্দি থাকার আদেশ দেন। চব্বিশ ঘন্টা পুলিশ প্রহরায় ছিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের চোখে ধুলা দিয়ে ২৬ শে জানুয়ারি ১৯৪১ সালে ছদ্মবেশে দেশ থেকে অন্তর্ধান হন।

ঐ বছরই অর্থাৎ ১৯৪১ সালের ২৫ ডিসেম্বর জার্মানির সেনাবাহিনী কর্তৃক ধৃত ভারতীয় ৩৬ হাজার সেনাদের নিয়ে হিটলারের সম্মতিক্রমে সিঙ্গাপুরে ভারতীয় সৈনিক জেনারেল মোহন সিং কর্তৃক Indian National Army গঠিত হয়। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু Indian Independence league নামে অপর একটি সংগঠন স্থাপন করেছিলেন। নেতাজি ১৯৪৩ সালে সিঙ্গাপুরে পৌঁছে ২৬ শে আগস্ট রাসবিহারী বসু ও মোহন সিং এর দুটি সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করে গঠন করলেন— নূতন নাম হল 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' এবং নেতাজি এর সর্বাধিনায়কপদ গ্রহণ করলেন। সিঙ্গাপুরে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গঠন করেন (১৯৪৩)। আজাদহিন্দ বাহিনীর সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। ১৯৪৩ সালের ২৩ শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন আনুষ্ঠানিকভাবে। সার্বাধিনায়ক নেতাজি ধ্বনি তুললেন 'দিল্লি চলো'। মণিপুর, কোহিমা দখল করে আসামে প্রবেশ করলেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পাল্টে যায়—জাপানের পরাজয় হয়। জাপানের পরাজয় ও পলায়নে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা খাদ্যাভাব ও অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সৈন্যরা অস্ত্র ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এর কিছুদিন পর ৮ আগস্ট ১৯৪৫ সালে এক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রচারিত হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের বীরত্ব, ত্যাগ, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতামুক্তি, দেশপ্রেম—জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এর প্রভাবেই ১৯৪৬ সালে নৌ-বিদ্রোহ হয়। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সেনাদের উপর আর প্রাধান্য বজায় রাখতে পারবে না—এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

এদিকে ভারতে ১৯৪২ সালের ১৪ জুলাই কংগ্রেস 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং এ প্রস্তাব ৮ আগস্ট সম্মেলনে পাশ হয়। গান্ধিজী বিখ্যাত মন্ত্র 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গ' উচ্চারণ করেন। পরদিনই অর্থাৎ ৯ আগস্ট ব্রিটিশ সরকার গান্ধিজিসহ সব প্রতিষ্ঠিত নেতাকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই দেশ জুড়ে অভূতপূর্ব গণরোষের বন্যা বয়ে যায়।

১৯৪৫ সালে আজাদহিন্দ ফৌজের ২০,০০০ ফৌজের বেশ কয়েক'শ জনকে প্রকাশ্যে লাল কেল্লায় বিচারের সিদ্ধান্ত নেয় ব্রিটিশ সরকার। ভারতবাসীর চোখে আজাদ হিন্দ ফৌজের যোদ্ধারা বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। কংগ্রেসও বন্দিদের পক্ষে এসে দাঁড়াল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজাদহিন্দ ফৌজ তহবিল ও তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। মুসলিম লীগ তাদের পক্ষে ছিল। ১২ নভেম্বর 'আজাদহিন্দ দিবস' পালিত হয়। পাঁচ নভেম্বর বিচার শুরু হয়েছিল—চলছিল প্রায় দু'মাস। এর মধ্যে গোটা দেশ জুড়ে বিক্ষোভ উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছিল। আজাদহিন্দ ফৌজের প্রতি সেনাবাহিনীর অনেকেই প্রকাশ্যে সহানভূতি জানিয়েছিলেন, অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন—ব্রিটিশ সরকারকে চিন্তায় ফেলেছিল। ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে ব্রিটেনে ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ শ্রমিকদল ক্ষমতায় আসে। প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি তিন প্রতিনিধি যুক্ত 'ক্যাবিনেট মিশন' নিযুক্ত করেন। ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া মূলত কংগ্রেস, লীগ ও ব্রিটিশ সরকার-এ তিন পক্ষের মধ্যে চলছিল।

লাহোর অধিবেশনে ১৯৪০ সালেই মুসলিম লীগ স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রস্তাব গ্রহণ করে। তবে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত প্রস্তাবটি বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। বাস্তবে মুসলিম লীগের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকলেও অন্যতম জনপ্রিয় দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং নির্বাচনে সাফল্য পায়। বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে লীগের শাসন কায়েম হয়েছিল।

'ক্যাবিনেট মিশন' সম্পূর্ণ স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রস্তাবটি বাতিল করে দেয়। বিকল্প হিসেবে একটি ত্রি-স্তর দুর্বল রাষ্ট্রের প্রস্তাব দেয়। মুসলিম লীগ এ প্রস্তাবে সম্মত হয়। কংগ্রেসের অবস্থান ছিল দ্বিধাবিভক্ত। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবিতে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' আহ্বান করে। তখন কলকাতায় ভয়াবহ দাঙ্গার সূচনা হয়। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দাঙ্গা দমনে নিষ্ক্রিয় থাকে। অবলীলায় হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ চলতে থাকে। প্রায় চার হাজার মানুষ নিহত হয়। দাঙ্গা চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও বরিশালে ছড়িয়ে পড়ে। পরে নোয়াখালি ও ত্রিপুরার অবস্থা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে । ১৯৪৭ সালের মার্চের দাঙ্গা সব সীমা ছাড়িয়ে যায়।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি মন্তব্য করেন মাত্র কয়েক'শ ব্রিটিশ প্রশাসক দিয়ে ভারতীদের সক্রিয় রাজনৈতিক বিরোধিতার মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। কাজেই ক্ষমতা হস্তান্তর ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে করা হবে।

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তখন গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়। মাউন্টব্যাটেন তাঁর পরিকল্পনা পেশ করেন তিন জুন। ভারত ও পাকিস্তান দুটি পৃথক ডোমিনিয়ন হবে। বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ইত্যাদি মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলির প্রাদেশিক আইনসভাই ঠিক করবে তাদের পাকিস্তান অর্ন্তভুক্তি বিষয়টি। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং আসামের শ্রীহট্ট জেলা -

গণভোটের সাহায্যে স্থির করবে তারা কোন রাষ্ট্রে যোগদান করবে। আর দেশীয় রাজ্যগুলি সার্বভৌম ক্ষমতালাভ করবে। তবে ইচ্ছে করলে যেকোন একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগদান করতে পারবে।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন গান্ধিজি, মৌলানা আজাদ, সীমান্তগান্ধি খান আবদুল গফুর খান। গান্ধিজি বলেছিলেন- ‘ কেবলমাত্র আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে ভারত ভাগ হতে পারবে।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতা আইন পাশ হয়। এ আইনে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাত্রে ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ ধার্য হয়। কাজেই ১৫ই আগস্ট ছিল ভারতীয়দের নিকট একই সঙ্গে আনন্দ ও বেদনার। পরবর্তী সময় নেহরু বলেছেন-আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। প্রতিদিন নরহত্যার খবর আসতে লাগল। পাঞ্জাবে আগুন জ্বলছিল। ভারত বিভাগ পরিকল্পনা এ ধ্বংস লীলা থেকে বেরোনোর একটা পথ ছিল।

সম্প্রতি Indian Remembered গ্রন্থে পামেলা হিক্স লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন এর কন্যা বলেছেন - অখন্ড ভারতের বিভাজন মোটেই বাস্তব সম্মত ছিলনা। তবু তাকে ৯ মাস এগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন মাউন্ট ব্যাটেন । নেহরুর অনুরোধে ক্ষমতা হস্তান্তর চুক্তি বদলাতে হয়েছিল।

২০০৭-এ দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং- এর সভাপতিত্বে জাতীয় স্তরে একটি কমিটি তৈরি হয়েছে। এ কমিটি সিপাহি বিদ্রোহের (১৮৫৭) দেড়শ বছর, ভগৎ সিং এর জন্মশতবর্ষ এবং স্বাধীনতার হীরকজয়ন্তী উপলক্ষে সর্বভারতীয় ক্যালেন্ডার তৈরি করবে। এ ক্যালেন্ডারে নথিভুক্ত থাকবে স্বাধীনতা যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রবাহ। আবার প্রতিটি রাজ্যেও পৃথকভাবে কমিটি তৈরি করে স্থানীয়স্তরে বিদ্রোহ বা সংগ্রামের প্রামাণিক ইতিহাস তৈরি করবে।

দৈনিক আরোহণ— মঙ্গল, বুধবার, ১৪. ১৫ আগস্ট, ২০০৭ইং

স্বাধীন ভারতে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদায়

স্বাধীনতার পূর্বে ভারত ভূখন্ড দুই ভাগে চিহ্নিত ছিল-' ব্রিটিশ ভারত' ও 'দেশীয় রাজ্য'। ব্রিটিশ শাসিত ভারত অংশে ৯টি গভর্ণর শাসিত প্রদেশ ও ৫টি চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ ছিল। আর দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ছিল ৫৬২টি। তবে দেশীয় রাজ্যগুলি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে থেকে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত। ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করার সময় 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে' দেশীয় রাজাদের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হয় যাতে তারা নিজ ইচ্ছেমতো ভারত বা পাকিস্তান যে কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগদান করতে পারে অথবা নিজেরা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে ।এই দেশীয় রাজ্যগুলির বেশির ভাগই বেশ বড় এবং প্রভাবশালী ছিল। এরা যদি স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখত তবে ভারতে কম করেও ৫০০টি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হত।

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যিনি 'লৌহ মানব' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারত রাষ্ট্রে যোগদান করার জন্য কূটনৈতিক চাপ দেন। প্রযোজনে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণেরও হুমকি দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যোগ্য সহযোগী সচিব ছিলেন ভি পি মেনন। তিনি তাঁর ভদ্র ও ক্ষুরধার যুক্তির কৌশলে দেশীয় রাজাদের ভারতভুক্তির যৌক্তিকতা বুঝাতে সক্ষম হন। আরো বলা হল যাঁরা ভারতে যোগদান করবেন তাঁরা ভাতা পাবেন ও খেতাব রক্ষা করতে পারবেন। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে প্রায় সকল রাজ্যই ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করে। বাকি থাকে ২৬ টি রাজ্য। এর মধ্যে ত্রিপুরা-সহ মণিপুর, হায়দ্রাবাদ, জুনাগড়, ময়ুরভঞ্জ, ভূপাল, কাশ্মীর ইত্যাদি। তবে প্রজাদের চাপে পড়ে শেষে মণিপুর ও ত্রিপুরা ভারতে যোগদান করে।

ত্রিপুরার শেষ মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য এর মৃত্যু হয় ভারতের স্বাধীনতার অল্প আগে ১৯৪৭সালের ১৭ মে ।যুবরাজ কিরিট বিক্রম কিশোর দেববর্মণ নাবালক থাকায় ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি কাউন্সিল অব রিজেন্সি গঠন করা হয় মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর সভাপতিত্বে। মহারাণীর সম্মতিতে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ অক্টোবর ত্রিপুরা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ইতিমধ্যে গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হয়ে যায় ১৯৪৯ সনের ২৬ নভেম্বর আর তা কার্যকরী হয় ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি। সংবিধানের প্রথম তপশিল অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যগুলিকে তিন শ্রেণিতে মর্যাদা দেওয়া হয় ক,খ,গ। 'ক' শ্রেণি হল গভর্নর শাসিত রাজ্য, 'খ' শ্রেণি হল বড় বড় রাজ্যগুলি- জম্মু কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ , মহীশূর। 'গ' শ্রেণি হল চিফ

কমিশনার শাসিত রাজ্যগুলি হল- যেমন ত্রিপুরা, মণিপুর, হিমাচল প্রদেশ ইত্যাদি।

দেশিয় রাজ্যগুলির সংহতি সাধনের পর তাদের পুর্নগঠন একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। এলাকা লোকসংখ্যা বা আর্থিক ক্ষমতা — কোন বিষয়েই তাদের মধ্যে কোন সমতা ছিল না। প্রায় প্রত্যেকটি ইউনিটই ছিল বহুভাষিক। ভাষা ভিত্তিক রাজ্যপুর্নগঠনের জন্য দেশে জোরাল আন্দোলন শুরু হয়। প্রথম ভাষা ভিত্তিক রাজ্য হল অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু —তেলেগু ও তামিল ভাষার ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালে, এরপর ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুণর্গঠনের ভারতীয় জনগণের দাবিকে আর দাবিয়ে রাখা যায়নি। তাই ১৯৫৩ সালেই 'The States Reorganisation Commission' গঠিত হয় দু'জন সদস্য নিয়ে। নেতৃত্বে ছিলেন ফজল আলি এবং দু'জন সদস্য কে এম্ পানিক্কর ও এইচ এন কুনজুরু। এই কমিশন রিপোর্ট পেশ করেন ১৯৫৫ সালে এবং তাঁদের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৫৬ তে States Reorganisation Act পাশ হয়। এরপর থেকেই ভাষা ভিত্তিক রাজ্যের বিন্যাস শুরু হয়। শাসনভিত্তিক প্রয়োজনে ও আর্থিক সুবিধার্থে পূর্বের ক,খ,গ শ্রেণিবিন্যাস তুলে দেওয়া হয়। ভারতের রাজ্যগুলোকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়— পূর্ণরাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।

১৯৫৭ সালে ত্রিপুরাকে একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রূপে গণ্য করা হয়। ৩২ জন সদস্য বিশিষ্ট টেরিটরিয়েল কাউন্সিল গঠিত হয় ১৯৫৯ সালের ১৫ই আগস্ট। এই আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি ছিলেন শচীন্দ্রলাল সিংহ। বিধানসভা গঠিত হয় ১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই, মন্ত্রিপরিষদও ঐদিনই গঠিত হয়। ত্রিপুরার প্রথম রাজ্যপাল বি কে নেহেরু। ত্রিপুরাকে তিনটি জেলায় ভাগ করা হয় ১৯৭০ সালের ১ সেপ্টেম্বর। তবে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পায় ১৯৭২ সালের ২১ শে জানুয়ারি। প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ। তিনি আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁকে ত্রিপুরার রূপকার বলা হয়।

ত্রিপুরা দর্পণ— মঙ্গলবার, ২২ জানুয়ারী, ২০০৮ইং

সমাজতন্ত্রের আলোকে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি

পৃথিবীর সকল দেশের নবজাতক শিশুর কান্নার সুর এক, সকল দেশের পল্লীগীতির সুর এক এবং সকল দেশের নারী জাতির অবস্থা দুর্দশায় ভরা। ভারতবর্ষ সহ সারা পৃথিবীর নারীরা পুরুষতন্ত্রের শিকার। আংশিক সমাজসংস্কারের মাধ্যমে নারীমুক্তি আসে না। দেশে দেশে মনীষীগণ নারীমুক্তির কথা ভেবেছেন— ভাবনা অনুযায়ী বলেছেন এবং কিছু কিছু করেছেন। সমাজ সংস্কারকগণ ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রামে যে সব কুসংস্কারকে মুছে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন তাতে সমাজের লাভই হয়েছে—নারী-পুরুষ উভয়েরই লাভ হয়েছে। পুরুষতন্ত্র কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে।

মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছেন—সন্তান প্রজননই নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রথম শ্রম বিভাজন। ইতিহাসের প্রথম শ্রেণিবিরোধ একগামী বিবাহের ফলে নারী-পুরুষের মধ্যে উদ্ভুত বিরোধ এবং প্রথম শ্রেণি নিপীড়ন পুরুষ কর্তৃক নারী পীড়নের।

মনুষ্যজাতির ক্রমবিকাশের তিনটি মূলস্তরের সঙ্গে বিবাহের তিনটি রূপ দেখা যায়। বন্যাবস্থায় সমষ্টি বিবাহ, বর্বরযুগে জোড়বাঁধা বিবাহ আর সভ্যযুগে একগামিতার সঙ্গে ব্যাভিচার- ক্রীতদাসীদের উপর পুরুষের কর্তৃত্ব এবং বহুপত্নীপ্রথা। গণিকাবৃত্তি মুখে মুখে নিন্দিত হলেও গণিকাবিলাসী পুরুষদের উদ্দেশ্য করে নয়। বর্জিত পতিত হল নারীরা। এর ফলে পুরুষরা নারীদের উপর চূড়ান্ত আধিপত্য অর্জন করল।

লেনিন বলেছেন বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাশিয়া ছিল ইউরোপের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা দেশ। কিন্তু ক্ষমতা দখলের দুবছরের মধ্যে নারীমুক্তির জন্য এবং শক্তিশালী লিঙ্গের সাথে নারীর মর্যাদা সমান করে তোলার জন্য যে বলিষ্ঠ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তা ইতিপূর্বে কোন গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক দেশে নেওয়া হয়নি। পৃথিবীর যে সমস্ত ধনতান্ত্রিক এবং বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র-যারা আলোকপ্রাপ্ত কৃষ্টি, সভ্যতা, স্বাধীনতার জন্য গর্বিত তাদের দেশে বিবাহ অধিকার ও বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য মামুলি ধরনের আইন প্রচলিত ছিল যা নারীদের নিচু ধরনের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করত।

১৯ শে নভেম্বর ১৯১৮ সালে লেনিন প্রথম রাশিয়ার সমস্ত নারী শ্রমিক সম্মেলনে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেন নারীরাই সব দেশে সবার চেয়ে পিছিয়ে পড়ে থাকেন। সমস্ত সভ্য এবং উন্নত দেশেও নারীদের পারিবারিক দাসী বলা চলে। কোথাও নারীরা সম্পূর্ণ সমান অধিকার পান না। সোভিয়েত রিপাবলিকের উদ্দেশ্য প্রথমেই নারীদের

অধিকারের উপর বাধানিষেধ দূর করা। স্বাধীন বিবাহ বিচ্ছেদ চালু করা। নারীদের অবস্থা ক্রীতদাসের মতো। পারিবারিক একঘেয়ে কাজ তাদের নিষ্পেশিত করে । এর থেকে তারা মুক্তি পাবে যখন পারিবারিক ভিত্তিমূলক অর্থনীতি থেকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উত্তরণ ঘটবে এবং তখনই নারীরা পূর্ণ স্বাধীনতা ও মুক্তি পাবে।

লেনিন অন্যত্র বলেছেন—ঘরকন্নার কাজের বোঝা মেয়েদের উপর চাপানো হয় বলে সম্পূর্ণ সমান অধিকার পেয়েও তাঁদের অধীন হয়ে থাকতে হয়। ঘরকন্নার কাজের বেশিরভাগই অত্যন্ত বিরক্তিকর ও কষ্টকর যা নারীদের কোন উন্নতির কাজে লাগে না। আদর্শ ভোজনালয় ও আদর্শ শিশুরক্ষণাগার মেয়েদের ঘরকন্নার কাজ থেকে মুক্তি দেবে। বিপ্লবের অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এসব রাশিয়ার গড়ে ওঠে এবং লেনিন এসবের মুখ্য দায়িত্ব নারীদের নিতে আহ্বান জানান। শ্রমিকদের মুক্তি যেমন শ্রমিকদের নিজেদের দ্বারাই আসে ঠিক তেমনি নারীদের মুক্তি তাঁদের নিজেদের দ্বারাই আনতে হবে।

জার্মানি সোসালিস্ট দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং কালমার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্বের শীর্ষস্থানীয় প্রদর্শক, জার্মানি সাংসদ তথা রাইখস্ট্যাগের সদস্য অগাস্ট বেবেল বলেছেন- ভবিষ্যতে বাড়িতে   রান্নাঘর সম্পূর্ণভাবেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে যখন খাদ্য প্রস্তুতি কেন্দ্র হবে এবং গৃহস্থালির অনেক জিনিসেরই রক্ষণাবেক্ষণের কাজের বিলুপ্তি ঘটবে। অন্যের সাহায্য ছাড়াই স্নানের ঠান্ডা ও গরম জল পাওয়া যাবে। কেন্দ্রীয় ধোলাই খানায় পোশাক আশাক পরিষ্কার ও শুকানো হবে। গৃহকর্ত্রী ও পরিচারক যারা "গৃহকর্ত্রীর খামখেয়ালের দাস" তাদের উভয়েরই অস্তিত্ব থাকবে না। প্রবৃত্তিগত আকাঙ্ক্ষা পূরণে অন্য ব্যক্তির ক্ষতি বা অসুবিধা সৃষ্টি না করে ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব প্রয়োজন মেটাতে পারেন। অন্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মতো যৌন প্রবৃত্তির সন্তুষ্টি অনেক বেশি ব্যক্তিগত বিষয়। এরজন্য কেউ অন্যের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন এবং অযাচিত বিচারকের বিচারও কাম্য নয়। মিলনবন্ধনে প্রবেশ করেছে এমন দু'জনের পারস্পরিক বোঝাপড়া যদি নষ্ট হয়ে যায়—অসুখী এবং প্রত্যাখ্যাত হয়, তখন নৈতিকতা দাবি করে এ বন্ধন ভেঙে যাওয়া উচিত। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিবাহিত জীবনের সমস্যাগুলি নির্মূল করে দেবে।

কালমার্কসের কনিষ্ঠা কন্যা ইলিনর মার্কস অ্যাভেলিং একজন দক্ষ মঞ্চাভিনেত্রী ছিলেন এবং পিতার প্রভাবে বই পড়তে ভালোবাসতেন। নারী সমস্যা নিয়ে বহু নিবন্ধ রচনা করেছেন। পত্রিকা প্রকাশ, লেখালেখি, সংগঠন গড়ে তোলা ও সংগ্রামের পক্ষে বক্তৃতা দেওয়ার কাজে নিরলসভাবে যুক্ত ছিলেন। পাশাপাশি পিতার অসমাপ্ত কাজগুলি সংগঠন করারও চেষ্টা করেন। তিনি বলেছেন-সংস্কৃতিবান মানুষের কাছেও জনমত বলতে পুরুষের মতটাকেই বুঝায় এবং যা কিছু প্রথাসিদ্ধ তা-ই নৈতিক।

সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে দাস প্রথা থেকে আসে ভূমিদাস প্রথা, এর থেকে মজুরি শ্রম ভিত্তিক ব্যবস্থা এবং শেষে আসবে জনসাধারণের হাতে যৌথ মালিকানা অর্থাৎ কোন দাস

মালিক বা সামন্তপ্রভু বা পুঁজি মালিকের হাতে উৎপাদনের উপকরণ থাকবে না। সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা লোপ পাবে। রাষ্ট্র যন্ত্রেরও বিলুপ্তি ঘটবে। সমাজে সকলের মধ্যে সাম্য থাকবে লিঙ্গ নির্বিশেষে। তখন নারীর আর পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা থাকবে না। যে অর্থনৈতিক কারণ গণিকাবৃত্তির জন্ম দিয়েছিল—তারও বিলুপ্তি ঘটবে। একগামিতা এবং বহুগামিতার মধ্যে সমাজ একগামিতাকেই বেছে নেবে।

সামাজিক শ্রম দানের পর বাকি সময়টা নারীরা শিল্পকলা, বিজ্ঞান, শিক্ষকতা, লেখালেখি বা অন্য যেকোন প্রকার আমোদ উপভোগের জন্য মুক্ত হয়ে যাবে। নারী ও পুরুষ দুটি জীবনের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ও দীর্ঘস্থায়ীভাবে মিলেমিশে যাওয়াই হবে সর্বোচ্চ আদর্শ। উভয়ের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, বুদ্ধিবৃত্তিয় সাদৃশ্য ও জীবনের প্রয়োজনগুলো আয়ত্ত করে নেওয়া হবে লক্ষ্য। ইলিনর আরো বলেছেন — যে দুটি অভিশাপ যা অন্যসব কিছুর সাথে নারী পুরুষের সম্পর্ক ধ্বংস করতে সহায়তা করে ১) পুরুষ ও নারীকে আলাদা প্রজাতির জীব বলে গণ্য করা, ২) সত্যের অনুপস্থিতি—এগুলির সমাপ্তি ঘটবে। অর্থাৎ নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা আইন থাকবে না। পুরুষের যদি উপপত্নী রাখা ঠিক বলে মেনে নেওয়া হয় তবে এ স্বাধীনতা নিশ্চিতভাবে নারীদেরও থাকবে। কোন মিথ্যাচার থাকবে না যা প্রায় ইংরেজ পরিবারকে একটা সংগঠিত ভণ্ডামিতে পরিণত করেছে। একজন পুরুষের একজন নারীতে সংলগ্ন হওয়াই মঙ্গল। উভয়ে উভয়ের হৃদয়ে থাকবে। একে অপরের চোখে দেখতে পাবে তাদের নিজেদেরই প্রতিচ্ছবি।

আলেকজান্দ্রা কোলন তাই (১৮৭৩-১৯৫২) রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বহু ভাষায় সাবলীল, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বক্তা ও লেখিকা রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। ধনী পরিবারে জন্মালেও শ্রমিক শ্রেণির জীবনের প্রকৃত সমস্যাগুলি তাঁর অর্ন্তদৃষ্টি দ্বারা বুঝতে পারঙ্গম ছিলেন। তিনি বলেছেন — বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় নারী পরিবারে দাসী আর বউ বাচ্চাকে সুখে রাখার দায়িত্ব স্বামীর—এ ব্যবস্থা শ্রমিক শ্রেণির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে টুটি টিপে মারার এবং শ্রমজীবী নারী -পুরুষের বৈপ্লবিক চেতনাকে দুর্বল করে দেওয়ার সেরা অস্ত্র। পারিবারিক চিন্তার ভারে শ্রমিক নুইয়ে পড়েন এবং পুঁজির সঙ্গে আপস করতে বাধ্য হন। কারণ সন্তান ক্ষুধার্ত থাকলে বাবা-মা যেকোন শর্তেই রাজি হতে বাধ্য। সম্পত্তির মালিক বা বুর্জোয়ারা শিক্ষাকে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে রূপান্তরিত করে না—এরা গণশিক্ষার বিরুদ্ধে।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় নারীদের দুঃখ, যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা—চরম শিখরে গিয়ে পৌঁছেছে। একজন নারী একাধারে স্ত্রী,মা এবং শ্রমিক। স্বামীর মতো একই সময়ে তাঁকে কারখানায় বা অন্যত্র কাজে যেতে হয়। তার উপর ঘরকন্না ও সন্তান মানুষ করার সময় খুঁজে বের করে নিতে হয়। পুঁজিবাদ নারীর কাঁধে পর্বতপ্রমাণ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে—মজুরি শ্রমিকে পরিণত হয়েছে, অথচ গৃহকর্ত্রী বা মা হিসেবে তাঁর দায়ভার মোটেই লাঘব করেনি। এই তিন দায়ভারে

নারী কোনরকমে বেঁচে আছে। তাঁর মুখ সর্বদাই কান্নায় ভেজা থাকে। নারীদের জীবন কখনোই সহজ ছিল না, তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অবস্থা চরমে গিয়ে ঠেকেছে। পুঁজিবাদী সমাজের কালোছায়া সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার শ্রমজীবী মানুষের দৈহিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেছে। আলেকজান্দ্রা কোলনতাই ১৯২১ সালে "দেহ ব্যবসা এবং সংগ্রামের রূপরেখা" নামক বলিষ্ঠ রচনাটি লেখেন। এতে তিনি বলেছেন দেহ ব্যবসার কারণ অর্থনৈতিক। বহু শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার শিক্ষায় দৃঢ় হয়েছে যে যৌন সুবিধা দেওয়ার বিনিময়েই নারীরা বৈষয়িক সুযোগ সুবিধা আশা করতে পারে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে। না পেলেই সমস্যার সূত্রপাত হয়। পুঁজি কর্তৃক যখন শ্রম শোষিত হয়, একজন নারীর মজুরি যখন তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট হয় না , তখন দেহ ব্যবসা একটা সম্ভাব্য গৌণ জীবিকা হয়ে ওঠে। অল্পবয়সী মেয়েদের স্বল্প মজুরির কাজ, গৃহহীনতা, চরম দারিদ্র্য, ছোট ভাই-বোনদের দেখাশুনার দায়িত্ব ব্যাপকহারে মেয়েদের দেহ ব্যবসার দিকে ঠেলে দেয়।

রাশিয়ায় শ্রমিক বিপ্লব ধনতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে— যার ফলে পুরুষের উপর নারীর আগেকার নির্ভরতাকে জোর ধাক্কা দিয়েছে। একজন নারী নিজের ভরণপোষণ বিবাহের মধ্য দিয়ে অর্জন করবেন না— অর্জন করবেন উৎপাদনে তিনি যে ভূমিকা পালন করে মানুষের সম্পদে তাঁর যে অবদান— তার মধ্য দিয়ে।

আলেকজান্দ্রা কোলনতাই আরো বলেছেন— একজন দেহ উপজীবিনী এবং একজন স্বামীর দ্বারা রক্ষিত আইনি স্ত্রীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই যদি তিনি কোন উৎপাদনশীল কাজে অংশগ্রহণ না করেন। শ্রমজীবী যৌথতা দেহ ব্যবসাকে নিন্দা করে কারণ— ১) তাঁর এ দেহদান সমাজের কোন প্রয়োজনে আসে না। একজন আইনি স্ত্রী যদি তাঁর স্বামীর কাছে দেহ বিক্রি করে শ্রমকে এড়িয়ে যান— তবে তাঁকে দেহ উপজীবিনীদের মতো শ্রমে বাধ্য করা উচিত। ২) জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিতভাবে দেহব্যবসার বিরুদ্ধে জোর প্রচার সংগঠন দরকার। কারণ দেহ ব্যবসা যৌন রোগ ছড়ায়। ৩) দেহ ব্যবসা নারী ও পুরুষের সংহতি এবং কমরেডশীপ ধ্বংস করে। নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার বদলে অসাম্যকে শক্তিশালী করে।

রোজা লুক্সেমবার্গ ১৮৭২ সালের ৫ই মার্চ পোলান্ডে একটি ইহুদি পরিবারে জন্মান। ১৮ বৎসর বয়সে বিপ্লবী কার্যকলাপে কারাবন্দি হওয়ার থেকে পলায়ন করে জুরিখ, সুইজারল্যান্ড ও বার্লিনে আস্তানা গড়েন। বার্লিনে তিনি জার্মান সোসাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টিতে যোগদান করেন। পরে তিনি রাশিয়ায় বলশেভিক পার্টির পাশে দাঁড়ান এবং বৈপ্লবিক কার্যকারণে কারাবন্দি হন।

তিনি অসাধারণ মেধা এবং অধ্যবসায় বলে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন— 'সোসাল ডেমোক্রেসি এবং পার্লামেন্টীয়বাদ', 'গণধর্মঘট', পুঁজির পুঞ্জিভবন', পরে জার্মান

সোসাল ডেমোক্রেটিক দল ত্যাগ করে 'স্পার্টাকাশ লিগ' গঠনে সহায়তা করেন। জার্মান সৈনিকদের সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরার আহ্বান জানালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কারাবন্দি অবস্থায় তিনি তাত্ত্বিক রচনায় মগ্ন থাকেন। ১৯১৮ সালে কারাবাস থেকে মুক্ত হয়ে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। ১৯১৯ সালের ১৫ই জানুয়ারি রোজাকে গ্রেপ্তারের পর গুলি করে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়।

তিনি 'প্রলেতারিয়েত নারী' প্রবন্ধে বলেছেন জনসাধারণের মধ্যে নারীরা সর্বদাই কঠোর পরিশ্রম করেছে। আদিম সমাজে ভারি জিনিসপত্র বহন, খাদ্য সংগ্রহ, শস্য বুনা, চাষ করা, মাটির বাসনপত্র বানানো, দাসী হিসেবে প্রভুর সেবা করা, সন্তানকে স্তন্য পান করানো—এসব। ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রতিষ্ঠার সময় থেকে জনসাধারণের মধ্যে নারীদের অধিকাংশই সামাজিক উৎপাদনের বিশাল কর্মশালা থেকে আলাদা হয়ে কাজ করত। পরিবারের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বৃহত্তর সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পুঁজিতন্ত্রই প্রথম নারীকে পরিবাব থেকে টেনে বের করে সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণ করায়।

বুর্জোয়া নারী হল সমাজেব পরজীবী। তার কাজ হল শোষণ থেকে প্রাপ্ত ফল ভোগের জন্য ভাগ বসানো। পেটি বুর্জোয়া নারী পরিবারের একজন কাজেব ঘোড়া। একজন আধুনিক প্রলেতারীয নারীই প্রথম একজন মানুষ ৰূপে গণ্য হযেছে। বুর্জোয়া নারীর ঘরটাই তাঁর পৃথিবী। বুর্জোয়া নারীর রাজনৈতিক অধিকারের জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। কারণ সমাজে তাঁর অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে ভূমিকা নেই। বুর্জোয়া নারীদের থেকে সাম্যবাদের কথা উঠলে—তা বাক্‌চাতুর্যের শামিল—অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর ছদ্ম বিরোধ প্রকাশ পায়।

প্রলেতারীয় নারীরা পুরুষদের মতো অর্থনৈতিক ক্রিয়া কর্মে অংশগ্রহণ করে এবং একইভাবে পুঁজির জন্য দাসত্ব করে। সুতরাং নারীর রাজনৈতিক দাবিসমূহ সমাজের গভীরে ছড়িয়ে থাকে, যা শোষক শ্রেণি থেকে শোষিত শ্রেণিকে পৃথক করে, নারী এবং পুরুষের মধ্যে বিরুদ্ধে নয়, পুঁজি এবং শ্রমের বিরোধের মধ্য দিয়ে। প্রলেতারীয় নারী সক্রিয়তার মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবনে শক্ত ভিত্তি লাভ করবে। রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপনের দ্বারাই অধিকাবের ভিত্তি অর্জন করবে। প্রলেতারীয় নারী গরিবদের মধ্যে গরিবতম, ক্ষমতাহীনদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাহীন। তিনি আরো বলেছেন, পুঁজিপতিদের আধিপত্যের বীভৎসতা থেকে মুক্তির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে নারীদের। সমাজতন্ত্রে নারীদের সে সুযোগ রয়েছে। নারীদের জন্য সমাজতন্ত্র একটা নির্দিষ্ট স্থান করেছে।

ক্লারা জেটকিন জার্মান আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের এক অগ্রণী সৈনিক। নারী শ্রমিক আন্দোলনের একজন অগ্রগন্যা। তিনি বহু শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তুলেছেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯১৮ সালে তিনি লুক্সেমবার্গ ও অন্যান্য কমরেডদের নিয়ে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। ১৯২০ সাল থেকে তিনি রেইখস্ট্যাগ এ প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। আন্তর্জাতিক

নারীদের সম্পাদক মণ্ডলীর তিনি সম্পাদিকা হন ১৯২১ সাল থেকে এবং ঐ বৎসর থেকে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী কমিটির সদস্যা হন। ১৯২৪ সাল থেকে রাশিয়ায় থাকতে শুরু করেন তাঁর কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য এবং রাশিয়াতেই তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩৩ সালে।

"প্রলেতারীয় নারীর সাথে যুক্তভাবেই শুধু সমাজতন্ত্র জয়ী হবে"— রচনায় তিনি বলেছেন যে নারীর সামাজিক দমন ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টির সময় থেকে। পরিবারে স্বামীর সম্পত্তিবান হওয়া এবং স্ত্রীর সম্পত্তিহীন হওয়ার বৈপরীত্য নারীর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা সামাজিক বৈধতার ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এঙ্গেলস্ বলেছেন— "পরিবারের অভ্যন্তরে স্বামী বুর্জোয়ার ভূমিকা এবং স্ত্রী সর্বহারার ভূমিকা পালন করে।" রেনেসাঁর পর্বে আধুনিক ব্যক্তিসত্তার ঝঞ্ঝাময় এবং বলশালী জাগরণ হয় যা সর্বাধিক বৈচিত্র্যময় পূর্ণাঙ্গ বিকাশে সক্ষম ছিল। সে সময়ে সমাজ দু'ধরনের কাজে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের মুখোমুখি হয়- ভাল এবং খারাপ- যাঁরা ধর্মীয় এবং নৈতিক দু'ধরনের অনুশাসনকে অবজ্ঞা করে, স্বর্গ এবং নরক দুটোকেই হেয় জ্ঞান করে। সে সময়ে সামাজিক, শৈল্পিক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে নারীরা আবিষ্কৃত হয়, তবে নারী আন্দোলনের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রলেতারীয় নারীরা আর্থিক স্বাধীনতা পেয়ছে, কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে, স্ত্রী বা নারী হিসেবে, মা হিসেবে— ব্যক্তিসত্তাকে বিকশিত করার সুযোগ নেই। স্ত্রী বা মা হিসেবে কর্তব্য পালন করে যা পায় তা হল টেবিল থেকে ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট টুকরোর মতো। আগস্ট বেবেলের "নারী এবং সমাজতন্ত্র"-বইটির মূল্যায়ন ক্লারা জেটকিন অন্যমাত্রায় করেছেন । তিনি বলেছেন এটা শুধু একটা বই নয় এর থেকে অনেক কিছু বেশি। কারণ এ বইয়ে সর্বপ্রথম নারী সমস্যা এবং ঐতিহাসিক বিকাশের সম্পর্ককে চিহ্নিত করেছেন। এ বই থেকেই সর্বপ্রথম আবেদন ধ্বনিত হয়েছিল যে, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব যদি নারীদের আমরা সহযোদ্ধায় রাজি করাতে পারি। একজন নারী হিসেবে নয়, একজন পার্টি কমরেড হিসেবে স্বীকৃতি দানের মধ্য দিয়ে।

মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, নারীদের প্রকৃত স্বাধীনতা কেবলমাত্র সাম্যবাদের দ্বারাই লাভ হবে। নারীদের বাদ দিয়ে কোন সত্যিকারের গণ -আন্দোলন হয় না।

১৯৯১ সালে সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার পতনে রাশিয়সহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি পেছন দিকে হাঁটতে শুরু করে। ফলে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি ও চিন্তা চেতনা নতুন উদ্যমে মাথা চারা দিতে থাকে এবং নারীর অবস্থান সম্পর্কে আবার রক্ষণশীল ও বুর্জোয়া ভাবধারা ফিরে আসে।

আমেরিকা তার সহযোগী দেশগুলির সহায়তায় যেভাবে বিশ্বে একেরপর এক বর্বরতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে-ইতিহাস তা কোনদিন ক্ষমা করবে না। 'বিশ্বায়ন' এর নামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যেভাবে বিভিন্ন ছোট ও দুর্বল দেশগুলির উপর আধিপত্য বিস্তারের জাল ছড়াচ্ছে

তার নিন্দার ভাষা নেই।

তবে শ্রেণি সচেতন মার্কসবাদী ও সাম্যবাদীগণ চুপ করে বসে নেই।

তাঁরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখছেন কোথায় দুর্বলতা রয়েছে মার্কসবাদীদের তত্ত্বে ও প্রয়োগে। বিশ্বায়নের নামে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির আধিপত্য বিস্তারের কৌশলে মার্কসবাদকে বিকশিত করার চেষ্টায় সদা নিয়োজিত রয়েছেন সমাজতন্ত্রীরা। সাথে সাথে নারীমুক্তির বিষয়টি সমান গুরুত্ব পেলে সমাজতন্ত্রের পথ সুগম হবে এবং পুরো আকাশ মুক্ত হবে।

বিশ্বায়নের ঢেউয়ে অনুন্নত দেশগুলিতে নানা সংস্কার ও কুসংস্কারের প্রভাবে নারীরা নানাভাবে চরম নির্যাতিত হচ্ছেন। পাশাপাশি নারীকে নগ্নভাবে পণ্য করে তুলতে চলছে সুচতুর প্রয়াস। নারীরা সচেতন বা অবচেতনভাবে তাঁদের পণ্য হয়ে ওঠার অবস্থানটা মেনে নিচ্ছেন।

মেয়েদের বিভিন্ন অধিকার আদায়ে আগে তাঁদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া দরকার - এ কথাটা প্রগতিশীল চিন্তা নায়কগণ বুঝেছিলেন। আর এভাবেই শিক্ষার অধিকার থেকে সমান অধিকারের দিকে যাত্রা শুরু। শিক্ষার অধিকার থেকে ভোটের আন্দোলন-বুর্জোয়া নারীবাদী ভাবনা থেকে সমাজতন্ত্রী ভাবনা পেরিয়ে আজকের স্বতন্ত্র নারীবাদী ভাবনায় পৌঁছানোর ইতিহাস মানবসভ্যতার সমতার দিকে যাত্রার ইতিহাস।

জার্মানির শ্রমিক সংগঠন, ফরাসি বিপ্লব, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন-এ সবের মধ্যে নারীদের অধিকারের কথা উচ্চারিত হয়েছে। নারীদের জন্য আলাদা ক্লাব, আলাদা সংগঠন দাবির মাধ্যমে পূরণ হয়েছে। নারী নেত্রীরা সৃষ্টি হয়েছেন। ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে জার্মানির সমাজতন্ত্রী নারীরা নারী শ্রমিকদের কাজের শর্তের উন্নতি এবং রাজনৈতিক অধিকারের দাবি তুললেন। কোপেন হেগেনে ১৯১০ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের একটি কংগ্রেসে ৮ মার্চকে 'নারী দিবস' হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর থেকে জার্মানিতে এবং রাশিয়ায় নারীদের অধিকারের আন্দেলন জোরদার হয়। প্রতিবছর এদিনটি নানা দেশের সমাজতন্ত্রী মেয়েরা অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করে আসছে।

১৯১৮ সালে ইংরেজ ত্রিশোর্ধ্ব নারীরা ভোটের অধিকার পেলেন, কিন্তু পুরুষদের ২১ বৎসর পূর্ণ হলেই ভোটের অধিকার ছিল। ১৯২৮ সালে মেয়েরা ২১বছরে ভোট দিতে সক্ষম হলেন। রাশিয়ায় ১৯১৭ সালেই অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েরা ভোটাধিকার পেয়েছেন। ভারতীয় সংবিধানে সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার রয়েছে সূচনাপর্ব থেকেই।

বেজিং সম্মেলনের পাশাপাশি চিনের হুয়াইরো শহরে অনুষ্ঠিত হয় বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্মেলন। এটি ছিল তৃণমূল স্তরের স্বেচ্ছাসেবীদের। হুয়াইরো শহরে ঘোষণা দেওয়া

হয় ২০০৫ সালের মধ্যে পৃথিবী থেকে পুরোপুলি লিঙ্গ বৈষম্য দুর করতে হবে। অবস্থার উন্নতি হয়েছে কিনা খতিয়ে দেখার জন্য নারী বিষয়ক কমিশনের হাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

১৯৯২ সালে ভারতে জাতীয় মহিলা কমিশন গঠিত হয়। ত্রিপুরায় আইন তৈরি হয় ১৯৯৩ সালে এবং কমিশন গঠিত হয় ১৯৯৪ সালে। মহিলা কমিশনের বিশেষ কোন ক্ষমতা নেই। আমলাতান্ত্রিক পরিকাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ। কমিশনের সুপারিশ সরকার পালন করতে বাধ্য নয়। আর্থিক অনুদানের জন্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের মুখাপেক্ষি হয়ে থাকতে হয়। তবু মহিলা কমিশন মহিলাদের প্রতি বৈষম্য, হিংসা ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার এক হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

জাতীয়স্তরে ভারতে ২০০১ সালটি 'মহিলা ক্ষমতায়ন বর্ষ' রূপে চিহ্নিত হয়েছিল। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের দেশের অন্যান্য অংশের সাথে ত্রিপুরায়ও এই কর্মসূচি যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে 'শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ দপ্তর' থেকে 'জাগরী'র বিশেষ সংখ্যা বের হয় ২০০২ সালে। সেই সঙ্গে "ভারতীয় সংবিধান ও অন্যান্য আইনে মহিলাদের স্থান" নামে একটি পুস্তিকা ত্রিপুরা আইন সেবা কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রকাশিত হয়।

২০০৫ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মহিলাদের ক্ষমতায়নে রাজ্য সরকার ২৮ দফা কর্ম পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এই কর্ম পরিকল্পনা রূপায়ণের মধ্য দিয়ে মহিলাদের উন্নয়নে সুফল পাওয়া যাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বিবাহ নিবন্ধীকরণ আইন কার্যকর হচ্ছে।

বিশ শতকের শেষ দশকে রাষ্ট্র সংঘের সমীক্ষা অনুযায়ী পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এরা পৃথিবীর মোট শ্রম প্রকরণের দুই তৃতীয়াংশ পরিশ্রম করে, পৃথিবীর উপার্জনের এক দশমাংস ভোগ করে এবং পৃথিবীর সম্পদের এক শতাংশের কম অধিকারিণী।

রবীন্দ্রনাথের যথার্থ বলেছন—
"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার।"

বিংশ শতাব্দী থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারীরা নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ক্ষমতার বৃত্তে প্রবেশ করতে শুরু করেছেন। অবশ্য বংশ পরম্পরায় রাজ সিংহাসনে আসীন হবার নজীর পূর্বেও ছিল। ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্র এর বিশিষ্ট উদাহরণ। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতি সিরিমাভো বন্দরনায়েক, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ এবং খালেদা জিয়া, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো, ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী প্রতিভা দেবী সিং পাতিল, আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি ক্রিস্টিনা কির্চনার- এঁদের নাম নারী ক্ষমতায়নেব আকাশে জ্বলজ্বল করছে।

ভারতের প্রথম নির্বাচিত মহিলা রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী প্রতিভা দেবী সিং পাতিল ২৫ শে

জুলাই ২০০৭ সালে শপথ গ্রহণ করেন। ভারতের স্বাধীনতার ষাট বছর পূর্তিতে ভারত একজন মহিলা রাষ্ট্রপতি উপহার হিসেবেই পেল। তিনি চেন্নাই এ মাদার টেরেজা মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দান কালে বলেন—মহিলা ক্ষমতায়ান যথেষ্ট নয়। মহিলা ক্ষমতায়ন বিকাশের জন্য সামাজিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগ প্রয়োজন। মহিলাদের নিরাপত্তা রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানান। লিঙ্গ বৈষম্য দুরীকরণে মহিলাদের সম্পর্কে সমাজের মৌলিক ধারণার পরিবর্তন প্রয়োজন। স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর দ্বারা গ্রামীণ মহিলাদের আর্থিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। তিনি জোর দিয়ে কন্যা ভ্রূণ হত্যার নিন্দা করে বলেন যে কন্যা সন্তান সমাজের উপহার। তিনি আরো বলেন শিক্ষার হার বাড়লে বৈষম্য কমবে। স্কুলের ছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপ, ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা এবং বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহিলাগণ সফলতার চিহ্ন রাখছেন— মহাকাশ, হিমালয় যাত্রা, সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ, প্রশাসন, কূটনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, বাণিজ্য, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। তবু মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ বাড়ায় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির অষ্টম সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত হলো ২ থেকে ৪ নভেম্বর ২০০৭ ইং। সম্মেলনে সারা দেশ থেকে প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। সম্মেলনে মহিলা প্রতিনিধিগণ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন সমস্যা ও নিপীড়নের উল্লেখ করেন। নারী পাচার, কন্যা ভ্রূণ হত্যা, পণ প্রথা, দলিত এবং সংখ্যালঘু মহিলাদের উপর ফতুয়া, যৌন নির্যাতন, ভিন্ন জাতি ধর্মে বিয়েতে বাঁধা ইত্যাদি হরদম হচ্ছে। ওড়িশা, ঝাড়খন্ড এ মহিলাদের জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে কাজ পাওয়া কষ্টকর। সর্বত্র এমন মনোভাব 'অওরত আবার কাজ করবে কিরে'। কর্ণাটকের বিদর জেলায় রীতিমতো লড়াই করে মহিলাদের জব কার্ড বের করা হয়েছে। ত্রিপুরা এবং কেরালায় এ প্রকল্পে ভাল সংখ্যায় মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করা গেছে। বিহার, মহারাষ্ট্র উত্তরাখণ্ডে রেশনে গ্রামের গরিব পরিবারগুলি কিছুই পায়না। উত্তর প্রদেশে দলিত মহিলাগণ সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এরমধ্যে চারজন দলিত অন্তঃসত্ত্বা মহিলা অচ্ছুৎ বিচারে হাসপাতালের বাইরে প্রসবকালীন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। হরিয়ানায় চারমাসে ১০৩টি কেস নথিভুক্ত হয়েছে ভিন্ন জাত বা ধর্মে বা একই গোত্রে বিয়ে করার অপরাধে দম্পতির উপর হামলা, এমনকি খুন পর্যন্ত করা হয়। পুলিশ প্রশাসন এসবে কাপ্ট পঞ্চায়েতকে সমর্থন করে।

সুভাষিনী আলি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন ১৯৯৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৪০ লক্ষ কন্যা ভ্রূণ হত্যা করা হয়েছে। ভুবনেশ্বরের কাছ নরাগড়ে পলিথিনের প্যাকেটে ৫০টি কন্যা ভ্রূণ পাওয়া গেছে এবং ব্যাঙ্গালোরোতে ২২টি। কন্যা ভ্রূণ হত্যা রোধে আইন তৈরি হলেও তা প্রয়োগ হচ্ছে না। এসব অনৈতিক ও বেআইনি কাজে লিপ্ত ডাক্তারগণ ধরা পড়েও রেহাই পেয়ে যান। বহু রাজ্যে সরকার নোটিফিকেশন করে আইনটি কার্যকর করেনি এখন পর্যন্ত। অনেকে বিশ্বাস করেন নারী পুরুষের অনুপাত কমে গেলে নারীর চাহিদা বাড়বে ও মর্যাদা

বাড়বে—এটা হল সম্পূর্ণ মনগড়া কথা। এর মধ্যে কোন বিজ্ঞান সম্মত যুক্তি নেই। সমাজে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য যেকোন মুল্যে নারী পুরুষের অনুপাত সমান রাখা দরকার।

রাজ্য সভার সদস্যা ও সিপিএম পলিট ব্যুরোর সদস্যা বৃন্দা কারাত বলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধির জন্য মহিলা আন্দোলনের বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতে একদিনে ৩০ জন বিলিওনিয়ার তৈরি হচ্ছে অপরদিকে ৭০কোটি মানুষ দৈনিক ২০ টাকার কম আয় নিয়ে বেঁচে আছেন। যে পরিবারের আয় ২০ টাকার কম সে পরিবারে মহিলাদের অধিকার অর্জিত হবে কি করে। ধনী-দরিদ্র বৈষম্য যত বাড়ছে মহিলারা তত বেশি বিপন্ন হচ্ছেন। তিনি মহিলাদের স্বার্থে আইনসভায় মহিলাদের আসন সংরক্ষণ বিল পাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সর্বভারতীয় অষ্টম মহিলা সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি প্রবাদ প্রতিম কম্যুনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু নারীদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। কারণ স্বাধীনতার ৬০ বছরেও লিঙ্গ বৈষম্য দূর হয়নি। সংবিধানে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তা বাস্তবায়িত হয়নি। শুধু মহিলা হওযার কারণে দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাকে বৈষম্যের শিকার করে দেশের উন্নতি হতে পারেনা।

রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, গান্ধীজি- প্রভৃতি মনিষীগণ নারী জাতির দুঃখ লাঞ্ছনার কথা বুঝতে পেরেছিলেন - তাই এরা নারী জাতির উন্নতির কথা বলেছিলেন। নারীজাতিকে সামনে এগিয়ে আনতে না পারলে সমগ্র সমাজ পিছিয়ে থাকবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ নারীরা শিক্ষা সংস্কৃতির আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে ঘরকন্নার কাজ করে এক ঘেয়ে জীবনপাত করে। আজীবন পুরুষদের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে- সুতরাং পুরুষদের সমান অধিকার ভোগের প্রশ্নই আসেনা। শিক্ষায় ও স্বাবলম্বনে আশু এগিয়ে যাওয়া দরকার সকল নারীদের। নারী আন্দোলন সমগ্র শোষিত বঞ্চিত পিছিয়ে পড়া মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনেরই অঙ্গ। সুতরাং নারী আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে চলবে না।

সমগ্র স্তরের পিছিয়ে পড়া মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের আন্দোলন বামশাসিত রাজ্যগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরালাতে অনেকটা এগিয়েছে। কারণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এ আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। শিক্ষায় চেতনা আনে— শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে সর্বাগ্রে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার বরাবর উদাসীন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির যাট বছর অতিক্রান্ত হবার পর এবারের বাজেটে (২০০৭-০৮)শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। ত্রিপুরায় অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা। এটা পিছিয়ে পড়াদের জন্য বিরাট সহায়।

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ডঃ অমর্ত্য সেন গ্রামীণ ও গরিব অংশের মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উপর গুরত্ব আরোপ করেছেন। সে অনুযায়ী ভারতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে নোবেল বিজয়ী ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস গ্রামীণ মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য অণু ঋণের ব্যবস্থা চালু করে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। অভূতপূর্ব ফল পাওয়া গেছে। ত্রিপুরায় স্ব-সহায়ক দল গঠনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে বিশেষ করে মহিলাদের স্বাবলম্বন করে তোলার মহৎ চেষ্টা হচ্ছে—নিশ্চয়ই সুফল আসবে।

রাশিয়া, ইংল্যান্ড ও ভারতে ভোটাধিকারের বয়স আঠারো (১৮)। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী আমেরিকায় মেয়েরা ভোটাধিকার পেয়েছে ১৯২০ খ্রিঃ। আর গণতন্ত্রের গবেষণাগার নামে পরিচিত সুইজারল্যান্ডে মেয়েদের সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে ১৯৭১ খ্রিঃ। সাবেকী গণতান্ত্রিক ভাবধারা অনুসারে নারী সমাজকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করাকে গণতন্ত্র বিরোধী বলে মনে করতেন না। অ্যারিস্টটল পুরুষদের মধ্যেই রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কার্যাবলী সীমিতকরণের পক্ষে ছিলেন। ব্লুন্টস্‌লীও নারী জাতির ভোটাধিকারের বিপক্ষে ছিলেন।

এখনো মেয়েদের প্রতি বৈষম্য সর্বত্র। বড়জোর তার চেহারা পাল্টেছে। ঘরে-বাইরে অসাম্য, প্রতিমুহূর্তে হিংসার বলি হচ্ছেন মেয়েরা। ষাটের দশকে পশ্চিমি মেয়েরা পথে নেমেছ, সঙ্গে সঙ্গে শামিল হয়েছ অনুন্নত দেশের মেয়েরা।

১৯৭৫ থেকে ১৯৮৫- এ দশ বছরকে রাষ্ট্রপুঞ্জ ঘোষণা করেছিল নারী দশক হিসাবে। আন্তর্জাতিক নারী দশকের শুরুতে মধ্যে এবং শেষে তিন তিনটি আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে, ১৯৮০ সালে কোপেন হেগেনে এবং ১৯৮৫ সালে নাইরোবীতে। এই সম্মেলনগুলিতে পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে নারী প্রতিনিধিগণ এসে যোগদান করেন এবং মনের ভাব বিনিময় হয় এবং গড়ে উঠে শক্তিশালী এবং সক্রিয় জোট। সম্মেলনগুলির অভিজ্ঞতা থেকে একথা পরিষ্কার হয় যে শুধু এশিয়া বা আফ্রিকার দেশের নারীগণই নির্যাতিতা লাঞ্ছিতা বা অত্যাচারিতা নন—গোটা পশ্চিমি দুনিয়াতেও চলছে অব্যাহতভাবে নারী নির্যাতন। শুধু বাইরে নয় পরিবারের ভেতরে যে নির্যাতন হয় তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়। গার্হস্থ্য হিংসা ও নির্যাতনের প্রেক্ষিতে প্রচলিত আইন, তার বিধান ও প্রয়োগের দিকে নতুনভাবে চিন্তা করার জন্য রাষ্ট্রগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। আন্তর্জাতিক নারী দশকে রাষ্ট্রসংঘ নারী অধিকার বিষয়ে কতকগুলি সুস্পষ্ট সুপারিশ করে ঃ

১। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে মেয়েদের অংশীদার করতে হবে।

২। বৈষম্যমুলক সমস্ত আইন বিলোপ করতে হবে।

৩। নারী বিষয়ক মন্ত্রক ও আধিকারিক পদের সৃষ্টি হবে সরকারি স্তরে।

১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় গৃহীত হয় নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপের সনদ - Convention on the all forms of Discrimination

against women - এই সনদে সইদানকারী সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে আহ্বান জানানো হয় নারী নির্যাতনের উৎপত্তি যে সমস্ত বৈষম্য থেকে তা নিবারণের জন্য জাতীয় স্তরে আইন তৈরি করতে।

এই সনদে সুপারিশ ছিল ঃ

১। সামাজিক - রাজনৈতিক সব ধরনের সংগঠনের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে সমতা বিরোধী ঐতিহ্যকে বদলানোর জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিতে।

২। সব রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বৈষম্য দুর করে প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করতে।

৩। সমস্ত সইদানকারী রাষ্ট্র রাষ্ট্রসংঘের নিকট মেয়েদের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠাতে বাধ্য থাকবে।

এই সনদে ভারতসহ ২৫৪টি দেশ সই করে। ১লা মার্চ ১৯৮০ সালে ভারত সই করে। সকল ক্ষেত্রে সমতার ধারণা বাস্তবায়িত করতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ইত্যাদির ক্ষেত্রে মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ নির্দেশ করার লক্ষ্যে কতকগুলি সুপারিশ করা হয়েছে ঃ-

১। শিক্ষায় ছেলে ও মেয়েদের সমান অধিকারের ব্যবস্থা করা।

২। রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরে মেয়েদের সমানাধিকার কার্যকর কবা।

৩। কাজে নিয়োগ ও বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা।

৪। বিয়ে ও মাতৃত্বের ক্ষেত্রে কাজের নিরাপত্তাব ব্যবস্থা করা।

কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে হয়েছিল ১৯৮৫ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। সেখানে গৃহীত হয় Forward Looking strategies or FLS.এর মাধ্যমে নারীর অধিকারকে আন্তর্জাতিক মানব অধিকার আইনের অর্ন্তভুক্ত করা হয়। এই লক্ষ্যে ১৯৯১ সালের ২৫ নভেম্বর চিহ্নিত হয় 'নারী নির্যাতন বিরোধী দিবস' এবং এই পক্ষকাল শেষ হয় ১০ই ডিসেম্বর বিশ্বমানব অধিকার দিবসে।

১৯৯৫ সালে বেজিং-এ অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন —৩০ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই সম্মেলনে 'নারী অধিকার ও মানব অধিকার' ঘোষণা দেওযা হয়। অর্থাৎ নারীর অধিকার মানব অধিকারের স্বীকৃতি পেল। প্রধান দাবিগুলি হল ঃ

১। আইনে নারীর সমান অধিকারের স্বীকৃতি।

২। নারীর প্রজনন সংক্রান্ত অধিকার।

৩। নারীর অর্থনৈতিক অধিকার।

৪। নারী বিরোধী হিংসার অবসান।

দৈনিক আরোহণ— শুক্রবাব-সোমবার, ১৪ই, ১৭ মার্চ, ২০০৮ ইং

নারীর ভাগ্য পুনরুদ্ধারে আন্দোলন ঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পটভূমি

ভারতে সর্বজনীন স্ত্রী শিক্ষার পরিসর একেবারে সংকোচিত হয়ে পড়েছিল। কারণ মেয়েরো চার দেওয়ালের ভেতর বন্দি হয় সামাজিক নানা অনুশাসনের কুপ্রভাবে। সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েদের বাড়িতে পড়াশোনা শেখানো হত । জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বৌ-ঝিদের বিদ্যার্চ্চার ব্যবস্থা চিল। উনবিংশ শতকে নবজাগরণের সাথে সাথে শিক্ষার ব্যাপারে অনেক মনীষী চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করেন। পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভগিনী নিবেদিতা, ডেভিড হেয়ার, বেথুন তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থাপনা শুরু হয়। ভারতে নবজাগরণের পুরোধা পুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁকে আধুনিক ভারতের জনক বলা হয়। 'সতীদাহ প্রথা' যে হিন্দু শাস্ত্র বিরোধী তা তিনি শাস্ত্র ঘেঁটে প্রমাণ করেন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক 'সতীদাহ প্রথা' আইন করে বন্ধ করেন। 'বাল্য বিবাহ' ও 'বহু বিবাহ' রোধ করা এবং বিধবা ও অবিবাহিত মহিলাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের জন্য তিনিই প্রথম আন্দোলন শুরু করেন। ১৮২৮ খ্রিঃ তিনি 'ব্রাহ্মসভা' স্থাপন করেন।

তারপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব ও কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম আন্দোলনকে পরিচালনা করেন। মহারাষ্ট্রে 'প্রার্থনা সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৭ খ্রিঃ। এর প্রাণ পুরুষ ছিলেন বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে। তাঁর উদ্যোগে ১৮৬১ খ্রিঃ বিধবা বিবাহ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাল্যবিধবাদের স্বার্থ রক্ষা ও শিক্ষা বিস্তারে তিনি নানাভাবে সচেষ্ট ছিলেন। স্ত্রী শিক্ষার জন্য পুনাতে তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর উদ্যোগেই 'ডেকান এডুকেশন সোসাইটি' স্থাপিত হয় ১৮৮৪ খ্রিঃ। এই সংস্থার উদ্যোগে পুনাতে ফাগুসন কলেজ ও উইলিংডন কলেজ স্থাপিত হয় সরকারি সাহায্য ছাড়া।

পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন শিক্ষায় নারীজাতি পিছিয়ে থাকলে সমাজও পিছিয়ে পড়বে। ব্রিটিশ সরকারের অনাগ্রহ লক্ষ্য করে তিনি নিজেই অনেকগুলি মডেল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ কাজে তিনি রামগোপাল ঘোষ ও রাধাকান্ত দেবের সমর্থন পান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ নামে পরিচিত। ১৮৪০ খ্রিঃ বেথুন সাহেব হিন্দু ফিমেল স্কুল স্থাপন করেন।

নির্যাতিত ভারতীয় নারীদের দুর্দশা মোচনে তার চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। নারীজাতির

কল্যাণে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বিধবা বিবাহের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তিনি হিন্দুশাস্ত্র ঘেঁটে 'পরাশর সংহিতা' থেকে প্রমাণ দেখিয়ে দেন যে বিধবাবিবাহ হিন্দু শাস্ত্রে বৈধ। তাঁর আন্দোলনের ফলে বাংলা, বোম্বাই, নাগপুর, মাদ্রাজ প্রভৃতি নানা জায়গা থেকে বিধবা বিবাহের জন্য আইন তৈরি করার আবেদন সরকারের কাছে আসতে থাকে। অবশেষে ১৮৫৬ খ্রিঃ বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত আইন ব্রিটিশ সরকার পাশ করে। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ পুত্রের সঙ্গে বিধবার বিয়ে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ রোধে তিনি নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন। অন্ধ্র প্রদেশের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের বীর সন্তান বীরসালিঙ্গম্ নারী শিক্ষার এক বলিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। ১৮৭৪ সালে দোয়ালেশ্বরমে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ ভারতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাল্য বিবাহ ও "কন্যাশুল্কম্" (কন্যা ক্রয় করার রীতি) মারাত্মক সামাজিক ব্যাধির রূপ নিয়েছিল। বীরসালিঙ্গম্ এসব সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন সংঘটিত করেন। এ কাজে তিনি 'রাজামুন্দ্রী সমাজ সংস্কার সমিতি' গঠন করেন। তাতে আন্দোলন আরো ফলপ্রসূ হয়।

এভাবে ভারতের নানা প্রান্তে মেয়েদের শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ ও বিধবা বিবাহ প্রচলনের আন্দোলনের ঢেউ গিয়ে আছড়ে পড়তে থাকে। ঘোর দুর্দিনে কিছুটা আলোর রশ্মি প্রবেশ করেছে। ভারতের স্বাধীন সংবিধানে সাম্যনীতি মানা হয়েছে। কিন্তু সামাজিক ভাবে সাম্য এখনও বহুদূরে। আইনে মেয়েদের বিয়ের বয়স ধরা হয়েছে ১৮ আর ছেলেদের ২১ কিন্তু আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে প্রতিনিয়তই বালিকা ও কিশোরীদের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

মেয়েদের বিভিন্ন অধিকার আদায়ে আগে তাদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া দরকার-এ কথাটা প্রগতিশীল চিন্তা নায়কগণ বুঝে ছিলেন। কিন্তু চিন্তানায়কগণ তো সবাই পুরুষ। শিক্ষার অধিকার থেকে সমান অধিকারের দিকে যাত্রা শুরু।

শিক্ষা মেয়েদের বৃহত্তর জগতের পাওনা গন্ডা বুঝে নিতে সাহায্য করবে। শিক্ষার আন্দোলন থেকে ভোটের আন্দোলন, বুর্জোয়া নারীবাদী ভাবনা থেকে সমাজতন্ত্রী ভাবনা পেরিয়ে আজকের স্বতন্ত্র নারীবাদী ভাবনায় পৌঁছানোর ইতিহাস মানবসভ্যতার সমতার দিকে যাত্রার ইতিহাস।

জার্মানির শ্রমিক সংগঠন, ফরাসী বিপ্লব, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন - এসবের মধ্যে নারীদের অধিকারের কথা উচ্চারিত হয়েছে। নারীদের জন্য আলাদা ক্লাব, আলাদা সংগঠন- দাবীর মাধ্যমে পূরণ হয়েছে। নারী নেত্রীরা সৃষ্টি হয়েছেন। ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে জার্মানির সমাজতন্ত্রী নারীরা -নারীশ্রমিকদের কাজের শর্তের উন্নতি এবং রাজনৈতিক অধিকারের দাবি তুললেন। সমান মজুরি এবং প্রসূতিকালীন বীমার দাবিও ছিল। কোপেন হেগেনে ১৯১০ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের একটি কংগ্রেসে ৮ মার্চকে 'নারী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এরপর থেকে জার্মানিতে এবং রাশিয়ায় মেয়েদের অধিকারের আন্দোলন জোরদার হয়।

প্রতিবছর এই দিনটি নানা দেশের সমাজতন্ত্রী মেয়েরা অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করে আসছে। ১৯১৮ সালে ইংরেজ ত্রিশোর্ধ মেয়েরা ভোটের অধিকার পেলেন, কিন্তু ছেলেদের ২১ বৎসর পূর্ণ হলেই ভোটের অধিকার ছিল। ১৯২৮ সালে মেয়েরা ২১ বছরে ভোট দিতে সক্ষম হলেন। রাশিয়ায় ১৯১৭ সালেই অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা ভোটাধিকার পেয়েছে। রাশিয়া, ইংল্যান্ড ও ভারতে ভোটাধিকারের বয়স (১৮)। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী আমেরিকায় মেয়েরা ভোটাধিকার পেয়েছে ১৯২০ খ্রিঃ। আর গণতন্ত্রের গবেষণাগার নামে পরিচিত সুইজারল্যান্ডের মেয়েদের সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে ১৯৭১ খ্রিঃ। সাবেকী গণতান্ত্রিক ভাবধারা অনুসারে নারী সমাজকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করাকে গণতন্ত্র বিরোধী বলে মনে করতেন না। অ্যারিস্টটল পুরুষদের মধ্যেই রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কার্যাবলী সীমিতকরণের পক্ষে ছিলেন। ব্লুন্টস্লি ও নারী জাতির ভোটাধিকারের বিপক্ষে ছিলেন।

এখনো মেয়েদের প্রতি বৈষম্য সর্বত্র। বড়জোর তার চেহারা পাল্টেছে। ঘরে বাইরে অসাম্য, প্রতিমুহূর্তে হিংসার বলি হচ্ছেন মেয়েরা। ষাটের দশকে পশ্চিমি মেয়েরা পথে নেমেছ, সঙ্গে সঙ্গে শামিল হয়েছে অনুন্নত দেশের মেয়েরা।

১৯৭৫ থেকে ১৯৮৫ - এ দশ বছরকে রাষ্ট্রপুঞ্জ ঘোষণা করেছিল নারী দশক হিসাবে। আন্তর্জাতিক নারী দশকের শুরুতে-মধ্যে এবং শেষে তিন তিনটি আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে, ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে এবং ১৯৮৫ সালে নাইরোবীতে। এই সম্মেলনগুলিতে পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে নারী প্রতিনিধিগণ এসে যোগদান করেন এবং মনের ভাব বিনিময় হয় এবং গড়ে উঠে শক্তিশালী এবং সক্রিয় জোট। সম্মেলন গুলির অভিজ্ঞতা থেকে একথা পরিষ্কার হয় যে শুধু এশিয়া বা আফ্রিকা দেশের নারীগণই নির্যাতিতা লাঞ্ছিতা বা অত্যাচারিতা নন—গোটা পশ্চিমি দুনিয়াতেও চলছে অব্যাহত ভাবে নারী নির্যাতন। শুধু বাইরে নয় পরিবারের ভেতরে যে নির্যাতন হয় তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়। গার্হস্থ্য হিংসা ও নির্যাতনের প্রেক্ষিতে প্রচলিত আইন, তার বিধান ও প্রয়োগের দিকে নূতন ভাবে চিন্তা করার জন্য রাষ্ট্রগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। আন্তর্জাতিক নারী দশকে রাষ্ট্রসংঘ নারী অধিকার বিষয়ে কতকগুলি সুস্পষ্ট সুপারিশ করেঃ

১। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে মেয়েদের অংশীদার করতে হবে।

২। বৈষম্যমূলক সমস্ত আইন বিলোপ করতে হবে।

৩। নারী বিষয়ক মন্ত্রক ও আধিকারিক পদের সৃষ্টি করতে হবে সরকারি স্তরে।

১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় গৃহীত হয় নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপের সনদ Convention on the all forms of Discrimination againts women.

এই সনদে সইদানকারী সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে আহ্বান জানানো হয় নারী নির্যাতনের উৎপত্তি যে সমস্ত বৈষম্য থেকে - তা নিবারণের জন্য জাতীয় স্তরে আইন তৈরি করতে।

এই সনদে সুপারিশ ছিল ঃ

১। সামাজিক -রাজনৈতিক সব ধরনের সংগঠনের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে সমতা বিরোধী ঐতিহ্যকে বদলানোর জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিতে।

২। সব রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বৈষম্য দূর করতে প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করতে।

৩। সমস্ত সইদানকারী রাষ্ট্র রাষ্ট্রসংঘের নিকট মেয়েদের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠাতে বাধ্য থাকবে।

এই সনদে ভারত সহ ১৫৪টি দেশ সই করে। ১লা মার্চ ১৯৮০ সালে ভারত সই করে। সকল ক্ষেত্রে সমতার ধারণা বাস্তবায়িত করতে রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ নির্দেশ করার লক্ষ্যে কতকগুলি সুপারিশ করা হয়েছে ঃ -

১। শিক্ষায় ছেলে ও মেয়েদের সমান অধিকারের ব্যবস্থা করা।

২। রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরে মেয়েদের সমানাধিকার কার্যকর করা।

৩। কাজে নিয়োগ ও বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা।

৪। বিয়ে ও মাতৃত্বের ক্ষেত্র কাজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে হয়েছিল ১৯৮৫ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। সেখানে গৃহীত হয় '.Forward Looking strategies ' or FLS. এর মাধ্যমে নারীর অধিকারকে আন্তর্জাতিক মানব অধিকার আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই লক্ষ্যে ১৯৯১ সালের ২৫ শে নভেম্বর চিহ্নিত হয় 'নারী নির্যাতন বিরোধী দিবস' এবং এই পক্ষকাল শেষ হয় ১০ ই ডিসেম্বর বিশ্বমানব অধিকার দিবসে।

১৯৯৫ সালে বেজিং এ অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন - ৩০ শে আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই সম্মেলনে 'নারী অধিকার ও মানব অধিকার' ঘোষণা দেওয়া হয়। অর্থাৎ নারীর অধিকার মানব অধিকারের স্বীকৃতি পেল।

প্রধান দাবিগুলি হলঃ -

১।আইনে নারীর সমান অধিকারের স্বীকৃতি।

২। নারীর প্রজনন সংক্রান্ত অধিকার।

৩। নারীর অর্থনৈতিক অধিকার।

৪। নারী বিরোধী হিংসার অবসান।

বেজিং সম্মেলনের পাশাপাশি চিনের হুয়াইরো শহরে অনুষ্ঠিত হয় বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্মেলন। এটি ছিল তৃণমূল স্তরের স্বেচ্ছাসেবীদের। হুয়াইরো শহরে ঘোষণা দেওয়া হয় ২০০৫ সালের মধ্যে পৃথিবী থেকে পুরোপুরি লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে হবে। অবস্থার উন্নতি হয়েছে কিনা খতিয়ে দেখার জন্য নারী বিষয়ক কমিশনের হাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

১৯৯২ সালে ভারতে জাতীয় মহিলা কমিশন গঠিত হয়। ত্রিপুরায় আইন তৈরি হয় ১৯৯৩ সালে এবং কমিশন গঠিত হয় ১৯৯৪ সালে। মিহলা কমিশনের বিশেষ কোন ক্ষমতা নেই। আমলাতান্ত্রিক পরিকাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ। কমিশনের সুপারিশ সরকার পালন করতে বাধ্য নয়। আর্থিক অনুদানের জন্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারের মুখাপেক্ষি হয়ে থাকতে হয়। তবু মহিলা কমিশন মহিলাদের প্রতি বৈষম্য, হিংসা ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার এক হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

জাতীয় স্তরে ভারতে ২০০১ সালটি 'মহিলা ক্ষমতায়ন বর্ষ' রূপে চিহ্নিত হয়েছিল। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের দেশের অন্যান্য অংশের সাথে ত্রিপুরায়ও এই কর্মসূচি যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ দপ্তর থেকে 'জাগরী'র বিশেষ সংখ্যা বের হয় ২০০২ সালে। সেই সঙ্গে 'ভারতীয় সংবিধান ও অন্যান্য আইনে মহিলাদের স্থান' নামে এখটি পুস্তিকা ত্রিপুরা রাজ্য আইন সেবা কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রকাশিত হয়।

২০০৫ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মহিলাদের ক্ষমতায়নে রাজ্য সরকার ২৮ দফা কর্ম পরিকল্পনা ঘোষণা করে। এই কর্ম পরিকল্পনা রূপায়নের মধ্য দিয়ে মহিলাদের উন্নয়নে সুফল পাওয়া যাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বিবাহ নিবন্ধীকরণ আইন কার্যকর করা এবং সমস্ত জেলায় পারিবারিক আদালত স্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়।

বিশ শতকের শেষ দশকে রাষ্ট্রসংঘের সমীক্ষা অনুযায়ী - পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এরা পৃথিবীর মোট শ্রম প্রকরণের দুই-তৃতীয়াংশ পরিশ্রম করে, পৃথিবীর উপার্জনের এক দশমাংশ ভোগ করে এবং পৃথিবীর সম্পদের এক শতাংশের কম অধিকারিনী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থ-ই বলেছেন ঃ-

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার"।

ধর্মের অমানবিক কন্যা বিচার

হিন্দু শাস্ত্রমতে যে কোন ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য সমাপ্ত করে গৃহ আশ্রমে প্রবেশ করবে সংসার ধর্ম পালন করার জন্য। শাস্ত্র গ্রন্থ 'মনুসংহিতা'য় বিয়ের উপযোগী কন্যার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কেমন কন্যাকে বিয়ে করলে সংসার সুখের হবে। কন্যা হবে সুলক্ষণা ও সবর্ণা এবং চারুগুণ সম্পন্না। কন্যা সপিন্ডের হতে পারবেনা। মায়ের বংশে সপ্তপুরুষ সপিণ্ড এবং যে বংশে জন্মে সপিণ্ড । ব্রাহ্মণগণ কখনো সপিন্ডের কুলে বিয়ে করবেন না। কন্যা সম্পদশালী-পরিবারের হলেও সুন্দরী মনোরমা হতে হবে। 'মনুসংহিতা'তে দোষী দশ কুলের উল্লেখ আছে— যেখানে থেকে ভার্য্যা গ্রহণ করা চলবে না।

১। যে কুলে জাতকর্ম নেই

২। যে কুলে বেদপাঠ যাগে যোগে নেই

৩। যে কুলে সবাই রোমশ

৪। যে কুলে সবাই অগ্নিমান্দ্যে ভোগে

৫। যে কুলে শুধুই কন্যা জন্মে

৬-১০। যে কুলে অর্শ, যক্ষ্মা, মৃগী, ধবল ও কুষ্ঠ রয়েছে।

আরো বলা হয়েছে যে বুদ্ধিমান লোক সে কখনো পিঙ্গলকেশ, বিকৃত অঙ্গ, চির রুগ্না, লোম হীনা বা অতিলোমযুক্তা, কটুভাষিণী ও মার্জারিকটা চোখ যুক্তা কন্যাকে বিয়ে করবে না। কন্যার নামেও অনেক বাধা — নদী, নক্ষত্র, ম্লেচ্ছ, বৃক্ষ, পাহাড়, পাখি, সাপ ও দাসের নাম রাখা হলে, অথবা যে নাম শুনলে মনে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়— সে রূপ নাম যুক্তা কন্যাকে বিয়ে করা উচিত নয়। যথোচিত অঙ্গযুক্ত ও শ্রুতিমধুরনামা চলনে হংস বা গজগামিনী, চিকন অলকদাম, দেহ স্বল্প -লোমযুক্ত, দাঁত কুন্দফুলসম, কোমলদেহী মেয়েরাই বিবাহের উপযুক্ত। যে কন্যার ভাই নেই তাকে বিয়ে করতে নিষেধ, কেন না দৌহিত্র শ্বশুরের শ্রাদ্ধ করবে। যে কন্যার পিতার খোঁজ নেই—সে জারজ বিবেচনায় অনুপযুক্ত। ব্রাহ্মণ সবর্ণে বিয়ে করবে। কামের অধীন হয়ে যদি ফের বিয়ের ইচ্ছে হয় তবে অনুলোম বিয়ে করবে যদিও তা উচিত নয়। শূদ্র করবে শূদ্রাকে, বৈশ্য করবে বৈশ্যা ও শূদ্রাকে। আর ব্রাহ্মণ পারবে চারবর্ণের ঘরেই। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা ভার্য্যা গ্রহণের কোথাও উপদেশ নেই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও

বৈশ্য যদি কখনো শূদ্রাকে বিয়ে করে তবে তাদের যশ নাশ হয়। সন্তান জন্মিলে সন্তানসহ শূদ্র হয়ে যাবে। কখনো যদি কোন ব্রাহ্মণ প্রথমেই কোন শদ্রাকে বিয়ে করে এবং শয়ন বিলাসে রাত কাটায় তবে তার নরকে গতি হয়। আর সন্তান জন্মিলে ব্রাহ্মণত্ব লোপ পায়। সে শূদ্রা ভার্য্যা শুভকাজ যেমন দেবতা বা পূর্বপুরুষগণের কাজ বা অতিথি সেবা করলে কোন পুণ্যলাভ হয় না। স্বর্গলাভ হয় না। দেবতা বা পূর্বপুরুষগণ সে পূজা গ্রহণ করেন না। এক শয্যায় কামের বশে যদি কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রার অধররস পান করে নিঃশ্বাস লয় এবং গর্ভে কাম ভোগে সন্তান আসে-তবে তার নিষ্কৃতি নেই, পাপে গ্রাস করবে। 'মনুসংহিতা' হিন্দু সমাজ ব্যবস্থাকে যুগ যুগ ধরে শাসন করে এসেছে। এক কথায় হিন্দু সমাজের রূপকার। কালের গতির সঙ্গে 'মনুসংহিতা' প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেললেও জোর করে আজও তাকে প্রাসঙ্গিক করে রাখা হয়েছে। তবে বিয়ের কন্যা বিচারে যে বিধান দেওয়া হয়েছে—তা অমানবিক। উল্লেখিত গুণাবলী বা অবস্থা যেসব মেয়ের নেই —তাদের বিয়ে হওয়া সমস্যা। পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির ছোঁয়ায় ভারতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে নবজাগরণ এর সূচনা হয় তাতে ভারতীয় সমাজের অচল আয়তন ভাঙ্গার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তার থেকেই শুরু হয় কিছুটা ওলট পালট। সমাজ সমাজের প্রয়োজনে, মানুষ মানুষের প্রয়োজনে গ্রহণ-বর্জন করে। কালের চাকা এভাবেই ঘুরছে।

দৈনিক আরোহণ— শুক্রবার, ৬ জুলাই, ২০০৭ইং

পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে শহিদ হলেন বেনজির ভুট্টো

২৭ ডিসেম্বর ২০০৭ সভ্যতার ইতিহাসে একটি কালো দিন। সভ্যতাকে যারা পেছন দিকে ধাক্কা মারে তাদের জয়—তবে তা সাময়িক। এক বেনজির ভুট্টোকে হত্যা করে মানুষের মনের স্বাধীনতার স্পৃহা, সাম্যের স্পৃহা, সৌভ্রাত্বের স্পৃহা শেষ করা যায় না। মানুষ যা চায় তাই হয়। তা-ই পায়। হয়তো কিছু দেরি হতে পারে। পাকিস্তানে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনের ইচ্ছা ঠিকই পূরণ হবে। বেনজির শহিদ হলেন। তাঁর বাবা জুলফিকার আলি ভুট্টোকে ১৯৭৯ সালের ৪ এপ্রিল ফাঁসিতে ঝুলিয়ে শহিদ করা হয়েছিল। সাজানো বিচারে তাঁর চরমতম সাজা হয়েছিল। পাকিস্তানে মানুষ সেসব ভুলতে পারে না, ভুলেনি। তাঁদের কি অপরাধ? তাঁরা দেশে গণতন্ত্রের পতাকা উড্ডীন করতে চেয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন।

ভারতে দু'জন প্রধানমন্ত্রী খুন হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর নিজ শিখ দেহরক্ষী সতবন্ত সিং এবং বিয়ন্ত সিং গুলি করে তাঁর বুক ঝাঁঝরা করে দেয়। তাঁর অপরাধ-সন্ত্রাসবাদকে তিনি কড়া হাতে মোকাবিলা করেছিলেন দেশের অখণ্ডতার স্বার্থে। পাঞ্জাবের শিখেরা তখন স্বাধীন 'খালিস্তান' রাষ্ট্রের স্বপ্নে বিভোর। অলীক বিভ্রান্ত ধারণার পেছনে কত রক্ত ঝরে গেল ঐ সময়ে। কত মা তাঁর পুত্রকে হারিয়েছেন, কত স্ত্রী তাঁর স্বামীকে হারিয়েছেন, কত শিশু পিতৃহারা হয়েছে। সন্ত্রাস মানেই তো আতঙ্ক।

পবিত্র স্বর্ণমন্দিরকে শিখরা সমরাস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করে তোলে। পবিত্র ধর্মস্থানকে কলুষিত করে। এই স্বর্ণমন্দির ব্লু-স্টার অভিযান পরিচালনার জন্য শিখেরা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির উপর ক্ষুব্ধছিলেন। কুখ্যাত খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদী নেতা ভিন্দ্রেনওয়ালা এই অপারেশনে নিহত হয়। ইন্দিরা গান্ধি খুবই সঠিক ছিলেন। এরপর পাঞ্জাব শান্ত হয়ে যায়। ধাপে ধাপে উন্নতির পথে এগোয়।

ইন্দিরা তনয় তরুণ চৌকস প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধিকে হত্যা করেছে তামিল গেরিলারা ১৯৯১ সালের ২১ মে তামিলনাড়ুর পেরামবুদুরে নির্বাচনি প্রচার অভিযানে গেলে এল.টি.টি ই-র আত্মঘাতী মানব বোমার আঘাতে। তামিলনাড়ুতে কোন সমস্যা ছিল না। শ্রীলঙ্কার সমস্যা শ্রীলঙ্কার সরকার বুঝবেন এবং মোকাবিলা করবেন। গত ৮ জানুয়ারি ২০০৮ এল.টি.টি ই-র পাতা মাইন বিস্ফোরণে একজন মন্ত্রীসহ ১৩ জন নিহত হয়েছেন—ঘটনা নিঃসন্দেহে খুবই উদ্বেগের এবং দুঃখের। শ্রীলঙ্কায় গণতন্ত্র অটুট রয়েছে। ভারতে গণতন্ত্র স্বাধীনতা প্রাপ্তির

শুরু থেকেই। ভারতকে বলা হয় পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ।

পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ ভারতের পাশে অবস্থান করেও গণতন্ত্র স্থায়ী রূপ লাভ করতে পারছে না। লিয়াকত আলি খান পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী খুন হলেন ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর আততায়ীর গুলিতে। এরপর পাকিস্তানে একের পর এক সামরিক একনায়কদের শাসন চলে এল।

তবে বেনজির ভুট্টো ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেত্রী। তাঁর স্বপ্ন ছিল পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র স্থাপন ।তিনি ছিলেন পিতার যোগ্য উত্তরসূরী। পিতার নিষ্ঠুর মৃত্যুর পর পি.পি.পি-র কার্যভার তিনি তাঁর চওড়া কাঁধে তুলে নেন। তিনি আমেরিকার হার্ভার্ড ও লণ্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা শেষ করে ১৯৭৭ সালে দেশে ফিরে আসেন-তখন পাকিস্তানে পি.পি.পি-র প্রতিষ্ঠাতা জুলফিকার আলি ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী। জেনারেল জিয়া উল হক বিমান দুর্ঘটনায় ১৯৮৮ সালের ১৬ নভেম্বর নিহত হলে সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে পাকিস্তানের তথা মুসলিম দুনিয়ার প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হবার কৃতিত্ব অর্জন করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৫ বছর। শপথ নেন ২ ডিসেম্বর ১৯৮৮ । কিন্তু ২০ মাস পরে তাঁকে অনৈতিকভাবে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। ১৯৯০ সালের আগস্ট মাসে দুর্নীতি ও দুঃশাসনের অভিযোগ এনে প্রেসিডেন্ট গোলাম ঈশাক খান বেনজিরকে বরখাস্ত করেন। তাঁর স্বামী আসিফ জারদারিকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৯০ সালের নির্বাচনে বেনজির হেরে যান। নওয়াজ শবিফ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তবে ১৯৯৩ সালের অক্টোবরে পি.পি.পি. পুনারায় ক্ষমতায় আসে এবং বেনজির দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ নেন।

১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় অপব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে প্রেসিডেন্ট ফারুক লেঘারি তাঁকে বরখাস্ত করেন। তাঁর স্বামী আসিফ জারদারিকেও নানা অভিযোগ এনে জেলে পাঠান। ১৯৯৯ সালে পারভেজ মুশারফ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে নওয়াজ শরিফকে বন্দি করেন। তখন বেনজির ভুট্টো ছেলে-মেয়ে নিয়ে স্বেচ্ছা নির্বাসনে দুবাই চলে যান। প্রকৃতপক্ষে বেনজির ১৯৭৭ সাল থেকেই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। কিন্তু পাকিস্তানের ভূমি গণতন্ত্রের জন্য উর্বর হয়ে ওঠেনি। সমাজ ব্যবস্থার মূলে আঘাত করা দরকার। সমর নায়কদের বুটের আঘাতে গণতন্ত্র পদদলিত। আমেরিকার অন্নে লালিত-পালিত হয়ে সমরনায়কগণ ধরাকে সরাজ্ঞান করে চলেছেন। পাশাপাশি ধর্মীয় মৌলবাদ প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়েছে। আই.এস. আই বেনজিরের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত এ অভিযোগ উঠেছে। আলকায়দা, তালিবান এবং পাক জিহাদি সকলেই তাঁকে খতম তালিকায় রেখেছিল। বেনজির ভুট্টোর দুই ভাই বিস্ময়করভাবে নিহত হয়েছেন।

সব রকম প্রতিকূলতার মধ্যে অদম্য সাহস বুকে নিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আট বৎসর স্বেচ্ছা নির্বাসন কাটিয়ে দেশের শ্রমিক মেহনতি মানুষের, নারীদের

অধিকার রক্ষার আন্দোলনে এবং দেশ থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের লক্ষ্যে সাধারণ নির্বাচনের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। পারভেজ মুশারফের নিষেধবাণী অগ্রাহ্য করেই স্ব-ভূমে পা রাখেন ১৭ অক্টোবর। আর ১৮ অক্টোবর ২০০৭, তাঁকে নিয়ে সমর্থকদের মিছিলে গাড়িবোমা আক্রমণ হয়। তাতে তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেও তাঁর সমর্থক ও দলের সদস্য অন্তত ১৫০ জন নিহত হন। এই দুর্ঘটনায় অভিযোগের আঙুল তিনি মুশারফের দিকেই তুলেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মুশারফের সম্মতি ছাড়া এতবড় হামলা হতে পারে না। যদিও তিনি মুশারফের বিপক্ষে না গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলেই দেশের কাজ করতে চেয়েছিলেন। মুশারফ সামরিক উর্দি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন এবং নির্বাচন ঘোষণা করেছিলেন ৮ জানুয়ারি ২০০৮।

বেনজিরের মৃত্যুকে রহস্যে আবৃত করতে চেয়েছিলেন শাসককূল, কিন্তু তা তাঁর পরিবার ও দল মেনে নেয়নি। পাকিস্তানে একের পর এক ধ্বংসলীলা চলে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হয়, ফেব্রুয়ারির ১৮ তারিখ। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উত্তাপ আমাদের মনকে বিচলিত করে।

দৈনিক আরোহণ— মঙ্গলবার, ১৫ জানুয়ারী, ২০০৮ইং

উপমহাদেশের স্বাধীনতা ও রক্তের হোলি খেলা

স্বাধীনতার জন্মলগ্নে ভারত উপ-মহাদেশ দেশবাসীর চোখের সামনে দু টুকরো হয়ে গেল। বাংলা ভাগ হয়ে গেল, পাঞ্জাব ভাগ হয়ে গেল। পরবর্তী সময় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালে পূর্বপাকিস্তান 'বাংলাদেশ' নামে নূতন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিল। ভারত উপমহাদেশ ভেঙে তিন টুকরো না হলে ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ রূপে স্বীকৃতি পেত—চিন থাকত দ্বিতীয় স্থানে। ভারত ভূখন্ড মানব সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও পাকিস্তান ও বাংলাদেশে গণতন্ত্র স্থায়ী হচ্ছে না। কখনো এক নায়ক। নয়তু মিলিটারী শাসন । রক্তপাত বন্ধ হচ্ছেনা। ভারতে দুজন প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসবাদের স্বীকার হয়েছেন। ইন্দিরা গান্ধী (১৯৮৪) এবং রাজীব গান্ধী (১৯৮৯) কিন্তু এদেশে গণতন্ত্রের ভিত শক্ত। শাসন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হচ্ছে।

পেছন দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় ভারত উপমহাদেশ এর ভাঙন এড়ানো যেত যদি সে সময়ের কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত নেহরু ও মুসলীমলীগের মহম্মদ আলী জিন্নাহ্ এক মত হতে পারতেন। তাঁরা তাদের ক্ষমতার লোভ সম্বরণ করতে পারেননি। ১৯৪৫ সালে ব্রিটেনে শ্রমিক দলের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলী ক্ষমতায় আসেন। তিনি ভারতীয়দের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রী সভার তিনজন সদস্য ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ভারতে প্রেরণ করেন । এরা ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দীর্ঘসময় ধরে আলাপ আলোচনা করে তাঁদের মনোভাব বুঝে ভারতীয়দের সামনে প্রস্তাব উত্থাপন করেন ১৬ই মে ১৯৪৬ সালে। প্রস্তাবগুলি ছিল- ১। ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলি সহ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে। ২। প্রাদেশিক সরকার সমূহের স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার থাকবে। ৩। সমগ্র ভারতকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হবে-হিন্দু প্রধান অঞ্চলকে 'ক', মুসলীম প্রধান অঞ্চলকে 'খ', এবং বাংলা ও আসামকে 'গ' শ্রেনীভুক্ত অঞ্চলে। প্রত্যেকটি অঞ্চলকে পৃথক শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া হবে। ৪। প্রদেশগুলো এবং দেশীয় রাজ্যসমূহ যৌথভাবে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনা করবে। ৫। যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্যন্ত একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব মুসলীম লীগ মেনে নিয়েছে বলে ঘোষণা দেয়-৬ জুন ১৯৪৬। কারণ প্রস্তাবে কার্যত পাকিস্তান গঠন মেনে নেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস শুধু গণ পরিষদ গঠন

এ রাজি হয়েছিল এবং জুলাই মাসে গণ পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে আবুল কালাম আজাদ এর পরিবর্তে পণ্ডিত নেহেরু কংগ্রেসের সভাপতি হন। তিনি ঘোষণা করলেন সংবিধান সভায় যোগদান করলেও অন্য প্রস্তাব মানতে রাজী নন। তাতে নেহেরু-জিন্নাহ্‌র দুরত্ব বেড়ে গেল। জিন্নাহ্‌ পাকিস্তান গঠনে অনড়। বড়লাট ওয়াভেল নেহেরুকে মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান জানান। আর জিন্নাহ্‌ সাহেব 'পাকিস্তান' এর দাবীতে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' আহ্বান করলেন ১৬ আগস্ট। ঐ দিন শুরু হল ভারতের ইতিহাসে এক কলংকজনক অধ্যায়।

সারাভারত রক্তাক্ত হলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। ১৬ থেকে ১৯ আগস্ট কলকাতার বুকে ব্যাপক দাঙ্গা, লুন্ঠন,ধর্ষণ, অগ্নি সংযোগ ঘটে তাতে প্রায় ছয় হাজার মানুষ মারা যায়। 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা এঘটনার জন্য মুসলীম লীগ মন্ত্রীসভা ও বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দীকে দোষী করে।

বড়লাট ওয়াভেল অন্তবর্তী সরকার গঠনের জন্য নেহেরুকে অনুরোধ করলেন। নেহেরু ২ সেপ্টেম্বর সরকার গঠন করেন ওয়াভেলের অনুরোধে লীগের পাঁচজন সদস্য সরকারে যোগ দেন। তাতে কোন লাভ হয় নি —লীগ ও গংগ্রেসের দুরত্ব বাড়াতে লাগল। জিন্নাহ্‌ সাহেব সরকারের ভিতর থেকে 'ক্যাবিনেট মিশন' এর প্রস্তাবগুলি বানচালে উদ্যত হলেন এবং দেশ ভাগে তৎপর হলেন। দেশে চলছে নৈরাজ্য। এর মধ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা দিলেন ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ইংরেজরা ভারত ছাড়ছেই। ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৬ ওয়াভেল সংবিধান সভার প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন। তখন মুসলীম লীগ পাকিস্তানের জন্য পৃথক সংবিধান সভা গঠনের দাবী জানায়।

এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী এটলী বড়লাট ওয়াভেলকে অপসারন করে মাউন্টব্যাটেনকে ভারতে নিয়োগ করেন। ভারতে ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে এক ভয়াবহ দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। তখন মাউন্টব্যান্টন ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য পরিকল্পনা তৈরী করেন যা ইতিহাসে 'মাউন্টব্যান্ট পরিকল্পনা' নামে খ্যাত। মহাত্মাগান্ধী অচলাবস্থা দুর করার জন্য মন্ত্রীসভা ভেঙে পুরো দায়িত্ব জিন্নার হাতে তুলে দিতে বলেন। কিন্তু কংগ্রেস গান্ধিজীকে সমর্থন করেননি। এদিকে জিন্নাও পাকিস্তানের দাবীতে অটল। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাশ হয়। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী গান্ধিজীর ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা লাভে মত ছিল না। অবশেষে পরিস্থিতির চাপে তিনি সায় দেন। তিনি উদ্ভুত দাঙ্গা দমনে বেড়িয়ে পড়েন। আইনগত ভাবে ভারত ভাগ হয়ে গেল, শুধু ১৫ অগাস্ট ঘোষণা বাকি। জিন্না সাহেব ৭ আগস্ট করাচি চলে যান, ১১ আগস্ট পাকিস্তানের সংবিধান সভা তাঁকে সভাপতিপদে নির্বাচিত করে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাত্রে ভারতের কিছু অংশ নিয়ে 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রের জন্ম হয় আর ১৫ আগস্ট প্রত্যুষে দিল্লির সংবিধান সভার অধিবেশনে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। সে সময় মহাত্মাগান্ধি কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে দাঙ্গা পীড়িতদের সঙ্গে ছিলেন। ভারত ইউনিয়নের গভর্ণর জেনারেল হলেন

মাউন্টব্যাটেন আর পাকিস্তানের মহম্মদ আলি জিন্না। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু আর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি যান।

ভারত-পাক স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি জাতির জনক মহাত্মাগান্ধিকে একটি প্রার্থনা সভায় হত্যা করা হয় দিল্লির বিড়লা ভবনের লনে। ঘাতক নাথুরাম গডসে মৌলবাদী হিন্দু মহাসভার লোক। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জননেতা লিয়াকত আলি খান ঘাতকের বুলেটে প্রাণ হারান ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াওল হক পাঞ্জাব প্রদেশের বাইওয়ালপুর থেকে বিমানে ফেরার পথে রহস্যজনকভাবে ১৯৮৮ সালের ১৭ আগস্ট মারা যান বিমান দুর্ঘটনায়। এটিকেও রাজনৈতিক হত্যাকান্ড বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টোকে ১৯৭৯ সালের ৪ এপ্রিল ফাঁসি দেওয়া হয় দীর্ঘ কারাবাসের পর। সাজানো বিচারে তাঁর জীবন কেঁড়ে নেওয়া হয়। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী সালোমান বন্দব নায়েককে ১৯৫৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর গুলি করে হত্যার মাধ্যমে শুরু হয় রাজনৈতিক হত্যাকান্ড। ১৯৯৩ সালে মে দিবসের র‍্যালিতে অংশ নেয়ার সময় এল.টি.টি.ই'র গেরিলাদের আত্মঘাতী হামলায় প্রাণ হারান প্রেসিডেন্ট রনসিংহ প্রেমদাসা। এছাড়া শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট থাকা কালে বিস্ফোরনে একটি চোখ হারান চন্দ্রিকা কুমার তুঙ্গা ১৯৯৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের শুরু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যার মাধ্যমে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে একদল বিপথগামী সেনা সদস্যদের দ্বারা নির্মমভাবে প্রাণ হারান। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রাণ হারান ১৯৮১ সালের ৩০ মে এক ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানে। তারপর ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গ্রেনেড হামলা হয়– তাতে মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আইভি রহমানসহ ৩০ জন মারা গেলেও অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান শেখ হাসিনা। তবে তিনি শারীরিক বিধ্বস্ত হন।

ভারতে ১৯৮৪ সালের ৩১শে অক্টোবর জওহরলাল নেহেরুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে হত্যা করা হয়। তাঁর শিখ দেহরক্ষী সতবন্ত সিং এবং বিয়ন্ত সিং গুলি করে তাঁকে হত্যা করে। স্বর্ণমন্দিরে অপারেশন ব্লুস্টার অভিযানের জন্য শিখরা ক্ষুব্ধ ছিল। ইন্দিরা তনয় তরুন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধিকে মানব বোমায় হত্যা করে তামিল গেরিলারা। ১৯৯১ সালের ২১ মে তামিলনাডুতে নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন।

উপমহাদেশের এক নিষ্ঠুর হত্যা ২০০৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর সংঘটিত হয়। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর কন্যা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং মুসলীম দুনিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী বেনজিরকে রাজনৈতিক খুন করে ঘাতকেরা। সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে তাঁর মৃত্যু সংবাদ টি.ভি. পর্দায় প্রচার করা হয়। ১৯৭৯ সালের ৪ এপ্রিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

ভুট্টোর ফাঁসির পর পি.পি.পি.'র হাল ধরেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা বেনজির ভুট্টো। ১৯৮৮ সালে জিয়াওল হকের মৃত্যুর পর সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী হন। অবশ্য ২০ মাস পর তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। ১৯৯১ সালে আবার নির্বাচনে জয়ী হয়ে দ্বিতীয়বার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৯৩ সালে প্রেসিডেন্ট ফারুক লেঘারি তাঁকে বরখাস্ত করেন। ১৯৯৯ সালে জেনারেল পারভেজ মুশারফ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে নওয়াজ শরিফকে বন্দি করে ক্ষমতা দখল করলে বেনজির নির্বাসনে দুবাই চলে যান। তাঁর স্বামী আসিফকে ৮ বছর জেলে আটক রেখে ২০০৪ সালে মুক্তি দেয়া হয়। বেনজির দুবাই ও লন্ডনে ৮ বছর কাটান ছেলে বিলাওল ও মেয়ে বখতার ও আসিফাকে নিয়ে। জঙ্গীবাদ অবসানের লক্ষ্যে ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্পে ১৮ অক্টোবর ২০০৭ তিনি দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফেরার দিনই করাচির রাস্তায় আত্মঘাতী হামলায় রাজপথ কেঁপে ওঠে। অন্তত ১৫০ জন দলীয় কর্মী ও সমর্থক নিহত হয়— তিনি প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু ২৭শে ডিসেম্বর ২০০৭ সন্ধ্যায় লিয়াকত বাগে তিনি শেষ নির্বাচনী বক্তৃতা দেন জনগণের উদ্দেশ্যে। পারভেজ মুশারফ নির্বাচন প্রক্রিয়া করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং দিন ঘোষণা হয়েছিল ৮ই জানুয়ারি ২০০৮। পরে দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে চলে যায় ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০৮-এ।

২৪শে নভেম্বর সভ্যতার ইতিহাসে একটি কালো দিন

অসম আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য। অসমের সঙ্গে ত্রিপুরাবাসীর আত্মিক যোগ। এ রাজ্যের ভালোমন্দে আমরা আন্দোলিত হই। কিন্তু ২৪শে নভেম্বর ২০০৭ যা ঘটে গেল তাতে আঁৎকে উঠতে হয়। ভাবনা চিন্তার বোধবুদ্ধি হারিয়ে যায়। একটি রাজ্যের রাজধানীতে প্রকাশ্য দিবালোকে যা ঘটল তা জেনে কানে তালা লেগে বাক্‌শক্তি রহিত।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাবেশ-মিছিল ইত্যাদি হয়েই থাকে ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য। প্রকাশ্য রাস্তায় লাঠির ঘা, কিল, চড়, লাথি মেরে আদিবাসী তরুণ তরুণীদের রাস্তায় নির্যাতনের দৃশ্য অকল্পনীয়। আদিবাসীদের দাবি অনুযায়ী অন্তত ২২ জন নিহত ও দুইশতাধিক আহত হয়েছে। সবচেয়ে নেক্কারজনক ঘটনা —একটি আদিবাসী তরুণীকে প্রথমে অশ্রাব্য গালাগাল ও কিল, চড়, লাথি মেরে তারপর ছুরি দিয়ে গায়ের পোষাক কেটে খুলে ফেলে। তরুণীটি বিবস্ত্র হয়ে প্রাণভয়ে হিংস্র ন্যাকড়ের থাবা থেকে মুক্ত হয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে দৌড়াতে থাকে। পুলিশ প্রশাসন ছিল নির্বিকার। আশপাশে কোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ ছিল না নরখাদকদের বাধা দেওয়ার। পরে অবশ্য একজন নিজ গায়ের শার্ট খুলে দেয় তরুণীটিকে লজ্জা নিবারণের জন্য।

চা-এর জন্য অসম বিখ্যাত। ব্রিটিশ আমলে চা-শ্রমিক হিসেবে কাজের জন্য ছোটনাগপুরের কর্মঠ সাঁওতাল, কোল ও অন্যান্য আদিবাসীদের নিয়ে আসা হয়।

এরা টি-ট্রাইব (Tea-tribe) হিসেবে অসম গেজেটে নথিভুক্ত। এদের জনজাতি হিসেবে স্বীকৃতি সারা দেশে নেই। এদের আর্থিক বঞ্চনার ইতিহাস নতুন নয়। ব্রিটিশ আমলে এরা 'কুলি' নামে পরিচিত ছিল। এখন বদলে 'চা-উপজাতি'। শিক্ষিত ও চেতনাসম্পন্ন যুবকরা এ ধরনের নাম মেনে নিতে পারছে না। কারণ সুযোগ সন্ধানী বর্ণ-হিন্দুরা তাদের 'চা-উপজাতি' বলে দূরে সরিয়ে রাখছিল। ১৯৯৬ সালে কোকড়াঝাড় বোড়োদের সঙ্গে চা-উপজাতিদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বাঁধে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও স্বীকৃতি আদায়ের প্রশ্নে। পুরনো দাবি আদায়ের লক্ষ্যেই হাজার হাজার আদিবাসী একজোট হয়— অসম টি-ট্রাইব স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, অল অসম সাঁওতাল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, আদিবাসী সোসিও কালচারেল সোসাইটি, আদিবাসী কাউন্সিল অব অসম।

দিসপুরের কিছু সভ্য মানুষ তরুণীকে উদ্ধার করে পোষাক দেয় এবং শ্রমমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ

মাহীর বাড়িতে নিয়ে যায়। মন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী মিলে মেয়েটিকে কিছু নতুন পোষাক কিনে দিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। বেলতলা এলাকার ওই তিন দুঃশাসন পুলিশের জালে ধরা পড়েছে—যারা তরুণীর গা থেকে পোষাক খুলে নিয়েছিল। এরা হল— প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী, সঞ্জিত চাকলাদার ও রাতুল বর্মণ। মেয়েটি ছিল ওরাং পরিবারের, বাড়ি দিসপুর থেকে অনেক দূরে। তরুণীটি সেবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার কথা। গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডাক্তার দেখিয়ে পরদিন বাড়িতে যায়। ওর বাড়িতে উপজাতি যুবক প্রহরারত থাকে।

আহতদের হাতে ৫০০/- টাকা দিয়ে বাড়ি চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যা ঘটার ঘটেছে— এবার চুপ থাকার নির্দেশ। প্রশাসন নিষ্ক্রিয় ছিল বলেই ঘটনা এত দূর গড়াল, নয়তু এতটা আলোড়ন সৃষ্টি হত না। অনেকেই মনে করছেন পুলিশ প্রশাসন পরোক্ষে মদত দিয়েছে হত্যালীলায়। তাই এতগুলো লাশ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা গেল।

প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গঁগৈ দায় চাপিয়েছিল আদিবাসীদের উপর। অর্থাৎ অনুমতি না নিয়ে মিছিল করায় এ বিপত্তি। দিসপুরের রাজস্থলিতে সব সময় গণসংগঠনগুলি নিজস্ব দাবি দাওয়া নিয়ে প্রতিবাদ করে থাকে। কখনোই এ ধরনের ঘটনার সূত্রপাত হয়নি। প্রথমে দক্ষিণ বেলতলার স্কুলমাঠে সমাবেশ হয়েছিল। আদিবাসীদের এক অংশ সংঘবদ্ধভাবে মিছিল আরম্ভ করে। এক বিশাল সমাবেশ ও মিছিল হয়। এ বিশাল সমাবেশ ও মিছিলের নিরাপত্তার জন্য অল্পসংখ্যক পুলিশকর্মী নিয়োগ করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত বেলতলার স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে মিছিলকারীদের হঠাৎ সংঘর্ষ বেঁধে যায়। পুলিশ গ্যাস চালালো উপজাতি আন্দোলনকারীরা সন্ত্রস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। এদের কাছে রাস্তাঘাট অপরিচিত। মার খেয়ে রাস্তায় নর্দমায় এদের পড়ে থাকতে দেখা যায়। বেলতলার লোকেরা এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে রাস্তায় পড়ে থাকা মৃত বা অর্ধমৃত আদিবাসী তরুণদের লাঠি, মার, লাথি অব্যাহত রাখে পুলিশের সামনেই। প্রাণের ভয়ে দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে অজানা অচেনা জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। আর স্থানীয় জনগণের একটা অংশ হিংস্র হয়ে ওঠে চালাতে থাকে কিল, ঘুষি, মার ধর্ষণ।

২৮ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গঁগৈ সাংবাদিকদের ডেকে বলেছেন 'টি-ট্রাইব'দের তফশিল উপজাতির মর্যাদা দিতে অসম সরকারের কোন আপত্তি নেই। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে তিনি পূর্বেই জানিয়েছেন। 'আদিবাসী নিধন' ও আদিবাসী তরুণীর 'শ্লীলতাহানি'র ব্যাপারে শ্বেত পত্র প্রকাশের আশ্বাসও দিয়েছেন। হাইকোর্টের বিচারপতিকে দিয়ে ঘটনার তদন্ত করা হবে এবং তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করবে।

দুই আদিবাসী বামসাংসদ রূপচাঁদ মুর্মু এবং জোয়াকিম্ বাক্সলা এর সঙ্গেও অসম মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক হয়। বৈঠকের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে বাম সাংসদগণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দ্বি-চারিতার অভিযোগ আনেন। কারণ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল ২৮ নভেম্বর সংসদে বলেছেন

আদিবাসীদের এ দাবি মানা যায় না।

সি.পি.এম. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিমান বসু এক বিবৃতিতে গগৈ সরকারের প্রতিহিংসামূলক আচরণের নিন্দা করেছেন। সে সঙ্গে তফশিলি উপজাতি হিসেবে স্বীকৃতি পাবার দাবিটিকে সমর্থন জানিয়েছে সি.পি.এম। অমানবিক ও নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে বিভিন্ন জায়গায় বন্‌ধ হয়েছে ২৭শে নভেম্বর— রাঁচি, জামশেদপুর, গিরিডি, হাজারিবাগ, ধানবাদ ইত্যাদি।

নিহতদের আত্মীয়কে ৩ লক্ষ টাকা এবং ধর্ষিতা তরুণীকে ১ লক্ষ টাকা ও পরিবারের একজনকে চাকরি দেবার কথা ঘোষণা করেছেন অসম সরকার। জানা গেছে গরিব আদিবাসীরা সরকারের এ অনুদান প্রত্যাখ্যান করেছে। আদিবাসীরা জনজাতিকরণ দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অটল রয়েছে।

পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতাকে আড়াল করতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী গগৈ ১ ডিসেম্বর সি.বি.আই তদন্তের কথা বলেন। বেলতলায় আদিবাসীদের জমায়েত সম্পর্কে গোয়েন্দাদের সতর্কতামূলক রিপোর্ট ছিল— তা সত্ত্বেও উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রশাসন করেনি। আদিবাসীদের বিভিন্ন সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ যৌথ বিবৃতিতে ঘোষণা দেন আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে সংসদে বিষয়টি নিয়ে যেন আলোচনা হয়। তফশিলি উপজাতি ঘোষণা করা হোক। আর দাবি মানা না হলে আগামী ১৭ ডিসেম্বর থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য রাজ্যে অর্থনৈতিক অবরোধ জারি হবে। আদিবাসী নেত্রীবৃন্দের লক্ষ্য হল 'ফাইট টু ফিনিস'।

সংবাদপত্রের আয়নায় পৈশাচিকতা

সংবাদপত্র যেন প্রবহমান আলোকচিত্র। সুন্দর-বিশ্রী, মানবিক-অমানবিক, মনোসুখকর হৃদয়বিদারক— সব দৃশ্যই আমরা প্রত্যক্ষ করি। ইদানীংকালে অন্য সব দৃশ্যকে ছাপিয়ে নারীর উপর পৈশাচিক বর্বর নির্যাতনের ছবি বড় বেশি গোচরে আসছে।

একটি রোমহর্ষক নারকীয় ঘটনা ঘটে গেল বিশালগড়ে। তন্দ্রা দাসের স্বামী বিকাশ - পেশায় রিক্সাচালক। গত ২৯ মার্চ ২০০৮ মার্চ প্রথমে সে তন্দ্রাকে মারধোর করে তারপর ধর্ষণ করে এরপর বস্ত্রহীন করে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। উল্লেখ্য তন্দ্রার একটি তিন মাসের শিশু সন্তান রয়েছে। জি.বি. হাসপাতালে অগ্নিদগ্ধ তন্দ্রার সঙ্গে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন তপতী চক্রবর্তী ও কমিশনের অ্যাডভোকেট সদস্যা অদিতি শর্মার নেতৃত্বে একটি দল গিয়ে অগ্নিদগ্ধার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন। জবানবন্দিতে তন্দ্রা উল্লেখ করে স্বামী বিকাশের দাবি মেটাতে বার বার বাপের বাড়ি থেকে টাকা এনে দিতে হত। বাবার বাড়ি আমতলি গেলে সেখানেও সে হাজির হত টাকার জন্য এবং টাকা না পেয়ে দিনদুপুরে বাবা ও অন্য লোকজনের সামনে তাকে ধর্ষণ করে। জি.বি. হাসপাতালে ২ এপ্রিল তন্দ্রা মারা যায়। এ খবর 'আজকাল ত্রিপুরা'য় প্রকাশিত হয় ১১ এপ্রিল ২০০৮।

গত ৫ মে সোমবার ২০০৮ বিশালগড়ের নমঃপাড়ায় ন'মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর কোমরে মদ্যপ স্বামী বাবুল সরকার বীরদর্পে দায়ের কোপ বসিয়ে দেয়। রক্তাক্ত ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রতিবেশীরা অনিমাকে প্রথমে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যায় তারপর জি.বি. হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ডাক্তারগণ অনুমান করেন দায়ের কোপ এতটাই গভীর যে গর্ভস্থ শিশুর গায়ে আঘাত লেগেছে। হতভাগী অনিমার একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। অনাগত শিশু ও বংশধরকে রক্ষা করার তাগিদে গর্ভবতী নারীকে যথোচিত যত্নে ও সন্তর্পণে রাখা আবশ্যক। নারী ও অনাগত শিশুর জীবন বিপন্ন স্বামী ও পিতা-রূপ বর্বর পিশাচের হাতে।

দীর্ঘদিন ঘরসংসার করার পর ঘর ছেঁড়ে বেরিয়ে যেতে হয় নারীকে— এমন ঘটনা আকছাড় ঘটছে। স্বামীর বিভিন্ন খেয়াল— যেমন পরকীয়া প্রেম, স্ত্রীর সেবায় অসন্তুষ্টি ইত্যাদি নানা অজুহাত। চাকুরিরতা অন্ধ স্ত্রীকে দুই শিশু সন্তানসহ বিয়ের এগারো বছর পর বাড়ি থেকে বের করে রাস্তায় নামিয়ে দেবার ঘটনা ঘটে সিধাই থানাধীন তুলাবাগান চৌমুহনিতে। স্বামী গৌতম সূত্রধর জেনেশুনেই জন্মান্ধ এবং মাধ্যমিক পাশ চাকুরিজীবী লক্ষ্মীরাণী দাসকে বিয়ে করে। কিন্তু স্ত্রীর উপার্জনে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। বাপের বাড়ি থেকে কারি কারি টাকা

এনে দেবার বায়না। বেগতিক দেখে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা তুলে দেয়। কিছুদিন পর চাই ৫০ হাজার টাকা — লক্ষ্মীরাণী দিতে গররাজি হতেই তার ও দুটি শিশু সন্তানের জীবনে বিড়ম্বনা ঘনিয়ে আসে।

মেয়েদের সাবলীল ও স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য জাতীয় স্তরে ও আন্তর্জাতিক স্তরে নানা পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অনেকগুলিই বাস্তবায়িত হচ্ছে তবু সমাজ থেকে সমস্ত কুমনোভাব দূর হচ্ছে না। মেয়েরা নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, প্রাণ বলি দিতে হচ্ছে, প্রতিদিনের সংবাদপত্রে এ ঘটনাগুলি জায়গা করে নেয়। সমাজে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের তো অভাব দেখি না— তবু অশুভশক্তিকে শেষ করা যাচ্ছে না, যত্রতত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। ধ্বংস করে নিজেও ধ্বংস হয়, সাজা পায়। যুবসমাজ যদি এগিয়ে আসে, প্রতিবাদ করে তবে এসব সমাজ থেকে কমবে। কারণ একটা চূড়ান্ত ঘটনা একদিনে ঘটে না—পূর্বে বিভিন্ন স্তরে এব মহড়া চলে—তখনই তাকে সাবধান করে দেওয়া জরুরি।

দৈনিক আরোহণ— শুক্রবার, ৩০ মে, ২০০৮ইং

অষ্টম সর্ব-ভারতীয় মহিলা সম্মেলন

জেনে খুবই আনন্দিত হলাম সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির অষ্টম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল গত ১ থেকে ৪ নভেম্বর ২০০৭ ইং। স্থান নির্বাচিত হয়েছিল বাম দুর্জয় ঘাঁটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনার বিধাননগরের পূর্ব-ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। সেজেগুজে তৈরি ছিল—দায়িত্বে ছিলেন জেলা কমিটি। ৯৫৬ জন প্রতিনিধির থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। বন্ধু সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের স্বাগত জানানো হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রূপকার কমরেড কণক মুখার্জির নামে সম্মেলন স্থলের নামকরণ করা হয়েছিল কণক মুখার্জি নগর। আর মঞ্চের নাম রাখা হয়েছিল ইভা মেহতার নামে। কমরেড ইভা মেহতা ছিলেন গুজরাট রাজ্যের মহিলা সমিতির অগ্রণী নেতৃত্ব—যাঁর প্রয়াণ হয়েছে কিছুদিন পূর্বে।

সারা ভারত মহিলা সমিতির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮১ সালে চেন্নাইয়ে। তখন অংশ নিয়েছিল ১২টি রাজ্য। সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯৫ জন। বর্তমানে অর্থাৎ পঁচিশ বছর পর ২৮টি রাজ্যের সদস্যা সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটির উপর। সংখ্যাটি জেনে বা দেখে সন্তুষ্ট হবার কোন কারণ নেই। আরো বেশি সংখ্যায় নারীদের যুক্ত করতে না পারলে সার্থকতা আসবে না। সমাজটা শ্রেণি বিভক্ত কেন? শ্রেণি বিভক্ত সমাজে নারীদের স্থান কোথায়? তাদের মর্যাদা কতটা সুরক্ষিত? সমাজে নারীরা অবহেলিত হয়ে আর কতকাল থাকবে? কিভাবে পরিত্রাণ ঘটতে পারে। এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে প্রত্যেক মহিলাকে নারী সমিতির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। বিশেষজ্ঞাগণ কি বলেছেন—জানতে হবে। সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে নারীকে অবজ্ঞা ও পদানত করে রাখার যে অভ্যাস সৃষ্টি হয়েছে তার বিরুদ্ধে সচেতনভাবে পুরুষ ও নারীকে একযোগে সংগ্রাম করতে হবে। নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। উভয়ের সম্পর্ককে বৈজ্ঞানিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে হবে। বাস্তবে দেখা যায়—নারীকে পুরুষের অধীন হয়ে থাকতে হয়—তবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যবধান থাকে না। নারীকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এনে দেয়—ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজের সব কাজে অংশগ্রহণ করে। চার দেয়ালের ভেতর থেকে হেঁসেল ঠেলে ঠেলে যে জড়তার সৃষ্টি হয়েছে তা আস্তে আস্তে কাটিয়ে ওঠে। বিশেষজ্ঞরা বলেন নারীদের শরীরে জিনগত প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই জিনগত ত্রুটি কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রবল মানসিক শক্তি ও সংগ্রাম প্রয়োজন।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরা অভ্যস্ত হয়ে ওঠেছে। স্বাধীন মতামত প্রকাশে নারীরা প্রায়শই দ্বিধাগ্রস্ত থেকে যায়। একটা কথা প্রায়ই বলা হয়—অধিকার অর্জনের লড়াইয়ে সবাইকে শামিল করা চাই। এ না হলে নারীকে অবহেলিত হয়ে আরো বেশিদিন পিছিয়ে থাকতে হবে।

মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছেন- সন্তান প্রজননই নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রথম শ্রম বিভাজন। ইতিহাসের প্রথম শ্রেণিবিরোধ একগামী বিবাহের ফলে নারী-পুরুষের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ এবং প্রথম শ্রেণি নিপীড়ন পুরুষ কর্তৃক নারী নিপীড়নের।

লেনিন বলেছেন— ঘরকন্নার কাজের বোঝা মেয়েদের উপর চাপানো হয় বলে সম্পূর্ণ সমান অধিকার পেয়েও তাদের অধীন হয়ে থাকতে হয়। ঘরকান্নার কাজ বিরক্তিকর ও কষ্টকর- যা নারীদের কোন উন্নতির কাজে লাগে না। আদর্শ ভোজনালয় ও আদর্শ শিশু রক্ষণাগার নারীদের ঘরকন্নার কাজ থেকে মুক্তি দেবে। বিপ্লবের অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এসব রাশিয়ায় গড়ে ওঠে এবং লেনিন এসবের মুখ্য দায়িত্ব নারীদের নিতে আহ্বান জানান। শ্রমিকদের মুক্তি যেমন শ্রমিকদের নিজের দ্বারাই আসে ঠিক তেমনি নারীদের মুক্তি তাদের নিজেদের দ্বারাই আনতে হবে। তিনি আরো বলেছেন সমস্ত সভ্য এবং উন্নত দেশেও নারীদের পারিবারিক দাসী বলা চলে। কোথাও নারীরা সম্পূর্ণ সমান অধিকার পায় না।

রোজা লুক্সেমবার্গ মনে করতেন নারীরা রসিকতার মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবনে শক্ত ভিত্তি লাভ করবে। রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপনের দ্বারাই অধিকারের ভিত্তি অর্জন করবে।

ভারতবর্ষের মনিষীগণ বিশেষ করে রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, গান্ধীজী, বিবেকানন্দ-এঁরা বুঝতে পেরেছিলেন নারী জাতির দুঃখ লাঞ্ছনার কথা। তাই এঁরা নারী জাতির উন্নতির কথা বলেছিলেন। নারী জাতিকে সামনে এগিয়ে আনতে না পারলে সমগ্র সমাজ পিছিয়ে থাকবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ নারীরা শিক্ষা-সংস্কৃতির আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে ঘরকান্নার কাজ করে একঘেয়ে জীবনপাত করেন। আজীবন পুরুষদের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে- সুতরাং পুরুষদের সমান অধিকার ভোগের প্রশ্নই আসে না। শিক্ষায় ও স্বাবলম্বনে আশু এগিয়ে যাওয়া দরকার সকল নারীদের। নারী আন্দোলন সমগ্র শোষিত বঞ্চিত পিছিয়ে পড়া মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনেরই অঙ্গ। সুতরাং নারী আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে চলবে না।

সমস্ত স্তরের পিছিয়ে পড়া মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের আন্দোলন বামশাসিত রাজ্যগুলিতে- পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরালাতে অনেকটা এগিয়েছে। কারণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এ আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। শিক্ষায় চেতনা আনে- সুতরাং শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে সর্বাগ্রে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয়

সরকার বরাবর উদাসীন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির ষাট বছর পর শিক্ষায় কিছুটা বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে কেন্দ্রীয় বাজেটে। ত্রিপুরায় মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা বরাবর। এটা পিছিয়ে পড়াদের জন্য বিরাট সহায়।

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ডঃ অমর্ত সেন ভারতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন- ভারতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে নোবেল বিজয়ী ডাঃ মুহাম্মদ ইউনুস গ্রামীণ মহিলাদের স্বাবলম্বী করার জন্য অনু ঋণের ব্যবস্থা চালু করে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। ত্রিপুরায় স্ব-সহায়ক দল গঠনের মাধ্যমে বেকার দরিদ্র জনগণকে বিশেষ করে মহিলাদের স্বাবলম্বন করে তোলার মহৎ চেষ্টা হচ্ছে। নিশ্চয়ই সুফল আসবে।

এবারের মহিলা সম্মেলনের শুরুতে কিংবদন্তী কম্যুনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু সংসদে মহিলা বিল পাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মহিলা নেত্রীদের এ ব্যাপারে জোড়ালো তোড়জোড় করার আহ্বান জানিয়েছেন। এ সংক্রান্ত বিল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৯৯৮ সালেই সব সম্মতিতে গৃহীত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী সংকোচন নীতি উন্নয়নের পরিপন্থী। মহিলারা কাজ না পেলে স্ব-নির্ভর কিভাবে হবে? আর স্ব-নির্ভর কিভাবে হবে? আর স্ব-নির্ভর ও নিজস্ব আয় না থাকলে মহিলাদের উপর গার্হস্থ্য হিংসা কমবে না। তিনি বলেন- দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে- এ দাবি অনেকে উৎফুল্লভাবে করেন- কিন্তু এটা বুঝতে পারছেন না এর সুফল দেশের আপামর জনগণের নিকট পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

১ নভেম্বর ২২টি রাজ্যের প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি নিয়ে সম্মেলন শুরু হয়েছিল। সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন সাংসদ, পলিটব্যুরোর সদস্যা এবং সারা ভারত মহিলা সমিতির সহ-সভাপতি বৃন্দা কারাত। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেন এবং পাশাপাশি বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে মহিলা আন্দোলনের বিকাশ জড়িত রয়েছে বলেন। ভারতে ৭০ কোটি মানুষ দৈনিক ২০ টাকার কম আয় নিয়ে বেঁচে আছেন। যে পরিবারের দৈনিক আয় কুড়ি টাকার কম সে পরিবারে মহিলারা আরো বেশি বিপন্ন- তাদের কোন প্রকার অধিকার অর্জনের উপায় নেই। তিনি আরো বলেন সংসদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিল অবিলম্বে পাশ করতে হবে। আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত আইন কার্যকর করা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্বার্থে মাইক্রোফিনান্স বিল প্রত্যাহার করতে হবে। তিনি জানতে চেয়েছেন ১৯৯৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ৪০ লক্ষ কন্যা ভ্রূণ হত্যা হয়েছে—এ দুষ্কর্মের জন্য ক'জন ডাক্তার শাস্তি পেয়েছেন? কন্যা ভ্রূণ হত্যা এবং শিশু ও কিশোরীদের উপর যৌন অত্যাচার বন্ধে রাজ্য সরকারগুলির নিকট কঠোর আইন প্রয়োগের দাবি রাখেন।

জ্যোতি বসু স্বাগত ভাষণে সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের উপর জোর দিয়েছেন মহিলাদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। কারণ সংবিধানে সমান অধিকার দেওয়া হলেও বাস্তবে তাঁরা

বঞ্চিত। মহাকাশ অভিযান, খেলাধুলা, পড়াশোনা, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পারদর্শিতার নজির রাখলেও সমাজে এঁরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। সমাজের অর্ধেক অংশকে পিছিয়ে রেখে সমাজ অগ্রসর হতে পারে না। শুধু মহিলা সংগঠন নয়, রাজনৈতিক দলগুলোকে এ ব্যাপারে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে বলে জ্যোতি বসু মনে করেন।

ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবাংলায় মহিলাগণ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পৌরসভাতে বেশ দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। এক-তৃতীয়াংশের উপর আসনে জয়ী হয়ে ভালোভাবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন- এটা নিঃসন্দেহে মহিলাদের অধিকার অর্জনের একটা ইতিবাচক দিক। নারীদের উত্তরোত্তর অধিকার আদায়ের ধারা বজায় থাকুক এবং পরবর্তী নারী সম্মেলনগুলি আরো জোরালোভাবে অনুষ্ঠিত হোক।

দৈনিক আরোহণ— বুধবার, ২১ নভেম্বর, ২০০৭ইং

ভুবনবিজয়ী অধ্যাপক নোয়াম চমস্কির বার্তা পশ্চিম বাংলার বুদ্ধিজীবী মহল মেনে নেবেন

পশ্চিম বাংলার নন্দীগ্রাম ইস্যুকে কেন্দ্র করে ওখানকার বুদ্ধিজীবী সমাজে যে ফাটল দেখা দিয়েছে তা উদ্বেগের। সুস্থ সংস্কৃতির ধারক বাহক মধ্যবিত্ত শ্রেণী,আর এতে নেতৃত্ব দেন বা পথ প্রদর্শন করেন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। পশ্চিমবাংলায় বিগত তিন দশকের উপর বাম শাসনের ছত্রছায়ায় গণতান্ত্রিক পরিমন্ডল সৃষ্টি হয়েছে। সবাই যাতে সুখে ও শান্তিতে ও স্বস্তিতে বসবাস করতে পারে তার ব্যবস্থা। দলমতের উর্দ্ধে থেকে মানবতার পূজারী বুদ্ধিজীবীগণ। তাই তো উনারা সবার আস্থা ভাজন,সবার পূজারী। সমাজকে সঠিকপথে পরিচালনার দায়ভার তাঁদেরই। নিন্দার ঘটনায় একবাক্যে নিন্দা করা,আর প্রশংসার ঘটনাকে স্বাগত জানানো।

এই বুদ্ধিজীবী সমাজের মধ্যে কেউ কেউ যদি অসহিষ্ণু হয়ে উঠেন বা সঠিক চিন্তা থেকে কিঞ্চিৎ বিচ্যুত হয়ে পড়েন তবে তাঁদের ঠিক লাইন ধরিয়ে দেবার দায়িত্ব কিন্তু অধিকতর বুদ্ধিজীবীদের। একই মা-বাবার পাঁচটি সন্তান যোগ্যতায় সমান থাকে না, হাতের পাঁচটি আঙুলের দৈর্ঘ্য সমান নয়। একটি ক্ষতকে অনবরত খোঁচালে ক্ষত বাড়তেই থাকে—নিরাময়ের সুযোগ থাকেনা। খোঁচাখুঁচি বন্ধ করে ক্ষত শুকানোর দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার সবাই একজোট হয়ে। কিন্তু এ সহজ সাধারণ কথটা বড় বড় মাথাওয়ালাগণ বুঝতে চাইছেন না। আসলে তাঁরা জেগে ঘুমিয়ে আছেন নিজস্ব ভাবনায় বিভোর হয়ে।

গণতান্ত্রিক দেশে শুভবুদ্ধির ফেরিওয়ালা যদি শুধু মার্কামারা বামপন্থীদেরই হতে হয়—তবে তা পরিতাপের। সরকার বলতে কী বুঝায়? কিছু সংখ্যক ব্যক্তি মিলে সরকার গঠন করেন—এঁরা অধিকাংশ জনগণের প্রতিনিধি। আর যখন কাজ করেন তখন সংখ্যা গুরু ও সংখ্যা লঘু সকল অংশের মানুষের জন্যই করেন। ভোটের সময় যে সংখ্যালঘুরা সমর্থন দেননা তাদের সর্বাঙ্গীন সাধ্যমত সেবা দিতেও সরকার বাধ্য থাকে—এটাই স্বাভাবিক।

আর সংকীর্ণ বিরোধী রাজনীতি,অশুভ তৎকালীন জোট, দূরদর্শিতার অভাব যা সকল অংশের মানুবর স্বার্থের পরিপন্থী। চটকধারী কথাবার্তা চটকধারী রাজনীতি শুধু উত্তেজনা ছড়ায় এবং মিডিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে আসা যায়। চক্‌চক্ করলেই সোনা হয় না—একথা সবাই জানেন-তবু কি মানুষ বিভ্রান্ত হননা? আর বিভ্রান্ত হলে বা ভুল করলে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে। ছোট্ট একক পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়। সাময়িক উত্তেজনা বাড়ে তারপর প্রশমিত হয়। নইলে তো আমরা কেউই বাঁচতে পারতাম না। পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবী মহলে যে বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে তাতে তাঁরাই সবচেয়ে বেশি অস্বস্তিতে পড়েছেন। কারো

কারোর লেখায় তাঁদের মনের অস্বস্তি প্রকাশ হচ্ছে—এটা ইতিবাচক দিক। এঁরাই নির্মাণের কাজ শুরু করেছেন। নিজ অভিমান নিয়ে বসে থাকলে লাভ হবেনা। এগিয়ে এসে হাত ধরলে অধিক আনন্দ হবে।

পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবীগণ যে পৃথিবীখ্যাত তা আবারও প্রমাণিত হল। কারণ নোয়াম চমস্কিসহ চৌদ্দজন ভুবন বিখ্যাত মানবতার ফেরিওয়ালা পশ্চিম বাংলার বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশে পত্র প্রেরণ করেছেন—যা জেনে আনন্দে হৃদয় ভরে গেল। এ চিঠির উপস্থিতি নিশ্চয়ই ওখানকার মানবতাবাদীদের মনে শক্তি সাহস জোগাবে। এগিয়ে এসে হাত ধরলে চলার পথ সুগম হবে। সাময়িক লজ্জা বা ক্ষোভ যা পুঞ্জিভূত হয়েছিল তা দূরে সরিয়ে রাখতে সমর্থ হবেন। স্বামী-স্ত্রীর বিভাজন,পিতাপুত্রের বিভাজন,ভায়ে-ভায়ে বিভাজন এক অসহনীয় অবস্থা।

নোয়াম চমস্কি একজন আমেরিকান নাগরিক। তিনি মূলত ভাষাতাত্ত্বিক। তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী গবেষণা হল 'জেনারেটিভ গ্রামাব','ইউনিভার্সেল গ্রামার'। তিনি 'ম্যাসাচুসেটস ইনস্টটিউট অব টেকনোলজি'র ভুবন বিখ্যাত অধ্যাপক। তবে বামপন্থী চিন্তানায়ক হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত। তিনি বর্তমান বিশ্বের চিন্তা চেতনার এক স্তম্ভ বিশেষ। আমেরিকার নাগরিক হয়ে আমেরিকায় বসবাস করে আমেরিকার বিদেশ নীতিকে যেভাবে সমালোচনা করেছেন তা অভূতপূর্ব এবং মহামহীনু বুশের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে শুরু করে। কাজেই নোয়াম চমস্কির চিঠি পশ্চিম বাংলার এসে পৌছেছে—এটা শুধু একটা চিঠি নয়। এর অন্তর্নিহিত অর্থ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি সাবধান বাণী পাঠিয়েছেন। তিনি চান না বুদ্ধিজীবীগণ দুভাগে ভাগ হয়ে যাক। আর এ যদি স্থায়ী হয় তবে উন্নয়নমূলক কাজ ছত্রখান হয়ে যাবে। বাংলার ও বাঙালির সমূহ বিপদ। বুদ্ধিজীবীগণ যে দুভাগ হয়েছেন তাঁদেব মধ্যে সেতু বন্ধনের শুভসূচনা তিনিই করে দিয়েছেন ধরে নিতে হবে।

তিনি জানেন সরকার ঘোষণা দিয়েছেন নন্দীগ্রামে ক্যামিকেল হাব হবে না। সুদুর আমেরিকা থেকে তিনি বুঝতে পারছেন নন্দীগ্রাম থেকে যাঁরা উৎখাত হয়েছিলেন তাঁরা ঘরে ফিরে আসছেন। ঘরদোর মেরামতি হচ্ছে সরকারি সহায়তায় ও নিজেদের তৎপরতায়। নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে। এটাই এখন জরুরী। বিশ্ববাসী দেখেছেন ইরাক কিভাবে ধ্বংসস্তূপে পবিণত হযেছে। ইরানকে কিভাবে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। আর বাংলা রামমোহন বিদ্যাসাগরের গৌরবে গৌরান্বিত হয়ে- বাম গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে আস্থাশীল। সেই বাঙালি বুদ্ধিজীবীগণ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল—কার লাভ? এ বার্তা নোয়াম চমস্কি পাঠিয়েছেন। কি ভয়ঙ্কর বিপদ আসবে সামনে। সুতরাং ভেদবুদ্ধি আশু ত্যাগ করা প্রয়োজন।

ত্রিপুরা দর্পণ— মঙ্গলবার, ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৭ইং

খোদ আমেরিকায় কর্মক্ষেত্রে যোগ্য নারীদের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান

পুরুষ ও নারীর সংখ্যাগত অনুপাত সমান নয়—এ বিষয়টা বরাবরই বুদ্ধিজীবীদের ভাবিয়ে তুলেছে। গড় আয়ু পূর্বের চেয়ে বেড়েছে—এটা স্বস্তির বিষয় সন্দেহ নেই। মেয়েরা শারীরিকভাবে দুর্বল—এছাড়া গঠনগত কারনে হীনমন্যতায় ভোগে।

মেয়েরা নানাভাবে বঞ্চনার শিকার হয়। পুরুষতান্ত্রিক বাঁধা,সামাজিক বাঁধা,ধর্মীয় বাঁধা, পারিবারিক বাঁধা—বাঁধার শেষ নেই। কোন অভিভাবক মেয়েকে একা ছাড়তে ভয় পান। সকল সময় পাহারায় রাখেন। একটু রাত হলে মেয়েরা শুধু নয় বয়স্ক মহিলাগণও চলাফেরা করতে ঠিক সাহস পাননা। কারণ রাস্তায় গুন্ডা,বদমায়েস ক্ষতি করতে পারে। মাতাল থাকতে পারে। গুন্ডা,বদমায়েস,মাতাল—এরা কিন্তু সমাজের পুরুষ শ্রেণী থেকেই সৃষ্টি হয়। এমনটা হয় না যে পুরুষেরা মেয়েদের ভয়ে রাস্তায় বেরুতে ইতস্ততঃ করে যা মেয়েদের অহরহই করতে হয়। স্বাভাবিক নিয়মে প্রত্যেক মেয়েরই জীবনে যৌবন আসে। এ সময় তাদের দেহমনের বিরাট পরিবর্তন হয়। গ্রামে ও শহরে তাদের সমস্যা ভিন্নতর। অনেক বয়স্ক মহিলাকে তাঁদের সংসারের প্রয়োজনে বা মেয়েকে টীচারের বাড়ি থেকে আনতে রাত করে ঘর থেকে বেরুতে হয়। দুরু দুরু বুকেই তাঁদের চলাফেরা করতে হয়।

কিশোরী বয়স থেকেই শুরু হয় মেয়েদের নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হওয়া। কখনো বাড়িতে খুব কাছের পুরুষদের দ্বারা,নয়তো বাসে,ট্রেনে,অটোতে দৈনন্দিন চলাফেরায় বাইরের অপরিচিত পুরুষদের দ্বারা যৌন লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। অযাচিতভাবে কথা বলা, টিটকিরি দেওয়া,গা ঘেঁষে দাঁড়ানো, বাজে অঙ্গভঙ্গি করা,শিস্ দেওয়া, কু-মতলবে থাকা, কু-প্রস্তাব দেওয়া ইত্যাদি। সমাজের পুরুষদের মেয়েদের যৌন লাঞ্ছিত করার অধিকারটা কে দিল? আইন,আদালত,মহিলা কমিশনে বিষয়গুলি উত্থাপিত হচ্ছে—কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপরাধীর শাস্তি হচ্ছে।

গৃহরূপ প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন মহিলাগণ। গৃহে প্রাণ প্রতিষ্ঠায় যে ধরনের ও যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয় তা হিসেবে আসেনা। সম্প্রতি ইংলন্ডের যুবরাজ চার্লস স্বীকার করেছেন দেখে ভাল লাগল যে পুরুষদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মহিলাগণ অধিকতর সাবধানী। এ সত্যটা একজন বিশিষ্ট পুরুষ অন্তত স্বীকার করেছেন।

সৌন্দর্যচর্চায় ও সৌন্দর্যবোধের মাপকাঠিতে মেয়েদের তন্বী হতে হবে। মেয়েরা এমনিতেই কম আহার করে তার উপর এসব ভাবধারা তাদের পেয়ে বসেছে। হার বের করা শরীরই

তাদের কাম্য। তাতে ওরা ক্ষীণবল হয়ে পড়ছে—এদিকে লক্ষ্য থাকছেনা। অপরদিকে যুবকরা সুঠাম দেহের অধিকারী—হওয়াটাই কাম্য এবং সেভাবে তারা গঠিত হচ্ছে।

পোষাকের আষাকে মেয়েরা পুরুষদের ইচ্ছার দ্বারা চালিত হচ্ছে। অবস্থার গভীরে না গিয়ে হাল্কাভাবে দেখছে এবং চলছে। মেয়েরা যেহেতু পণ্যে পরিণত হয়েছে কাজেই তাদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত। অনেক মেয়েই নিজের মূল্য বোঝেনা। নিজেকে দেখানো বাক্সের (Show case) জিনিসভাবে এবং সেভাবে নিজেকে রাখে। নখ বড় করে নখে ঠোঁটে রঙ মেখে সঙ্ সেজে থাকে। ভুরু তোলা তো শরীরের ক্ষতি ও কষ্টদায়ক। তবু তা করে চলেছে। শরীরকে নমনীয় কমনীয় করে তোলার জন্য বিউটি পার্লারে বিভিন্ন ধরনের কষ্টদায়ক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে।

বালিকাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা,কখনো খুন করে লাশ গুম করা—এগুলি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। পত্রিকায় প্রায় রোজই খবর হয়। ফুলের মতো নিষ্পাপ বালিকাকে ধর্ষণ করা—এ যে কত বড় পাষণ্ডের কাজ! বিকৃত যৌন লালসা,কাম ক্রোধ মানুষকে হিংস্র পশুত্বে পর্যবসিত করে। বনের পশুদেরও দয়ামায়া ও বাৎসল্য রসের প্রয়োগ মানব সন্তানের প্রতি মাঝে মাঝে শোনা যায়।

কানীন সন্তান নিয়ে মেয়েরা বিব্রত হয়। সমাজের কাছ থেকে সহানুভূতি পায়না। পরিবারও পাশে থাকেনা—তাই সন্তানকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সন্তানের বাবার টিকির নাগাল পাওয়া যায়না। এসব ক্ষেত্রে মেয়েদের মুখ বুঁজে থাকা ঠিক নয়। প্রথম থেকেই দৌড়ঝাঁপ শুরু করা দরকার। অন্তত পিতৃপরিচয় নিয়ে যাতে শিশুটি জন্মাতে পারে। পিতামাতা পরিবার মেয়ের পাশে থাকবে। মেয়েরা অবশ্যই সাবধানী হবে। যে কোন ধরনের বিপদের সম্মুখীন হবার উপক্রম হলে মা বাবাকে জানাতে হবে। সমস্যার সমাধান না হবার কোন কারণ নেই। সময় থাকতে জানাতে হবে।

আগরতলা দুর্গাচৌমোহনীর জনৈকা ছাত্রী পুনেতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় তার বাবাকে জানায়—পুনেতে তার জীবন একটি সিন্ধি যুবকের দ্বারা বিপন্ন। বাবা রাজ্য প্রশাসনকে জানান। রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপে মুম্বাই পুলিশ সমস্যার সুরাহা করেন। মেয়েটি সময়মত না জানালে ঘটনা বহুদূর গড়াতে পারত।

অনেক মেয়ে শিক্ষিতা হয়ে আলোকপ্রাপ্তা হয়ে ভালভাবে জীবন শুরু করে—কিন্তু অন্ধকার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে ঘটে জীবনে নানা বিড়ম্বনা। কখনও ঘটে চরম পরিণতি। মিডিয়ার দৌলতে খ্যাতির নেশায় বহু মেয়ে ঝামেলার জড়িয়ে যায়। জীবনের জট আর খুলতে পারেনা।

হরিয়ানাতে এমনিতেই মেয়েদের নানাভাবে অবহেলার চোখে দেখা হয় তুলনায় একটু বেশি। গত লোক গণনায় দেখা যায় প্রতি এক হাজার পুরুষে ৮৬১ জন নারী। অবধারিতভাবে

হরিণায় পাত্রী সংকট দেখা দিয়েছে। ভিন্‌রাজ্য থেকে নানা কৌশলে চলছে পাত্রী জোগাড় করার সস্তাদামে মেয়ে পাচার হচ্ছে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে। তারপর তাদের নিয়ে অমানসিক পরিশ্রম করানো হয়—আবার কখনও পতিতালয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায় ঝাড়খন্ডের আদিবাসী এলাকা থেকেই বিরাট সংখ্যক মেয়েকে কাজের লোভ দেখিয়ে এনে পতিতাবৃত্তি করানো হচ্ছে। মেয়েদের মা-বাবাকে হাজার খানেক টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট রাখা হয়।

গার্হস্থ্য হিংসা ভারতে দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। প্রতি ৮০ মিনিটে একজন মহিলার মৃত্যু হচ্ছে গার্হস্থ্য হিংসায়। পণের জন্য প্রতিদিন ১৮ জন মহিলার মৃত্যু হয়। ১৯৬১ সালে পণ নিষিদ্ধ আইন হয় এবং ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৮(এ) ধারা এবং ৩০৪ (বি) ধারা চালু সত্বেও অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি।

জেসিকা খুন ও কার্টুনিস্ট ইরফান খুনের মামলায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। সে জায়গায় মুম্বাই এর সুনীল মোরের বিচার নজির সৃষ্টি করেছে। মুম্বাই এর কনস্টেবল সুনীল মোরে ১৭ বছর বয়সী এক তরুণীকে মেরিন ড্রাইভ চৌকিতে ধর্ষণ করে। মাত্র ৬ মাসে দায়রা আদালতে বিচার কার্য শেষ হয়। ১২ বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও সেইসঙ্গে ৫ হাজার টাকা জরিমানা।

উন্নত দেশ বলে গর্বিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায় মহিলাগণ শিশু ও জন্মকালীন বৈতনিক ছুটি পাননা। অবৈতনিক ছুটি অস্ট্রেলিয়ায় এক বছর ও যুক্তরাষ্ট্রে ১২ সপ্তাহ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৪ সালের পর থেকে কর্মক্ষেত্রে যোগ্যনারীদের অংশগ্রহণ পূববর্তী নারীদের চেয়ে কমেছে। ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রে একটি নারীকর্মীবিহীন সমাজ ব্যবস্থা আস্তে আস্তে গড়ে উঠবে।

চতুর্দিকে মরুভূমির হাহাকারের মধ্যে ওয়েসিস (Oasis) এর মত একটি হল দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ যা আদ্যপীঠ নামে অধিক পরিচিত। এখানে প্রায় ৪৫০ জন আশ্রমিক আছেন। এরা জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের ঢেউয়ে আশ্রমে স্থান পেয়েছেন। গৃহী জীবন ফেলে আশ্রমবাসী হয়েছেন। কারোর কারোর চল্লিশ বছর এখানে অতিক্রান্ত হয়েছে। এদের প্রত্যেকের ভোটের সচিত্র পরিচয় পত্র আছে। অভিভাবকদের নামের জায়গায় লেখা রয়েছে—অন্নদা ঠাকুর। এরা ভোট দেবে কামারহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে। আশ্রমিক গণের বক্তব্য যিনি দেখভাল করেছেন তিনিই তো অভিভাবক। আর এই অন্নদা ঠাকুরই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনেরও কোন আপত্তি নেই।

রাষ্ট্রসংঘের নারী উন্নয়ন পর্ষদের আর্থিক সহযোগিতায় সিরিয়ার সরকার পরিচালিত General Union of woman organisation সম্প্রতি এক সমীক্ষা প্রকাশ করে। তাতে দেখা যায় প্রতি চারজন বিবাহিত নারীর একজন পিতা বা স্বামীর দ্বারা নির্যাতিতা। এই সমীক্ষার ফলে সিরিয়ার নারী নির্যাতনের গভীরতা,প্রকৃতি ও পরিধি জনসমক্ষে প্রকাশ পেয়েছে।

ত্রিপুরা দর্পণ— সোমবার, ১লা মে, ২০০৬ইং

সমাজের স্বার্থে সমাজের দুষ্ট ক্ষত সারাতে হবে

শিশু আদরে শাসনে বেড়ে ওঠে। আস্তে আস্তে মানুষ হয়। সমাজে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যার যার কর্মক্ষমতার নিরিখেই তার তার প্রতিষ্ঠা। উপযুক্ত বয়স হলে প্রাকৃতিক নিয়মেই পুরুষরা বীর্যবান এবং নারীরা ঋতুবতী হয়। কর্মক্ষমতা বাড়ে। সেই ক্ষমতাটাকে যারা কাজে লাগায় তারা অনেককিছু করতে পারে। মানবশক্তি সম্পদে রূপান্তরিত হয় যখন তাকে সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করা যায়। সমাজ তাদের থেকে বহু কিছু পায়।

যৌবনে মনে জোয়ার আসে। জোয়াবের জলস্ফীতিতে কেউ তলিয়ে যায়,আবার কেউ ভেসে ওঠে। অনেক পুরুষ উশৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে থাকে। জীবনের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ অনুভব করতে চায়। নতুনের অভিজ্ঞতা পেতে গিয়ে পাঁকে ডুবে যায়। পিঁপড়া যেমন চিনির রস চাটতে গিযে রসে ডুবে যায়—আর উঠে আসতে পারেনা।

জীবনে যৌন সংসর্গ লাভ করা স্বাভাবিক নিয়মে হওয়া দরকার। আমাদের সমাজে স্বীকৃত যে বিধান বা ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ বিয়ের মাধ্যমে। সেটা হবে সময় সুযোগ মতো—খুব যত্ন সহকারে ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হবে সে পরম লগ্নের জন্য। এক অভিজ্ঞ শিল্পী যেভাবে তাঁর কল্পনাকে বাস্তব রূপ দেন। বিয়ের পর নতুন জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীকে নিয়ে যৌবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের শিল্প সাধনা। অত্যন্ত ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার ভিতর নিয়ে।

একজন নারী তার স্বামী বা শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে স্বপ্ন দেখে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তা সে পায়। শ্বশুর বাড়িতে সাদরে গৃহীত হয়ে সুখ আহ্লাদে জীবন ভরে ওঠে। শ্বশুর বাড়ির লোকজন নববধুকে পেয়ে তাদের মন আনন্দে উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হয়। আর নব বধূ তার নবনব রূপে থেকে শ্বশুর বাড়ির মুখ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু সমাজের এই স্বাভাবিক নিয়মে কিছু কিছু ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে কিছু কিছু লোক। তারা সমাজের স্বাভাবিক বিধি বিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এক পৈশাচিক সম্পর্কের মাধ্যমে আনন্দ পেতে চায়। অবশ্য এর মূল নিহিত আছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে। সামন্ত প্রথা উচ্ছেদ হলেও এর কিছু কিছু কুফল এখনও নির্মূল হয়নি। তাতে সোনার সংসার গড়ে ওঠার সুযোগ হয়না। নতুবা গড়ে ওঠা সোনার সংসার ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। এই না হলে পতিতালয়গুলি টিকে আছে কি করে? এখানে এত দেহ পসারিণীর যোগান কোথা থেকে হয়? মেয়েরা

বিভিন্ন ধরনের অসহায়তার কারনে এ বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়। দারিদ্র এর প্রধান কারণ। মানুষের জীবনের প্রথম এবং প্রধান চাহিদা খাদ্য। এই খাদ্য যদি কারোর না জুটে তখন সে কোথায় কোন চোরা স্রোতে গিয়ে পড়বে তার কোন ঠিক ঠিকানা থাকেনা।

দ্বিতীয়ত,ভাগ্য বিপর্যয়। এর ফলে বহু মেয়ে নরকগামী হয়। বেশ্যাবাড়ির মেয়েগুলির অবস্থা কি অবর্ণনীয়! এরা প্রত্যেক এ বৃত্ত থেকে পালাতে চায়,কিন্তু পথ খুঁজে পায় না। মেয়ে পাচার চক্রের কথা প্রায়ই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মেয়ে পাচারের সমস্যা আর্ন্তজাতিক স্তরের সমস্যা। মানুষ যেন তেন প্রকারে টাকা রোজগারে মশগুল। রাষ্ট্রসংঘের হিসেবে শ্রীলঙ্কায় প্রতি বছর কয়েক হাজার কিশোরীকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করা হয়। স্থানীয়দের পাশাপাশি বিদেশি পর্যটকরাও এ ব্যবসাকে ফুলেফেঁপে ওঠতে সহায়তা করছে। শ্রীলঙ্কার কিশোরী পতিতাবৃত্তিকে ঠেকানোর জন্য জাতি সংঘ দু'বৎসর মেয়াদী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এ কাজে পাঁচ লাখ ডলার খরচ হবে। বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন সংবাদপত্রে সতর্কীকরণ বিজ্ঞাপন,ভিডিও প্রদর্শন,পুস্তিকা বিতরণ ইত্যাদি।

এখন কথা হল জাতিপুঞ্জ যদি পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে তবে দেশের নির্বাচিত জনপ্রিয় সরকারেরও তা করতে পারার কথা। আর এই পতিতাবৃত্তিকে কেন্দ্র করে বর্তমান শতাব্দির সবচেয়ে বড় যে ধমক তা হল এইড্স। এই রোগের মূল ব্যাপ্তি এখান থেকেই। এই মারণ রোগ পৃথিবীর সভ্যতাকে গ্রাস করতে চলেছে। তারপর তাদের সন্তান সন্তদিদের সামাজিক অবস্থান নির্ণয় একটা সমস্যা। এরা সমাজের চোখে কিভাবে বেড়ে ওঠেছে। তাতে সমাজ কিভাবে কলুষিত হচ্ছে তা ভাবার বিষয়।

পতিতালয়কে কেন্দ্র করে বহুলোক বেঁচে বর্তে আছে। রক্ষণাবেক্ষণে,দালালি কার্যে, মেয়ে-কিশোরী-যুবতী পাচারে। একের দেখাদেখি অপরে উৎসাহিত হয়। এ ব্যাপারটা শারীরিক ব্যাধির পাশাপাশি সামাজিক ব্যাধি সৃষ্টি করে চলেছে।

ভারতবর্ষে পতিতাবৃত্তি নিরোধ আইন ১৯৫৬ সালে পাশ হয়। ১৯৭৮ এবং ১৯৮৬ সালে তা সংশোধিত হয়। এই আইন অনুসারে দেহব্যবসা বা অন্য কোন যৌন অপরাধের উদ্দেশ্যে কোন নারী বা অপ্রাপ্তা বয়স্কা কন্যা সন্তানের ক্রয় বা বিক্রয় একটি অপরাধ। পতিতালয় পরিচালনা করা বা পতিতালয় থেকে অর্থ উপার্জন করা এই আইন অনুসারে দন্ডনীয় অপরাধ।

সমাজকে কলুষমুক্ত করার জন্য এই আইনটির যথাযথ প্রয়োগ হওয়া দরকার। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে উদ্যোগ নিয়ে এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে পারলে ভালো হত। আলাপ আলোচনারমাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার। ঘটা করে 'বিশ্ব এইড্স দিবস' পালিত হয়। তাতে বিশেষ কোন লাভ হচ্ছে বলে মনে হয়না। পাশাপাশি 'বারবনিতা ও পতিতালয় নির্মূলকরণ দিবস' পালিত হোক প্রতিবৎসর। বারবনিতাদের আস্তে আস্তে

জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা দরকার। নতুন করে আর যেন কেউ এ পেশায় না যায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। দুস্থ বা অনাথ মেয়েদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে আরো হোক না—এরা যেন ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়ে অভিশপ্ত এ পেশায় জড়িয়ে না যায়। জীবনের অসহায়তার সুযোগে সুযোগ সন্ধানীরা তাদের কব্জা করে। প্রায়ই পত্রিকায় দেখি পুলিশ মেয়ে পাচারকারীদের ধরপাকড় করে কিশোরীদের উদ্ধার করে। মেয়ে পাচারকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার।

ইদানিংকালে বহু ক্লাব বা সংস্থা গণ বিবাহের ব্যবস্থা করছে। দুস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েদের এক সূত্রে গেঁথে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে দিচ্ছে। গণ্যমান্য ব্যক্তির সামনে অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। কাজেই গণ বিবাহের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। দুস্থ পরিবারের মেয়েদের সামাজিক সংস্থায় বিয়ের জন্য নাম নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা গড়ে ওঠলে মন্দ হয়না। তাহলে আর কাজ পাইয়ে দেবার ছলনায় বা বিয়ের প্রলোভনে দুস্থ পরিবারের মেয়েদের প্রতারিত হতে হবেনা। সামাজিক সংস্থাগুলি আরও তৎপর হয়ে খোলামেলা মন নিয়ে এগিয়ে আসলে ভাল হয়।

মুম্বাই এর 'বার ডান্সার'দের নিষিদ্ধ করেও আবার তাদের আন্দোলনের চাপের কাছে মহারাষ্ট্র সরকারকে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। পেটের ভাত রোজগারের প্রশ্নে সেন্টিমেন্ট সৃষ্টি হয়। দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী অন্ধকার নগরীতে রূপান্তরিত হবার আর বোধ হয় বেশিদিন বাকি নেই। পাশাপাশি অন্যান্য শহরগুলিও পিছপা নয়। 'কল গার্ল' বা 'প্লে বয়'—একথাগুলি বেশ চালু শব্দ। সাধারণ বাড়িঘরে কি হয় তা ঘরের ফাঁকফোকর দিয়ে অনুমান করা যায়। কিন্তু বৃহৎ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অট্টালিকায় কী ঘটছে তা অনুমান করতে বা বলতে একটু বেগ পেতে হয়।

দৈনিক আরোহণ— শুক্রবার, ১লা সেপ্টেম্বর, ২০০৬ইং

মানুষের বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় ধর্মের কূপমণ্ডূকতা

খ্রীস্টান ধর্মের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই এ ধর্মের গোঁড়ামি প্রচন্ডভাবে দর্শন, বিজ্ঞান, স্বাধীনচিন্তা বা গবেষণার কাজ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। অত্যাচারী রাজাগণ চার্চের সহাতায় আরও বেশি অত্যাচার করার সুযোগ পেত।

Inquisition বা যাজকীয় আদালত কত মানুষকে যে হত্যা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। যাজকীয় আদালতের বিচারে ইটালীর বিখ্যাত দার্শনিক ব্রুনো সাত বৎসর কারারুদ্ধ ছিলেন এবং শেষকালে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়। জগতের কেন্দ্র সূর্য একথা বলার জন্য গ্যালিলিওকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। জেনেভায় বৈজ্ঞানিক সার্ভেটসকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে চার্চ নির্যাতনের যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। রাশিয়ার জার ও স্পেনের রাজতন্ত্র প্রজাদের উপর যে অত্যাচার চালিয়েছিল—এর প্রশ্রয় পেয়েছিল চার্চ থেকে। দেড়শত বৎসর পূর্বে জার্মানিতে যখন রাস্তায় প্রথম গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা করা হয় তখন পাদ্রীগণ এর ঘোরতর আপত্তি জানায়। কারণ রাতকে দিন করে তুললে ভগবানের বিধানের বিরোধিতা করা হয়।

অপকর্মের দোহাই দিয়ে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের প্রায় দশ হাজার লোককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় ফরাসী দেশে ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে। প্রেটেস্টান্টদের অনন্তকাল নরকে দগ্ধ হতে হবে—এ অপযুক্তিতে স্পেনের প্রায় ত্রিশ হাজার ব্যক্তিকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। খ্রীস্টানধর্মের সংকীর্ণতার জন্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়না। তাই কিছু মানুষ জীবন থেকে ধর্মকে বাদ দিতে চেয়েছে—আর এভাবে নাস্তিকতার সৃষ্টি হয়েছে পাশ্চাত্যদেশে। বিজ্ঞান ও নাস্তিকতা মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে একটা স্তরে, কিন্তু শান্তি আসেনি।

আবার কেউ কেউ ভগবানকে বাদ দিয়ে ধর্মকে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে ভগবানের পরিবর্তে মানুষই হবে উপাস্য দেবতা—এ মতবাদই মানবতাবাদ নামে পরিচিত। এ কারনেই পাশ্চাত্যে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। বৌদ্ধধর্মের উচ্চ ও উদারনীতি এবং ভগবানের পরিকল্পনা না থাকায় বিজ্ঞানের সাথে এর কোন বিরোধের সম্ভাবনা নেই। বৌদ্ধধর্মের উদারতা, মানবতাবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ—এসব খ্রীস্টানধর্মের সংকীর্ণতাকে রোধ করতে পারেনি। খ্রীস্টান ধর্মের প্রসারের জন্য বেহায়ার মতো প্রচার করেই চলেছে। ভবিষ্যতে কি ঘটবে ?—এ প্রশ্নের উত্তর ভগবান জানেন—কারণ তিনি সবকিছু বোঝেন, জানেন এবং দেখেন। ভগবান বলেছেন যিশু অতি শীঘ্রই পৃথিবীতে আবার আসবেন তাঁর শিষ্যদের জন্য। যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তারা চিরকাল

তাঁর সান্নিধ্যে থাকবে। আর যারা তাঁকে বিশ্বাস করে না তাদের তিনি ত্যাগ করবেন। যিশু কবে আসবেন—এটা কারোর জানা নেই। তিনি আজও আসতে পারেন। তিনি আসার পূর্বেই প্রত্যেকের তাঁকে বিশ্বাস করা উচিত। আর এ মুহূর্তে তাঁকে বিশ্বাস করতে আপত্তি কোথায়? ভবিষ্যতে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটবে—সাদা সিংহাসনের বিচার। যারা তাঁকে বিশ্বাস করবেনা বা মুক্তিদাতা ভাববেনা তাদের সাদা সিংহাসনের বিচারে নরকে পাঠানো হবে। আর যারা তাঁকে বিশ্বাস করবে তারা স্বর্গে সুখে শান্তিতে বাস করবে। খ্রীস্টধর্মের প্রচারকগণ এ সমস্ত আবেদন নিয়ে যদি সাধারণ দরিদ্র,অশিক্ষত,লোকেদের নিকট হাজির হয় তবে ওরা ভয়ে ভীত হয়ে পড়বে। সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করতে পারলে—খুব ভাল হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য,চরিত্র গঠন—এসবের জন্য স্বাগত। তলে তলে ভয় দেখিয়ে ধর্মান্তকরণ এর কি প্রয়োজন? উদ্দেশ্য তো মানব কল্যাণ! নাকি ধর্মের প্রসার। গণতন্ত্র,জাতীয়তাবাদ,আন্তর্জাতিকতাবাদ ইত্যাদি ধ্যান ধারনাকে পেছনে ঠেলে এঁকে বেঁকে রাস্তা বের করে সামনে আসার উদ্দেশ্য তো একটাই খ্রীস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার। ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ এখানে সকল ধর্মের লোকের প্রতি আক্রমণ হলে এর নিন্দা হয়,প্রতিবাদ হয়। বুদ্ধিজীবীগণ কলম ধরেন। সরকারও নড়েচড়ে বসেন। খ্রীস্টান পাদ্রী গ্রাহাম স্টেইন্স ও তাঁর দুই শিশু পুত্রের হত্যার প্রতিবাদ হয়েছে,নিন্দা হয়েছে—আসামীর উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। কারণ এটা ভারতবর্ষ।

ত্রিপুরা দর্পণ— রবিবার, ২৫ জুন, ২০০৬ইং

শৈশব-কৈশোরের ভাললাগা-ভালবাসার স্মৃতি বড় মধুর

ভাললাগা ভালবাসার প্রসঙ্গে শৈশবে সঙ্গী সাথীর সঙ্গে রান্নাবাটি খেলার স্মৃতি সবার আগে মনের কোণে এসে ভিড় করে। সেটা খেলার প্রতি যেমন ভালবাসা ঠিক তেমনি সঙ্গী সাথীর সাহচর্য লাভের লোভ। দাঁড়িপাল্লার একদিকে রান্নাবাটি খেলা ও অন্যদিকে সঙ্গী সাথীদের তুললে দাঁড়িপাল্লার দন্ড বোধহয় ভূমির সাথে সমান্তরাল রেখায় অবস্থান করত। তারপর পুতুল খেলা,কিত্‌কিত্‌ খেলা,জুটি বেঁধে দড়ি লাফানো—অনেক উপভোগ করেছি। আমার শৈশব কেটেছে কৃষ্ণনগর কদমতলায় নিত্যানন্দ সাহার বাড়িতে। উনার ছেলে মেয়ে শিখা ও উত্তম আমার খেলার প্রধান সাথী ছিল। এছাড়া আরও অনেকে জুটে যেত। তাদের নাম মনে করতে পারছিনা। বাড়ির পূব দিকে ছিল বিশাল মাঠ আর ছোট বড় দু-তিনটি পুকুর। সেটা ষাটের দশকের গোড়ার কথা। বড় বড় আমগাছ,পুকুর ও পুকুর পাড়ে প্রচুর হাস খেলা করত ও রোদ পোহাত। আমাদের ছিল সাত আটটি রাজহাস। অন্যান্য দেশি হাসের মাঝে এদের রাজার মতোই দেখাত। মাঠে বসার একটা উঁচু জায়গা ছিল,সেখানে বিকেল হলে যে কত বসতাম তার ইয়ত্তা নেই। শীতের শেষে আমগাছে গুটি বাঁধত। পাগলা ঝড়ো হাওয়ায় গুটি ও আম ঝরে পড়ত। সেগুলি কাড়াকাড়ি করে কুড়োতাম—কি যে আনন্দ পেতাম এসবেব ভাষায় প্রকাশ করা যাবেনা। বড়রা 'দাইড়া-বান্ধ্যা' খেলার কোট তৈরি করে বাখত। ওরা অনেকে মিলে খেলত,হৈ চৈ ঝগড়াঝাটি হত, দূর থেকে দেখতাম। কখনও সখনো ওদের উপস্থিতি কম থাকলে আমাদের 'দাইড়া-বান্ধ্যা'খেলায় নিত।

কড়ি খেলা, লুডো খেলা, ষোলগুটি খেলা, চোর পুলিশ, ওয়ার্ড বিল্ডিং বিছানায় বসে দাদাদের সাথে প্রচুর খেলেছি। 'ওয়ার্ড বিল্ডিং' খেলাটা বাবা আমাদের শিখিয়েছিলেন। দাদাদের আকর্ষণের সাথে খেলার আকর্ষণ,সাথীদের আকর্ষণ—কোনটা কম আর কোনটা বেশি বলা মুশকিল। এখন ছেলে মেয়েরা সময় পায়না—আমরা প্রচুর সময় পেতাম। কারণ প্রাইভেট পড়ার বালাই ছিলনা,টিভির পেছনে সময় নষ্ট হতনা। কাজেই খেলার সাথী ইশারাতেই জুটে যেত। একটু বড় হয়ে নিত্যানন্দ সাহার ঠিক পেছনে যোগেন্দ্র ঘোষের বাড়িতে চলে আসি আমরা। তখন বিকেলে রাস্তায় একটু বেরিয়ে আসা একটা ভালবাসার বস্তু ছিল। এখনকার কিশোরীরা সে সময় বা ফুসরত পায়না। তাদের ছকে বাঁধা জীবন। তবে এখনকার মেয়েরা 'অল রাউন্ডার' হয়ে তৈরি হচ্ছে। আর আমাদের যে সংবেদনশীলতা ছিল তা কি এখনকার মেয়েদের বা ছেলেদের আছে?

অতি শৈশবে মাতৃ বিয়োগ হওয়ায় মা-র প্রতি প্রত্যক্ষ ভালবাসা বা টান অনুভব এর অভিজ্ঞতা নেই। তবে শূণ্যতা অনুভব করেছি। বাবার সঙ্গে দূরত্ব ছিল। বাবাকে সব কথা বলতে পারতাম না—ভয় হতো। দাদাদের সাথে সম্পর্ক ছিল অতি মধুর।এখনো দেখা হলে পুরনো অনুভূতির শিহরণ জাগে। মা-এর জন্য অনেক কেঁদেছি। বিশেষ করে পরীক্ষা যেদিন শেষ হতো সে রাত্রিতে মনে হতো আমি ভীষণ একা,বুকের ভেতরটা ফাঁকা—সেদিন আমার কান্না ছিল অবধারিত। বাবা অনেকক্ষণ কোলে নিয়ে বসে থাকতেন। বাল্যে এবং কৈশোরে এটা বেশি হয়েছে। পরেও মন খারাপ হতো—বিষন্ন মনেই থাকতাম। নিজের দুর্ভাগ্য ও বিষন্নতাকে অন্যের থেকে আলাদা করে রাখতে ভালবাসতাম। এটা করতে গিয়ে হয়তো আমি কিছুটা অর্ন্তমুখী হয়ে পড়েছি। সব জায়গায় সবার সাথে খোলামেলা হতে পারিনা।

বাবার সাথে সম্পর্ক সহজ হয়েছে অনেক পরে—বিয়ের পর। তখন বুঝতে পেরেছি বাবা আমাকে কত ভালবাসতেন। আমার জন্য তাঁর মনের কত আকুতি। আমার দুঃখে তিনি দুঃখ পেতেন, আর সুখে শিশুর মতোই খুশি হতেন। বাবার খুশি মুখ, হাসি মুখ এর স্মৃতি আজও আমার প্রেরণার উৎস। বাবাকে হারিয়েছি ১৯৯২ সালের ৩১শে জুলাই—আমার জীবনের এক স্বাভাবিক ঝঞ্ঝাপূর্ণ সময়ে। আমি আমার সংসার নিয়ে টালমাটাল। বাবার মৃত্যুতে মনে হয়েছিল আমার জীবন বীণার প্রধান তারটি বুঝি ছিঁড়ে গেছে।

দৈনিক আরোহণ— বৃহস্পতিবার, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ইং

পরিবেশ দূষণ ও বনসৃজন

একটি জীবের চারপাশের প্রভাব বিস্তারকারী জৈব ও জড় উপাদানের সমষ্টিকে ঐ জীবের পরিবেশ বলে। পরিবেশকে তিনভাগে ভাগ করা হয়—ভৌত, জৈবিক এবং সামাজিক। ভৌত পরিবেশ তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত—শিলামন্ডল, বায়ুমন্ডল এবং জলমন্ডল। পৃথিবীর সকল বাস্তুতন্ত্রের উদ্ভিদ ও প্রাণীকে নিয়ে জৈবিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে। পৃথিবীতে জৈবিক পরিবেশ গড়ে উঠার শর্তগুলি হল—

১। উপযুক্ত তাপমাত্রা

২। বায়ুমন্ডলের উপস্থিতি

৩। জলের উপস্থিতি

৪। মাটির উপস্থিতি

৫। জীব ভূ-রাসায়নিক চক্র

সামাজিক পরিবেশ রচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে পরিবার। কতকগুলি পরিবার মিলে সমাজ সৃষ্টি হয়। কাজেই পরিবারের ধ্যান ধারণা,আদর্শ,বিশ্বাস,নৈতিকতা, মূল্যবোধ—এসব সমাজের উপর প্রভাব ফেলে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক যোগাযোগ,আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ব্যবস্থা,অধিকার ও ক্ষমতা স্থানীয় সমাজ গঠনে ভূমিকা নেয়।

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত মানুষ পরিবেশকে যথেচ্ছভাবে ভোগ করেছে। পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকের মধ্যে মানুষের মধ্যে চেতনার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে। যেকোন উন্নয়নমূলক কাজ পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলে। নগরায়ন,রাস্তাঘাট নির্মাণ,শিল্প স্থাপন,আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার পরিবেশের উপাদানগুলির উপর প্রভাব ফেলে বা পরিবর্তন করে। এর ফলে পৃথিবী পেল নানা প্রকার দূষণ ও কু-প্রভাবঃ -

১। বায়ু দূষণ

২। জল দূষণ

৩। ভূমি দূষণ

৪। শব্দ দূষণ

৫। তেজস্ক্রিয় দূষণ

৬। বিপজ্জনক বর্জ্য

৭। ওজোন স্তরের হ্রাস ও তার ভয়ঙ্কর প্রভাব

৮। গ্রীন হাউস প্রভাব

৯। গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইত্যাদি।

প্রকৃতি থেকে আমরা স্নিগ্ধ নির্মল বাতাস পাই। এই বাতাসের জন্যই পৃথিবীতে প্রাণের ধারা অক্ষুন্ন রয়েছে। তবে এই বাতাসের মধ্যে বিভিন্ন গ্যাস অক্সিজেন,নাইট্রোজেন,জলীয় বাষ্প,কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও ধূলিকণা মিশে রয়েছে। অক্সিজেন গ্যাস বায়ুমন্ডলের ওজোন স্তর সৃষ্টি করে। বায়ুমন্ডলের অক্সিজেন অণু O_2 সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে অপর একটি অক্সিজেন অণুর রাসায়নিক সংযোগে ওজোন গ্যাস O_3 তৈরি হয়। এই ওজোন স্তর ভূ-পৃষ্ঠের ১০ কিমি থেকে ৫০ কিমি পর্যন্ত একটি ফাঁপা গোলকের মতো পৃথিবীকে আবৃত করে রেখেছে। সূর্য থেকে বিকিরিত অতিবেগুনি রশ্মি যা সরাসরি পৃথিবীতে এসে পড়লে জীবকুলের ক্ষতি হতো—তা ওজোন স্তর ধরে রাখে। এই ওজোনস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে পৃথিবীতে অতিবেগুনি রশ্মি পড়ছে যা জীবজগতের পক্ষে ভযাবহ। ওজোন স্তরকে বিঘ্নিত করছে রঙ শিল্প ও প্লাস্টিক শিল্প—যা থেকে ক্লুরো ফ্লুরোকার্বন নির্গত হয়ে বায়ুমন্ডলের অতিবেগুনি রশ্মির সঙ্গে বিক্রিয়া করে হাইড্রোক্লোরিক গ্যাস এর অণু থেকে ক্লোরিন অণু তৈরি হয়। এই ক্লোরিন অণু আবার অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ভেঙ্গে গিয়ে ওজোনস্তরকে ধ্বংস করে। এইভাবেই ওজোনস্তরে প্রতিনিয়ত অবক্ষয়ের কাজ চলছে।

বায়ু দূষণের কারণ বায়ুমন্ডলে ক্রমশ কার্বন-ডাই-অক্সাইডএর পরিমাণ বৃদ্ধি। তাতে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। বনাঞ্চল ধ্বংস,বিভিন্ন শিল্প কর্ম,সমুদ্রদূষণ প্রভৃতি ভূ-পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করেই চলেছে। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে সালফার-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড,কার্বন-ডাই-অক্সাইড, পাহাড় পর্বতের ধূলিকণা,দাবানল প্রভৃতি থেকে বায়ু দূষণ হচ্ছে।

সালফার ডাই অক্সাইড দ্বারা মানুষের চোখ,নাক ও শ্বাসনালি আক্রান্ত হয়। উদ্ভিদেরও ক্ষতি হয়। যানবাহনের ধোঁয়ায় যে কার্বনমনোক্সাইড গ্যাস থাকে তা রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে মিশে রক্তের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়।

কিছু কিছু বিষাক্ত গ্যাস উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়াতেও ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। বিশ্বের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে ধোঁয়াশা এক বিরাট সমস্যা। নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড ফুসফুসে জ্বালার সৃষ্টি করে।

বায়ুমন্ডলের দূষণের প্রতিরোধ হিসাবে অনেকগুলি উপায় নির্দেশ করা হয়েছেঃ -

১। সারা বছর গাছে পাতা থাকে এমন প্রজাতির গাছ কলকারখানার আশপাশে ও রাস্তার পাশে রোপণ করতে হবে।

২। কাঠ,কয়লা ও খনিজতেল প্রভৃতি জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার না করে বিদ্যুৎ,খনিজ গ্যাস ও সৌরশক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত শক্তি ব্যবহার করলে বায়ুদূষণের মাত্রা কমবে।

৩। যানবাহন ও কলকারাখানায় উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্র ব্যবহারে দূষণের মাত্রা কমবে।

৪। কলকারখানা থেকে নির্গত গ্যাস বাতাসে ছাড়ার আগে যান্ত্রিক উপায়ে শোধন করা দরকার।

৬। বাতাসে জল ছিটিয়েও বাতাসকে কিছুটা দূষণমুক্ত রাখা যায়। তাতে অ্যামোনিয়া ও সালফার-ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে দূরীভূত করা যায়।

কেন্দ্রিয় সরকার আগামী ২০১২ সালের মধ্যে ভারতের এক তৃতীয়াংশ সবুজ চাদরে ঢাকার পরিকল্পনা নিয়েছে। তাতে খরচ হবে ৫৫ হাজার কোটি টাকা। ত্রিপুরায় বর্তমানে ৭৮ শতাংশ বন রয়েছে। তথাপি রাজ্যে প্রয়োজন মত বৃষ্টি হচ্ছেনা। তাই ভূগর্ভের জলস্তর নীচে নেমে গেছে। সুতরাং আরও বেশি বনসৃজন প্রয়োজন। জীবন জীবিকায়ও বন বিশেষ ভূমিকা পালন করছে ত্রিপুরায়। বিশেষজ্ঞরা অঙ্গন বন গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন। সার্বিক পরিবেশ রক্ষায় ফলবৃক্ষ রোপণের পরামর্শ দেওয়া হয়।

জুন-জুলাই বনমহোৎসবের মাস। তবে ত্রিপুরায় জুলাই মাসকেই বেছে নেওয়া হয়েছে বনসৃজনের জন্য। সারামাস ব্যাপী বিভিন্ন স্কুলে, অফিসে,ক্লাবে,সংস্থায় বন সৃজনের প্রয়াস চলে উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে। বৈজ্ঞানিকগণ বহু পূর্ব থেকেই গছের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভূমিকার কথা বলে আসছেন। গাছের গুরুত্ব কতখানি তা বুঝাবার চেষ্টা করছেন।

বৃক্ষরোপণের উল্লেখ হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদ ও শাস্ত্রগ্রন্থ মনুসংহিতায়ও পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগে ও মধ্যযুগে আনুষ্ঠানিকভাবে বৃক্ষরোপণ করা হয়। বৌদ্ধযুগেও গাছ লাগানো হত পথের দু'ধারে পথযাত্রীর ছায়ার জন্য, বিশ্রামের জন্য। ভারতবর্ষের প্রাচীন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মুনিঋষিগণ ও পন্ডিতগণ বৃক্ষের মাহাত্ম্য সর্ম্পকে ওয়াকিবহাল ছিলেন। বৃক্ষ থেকে গ্রাসাচ্ছাদন ও রোগের ওষুধ পাওয়া যেত। বৃক্ষের পত্রের বল্কলে রচিত হয়েছিল বেদগান। আর স্নেহ অঙ্কে পুষ্ট হয়েছিল ঋষির তপোবন।

আধুনিক ভারতবর্ষে আধুনিকতম পুরুষ রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বতীর্থ শান্তিনিকেতনে নৃত্যগীতের মাধ্যমে বনমহোৎসব এর সূচনা করেন। এরপর থেকে শান্তি নিকেতনে আশ্রমবাসীরা এ উৎসব পালন করে প্রতি বৎসর।

স্বাধীন ভারতে সরকারিভাবে প্রথম বনমহোৎসব পালিত হয় ১৯৫০ সালে। তারপর থেকে ভারতের সর্বত্রই তা পালন করা হয়। সামাজিক বনায়নের প্রকল্প গৃহীত হয়েছে—রাস্তা এবং রেললাইনের দুধারে গাছ লাগানো হয়।

বনমহোৎসব উপলক্ষে সরকারী বনবিভাগ ও কৃষিবিভাগ থেকে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন উদ্ভিদ উদ্যান থেকে উন্নতমানের গাছের চারা ও কলম বিক্রি করা হয়। 'গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান,একটি গাছ একটি প্রাণ'—শ্লোগানটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। বর্তমান মানব সভ্যতাকে বাঁচানোর জন্য পৃথিবীর সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য গাছ অপরিহার্য। এর কোন বিকল্প নেই।রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—

'মৃত্তিকার হে বীর সন্তান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকার দিতে
মুক্তিদান মরুর দারুণ দুর্গ হতে।'

দৈনিক আরোহণ— মঙ্গলবার, ৩১শে জুলাই, ২০০৭ইং

মীনাক্ষী সেন বন্দোপাধ্যায়ের ‘জেলের ভেতর জেল’ দ্বিতীয় পর্ব—একটি সমীক্ষা

মীনাক্ষী সেন বন্দোপাধ্যায়ের ‘জেলের ভেতর জেল’ গ্রন্থটি দুটি পর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম পর্ব পাগলাবাড়িকে কেন্দ্র করে। আর দ্বিতীয় পর্ব মূলতঃ মেয়াদী ও হাজতি নম্বরকে কেন্দ্র করে লিখা। লেখিকা প্রেসিডেন্সী জেলে চার বৎসর (১৯৭৩-৭৭) বন্দিনী ছিলেন। হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করার পর রাজনৈতিক মতাদর্শগত কারনে তার জেল হয়।

দ্বিতীয় পর্বে জেলখানার ভিতর বন্দী বিভিন্ন বয়সের শিশু,কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের,বৃদ্ধাদের কথা তুলে ধরা হয়েছে। কত নির্মমভাবে তাদের জীবন বিড়ম্বিত হয়েছে। লেখিকা প্রচন্ড পরিশ্রম করে নিষ্ঠার সঙ্গে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাদের জীবন কাহিনী উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হয়েছিলেন এই বইগুলি না পড়লে উপলব্ধি হবেনা।

বইটিতে ছোট ছোট গল্পের আকারে সত্যি কাহিনীগুলিকে সাজানো হয়েছে। এগুলি হল শংকর, শিশু উদ্যান, জাহান-আরা, চম্পারাণীর মরণবাঁচা, মিতাকথন, ম্যারিসফোর্ড, বিদ্যেসুন্দরীর বিচার, দুইনারী, দেশে দেশে দেশ হারা ১ এবং ২, লাভকেইস, খুনের মামলার বন্দিনীদের কথা, হাজতি নম্বর, কঙ্কন দীঘি এবং শেষ না হওয়া কথা—মোট পনেরটি গল্পের আকারে পরিবেশন করা হয়েছে।

শংকর ঃ

বই এর প্রথম কাহিনী আট বছরের শংকরের। সে মানা ক্যাম্পে থাকত (দন্ডকারণ্য)। মায়ের সাথে ট্রেনে উঠেছিল। ট্রেনের ভিড়ের জন্য ঠিক জায়গায়তে নামতে পারেনি। মা নেমে যান, আর ছোট শংকর রয়ে যায় ট্রেনে। এই হারিয়ে যাবার সুবাদে বা অপরাধে তার ঠাঁই হয়েছিল জেলখানায়, জেলখানায় বন্দী থেকে মা-বাবা-বোনের কথা মনে পড়ে। তাদের কথা ভাবতে ভাবতে সে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠে।

শিশু উদ্যান ঃ

এ গল্পে রয়েছে আব্বাস এর করুণ কাহিনী। স্থান কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলের মহিলা ওয়ার্ডের মেয়াদী নম্বর। আব্বাস বাঁদর খেলার পেছনে যেতে যেতে আর বাড়ি খুঁজে পায়নি। হারিয়ে যায়। তারপর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। আর স্থান হয় জেলখানায়। সে কেঁদেকেটে কতবার পুলিশকে বলেছে ওর বাড়ি তপসিয়ার কাচমসজিদের কাছে। কিন্তু কেউ ওকে বাড়ি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেনি।

হারিয়ে যাওয়া ছ'বৎসরের (৬) ছায়ার কথাও এখানে বর্ণিত হয়েছে। মায়ের সঙ্গে ট্রেনে যাচ্ছিল,কিন্তু নামতে পারেনি। তাই পুলিশ ও কোর্ট ঘুরে জেলে স্থান পেয়েছে। জেলখানার ভিতর শিশুদের নিয়ে বিকৃত যৌন খেলায় মেতে ওঠে বয়স্ক বন্দীরা। চার বছরের খুকুরও জায়গা হয়েছিল এই জেলেই। সেও জেল থেকে বেরিয়ে যেতে চায়—কিন্তু কে তাদের ইচ্ছের কথা শোনে।

জাহান-আরা ঃ

জাহান-আরা দশ বছরের বালিকা। তাকে তার বাবা নিরাপদ আশ্রয় ভেবে পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের ঘরে দিয়েছিল কাজ করার জন্য। সেখানে সে ঐ বৃদ্ধের বিকৃত যৌন লালসার শিকার হয়। তার গর্ভে ভ্রূণ বাড়তে থাকে। যথাসময়ে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে সে মা হয়। ধর্ষক এর প্রমাণ মেলা সাপেক্ষে তাকে জেলখানাতেই নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হল। এই শিশু মা তার সন্তানের প্রতি কোন টান অনুভব করেনি। তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতনা। সন্তানটি খাদ্যাভাবে ও অযত্নে মারা যায়। শেষমেশ জাহান-আরার আব্বা ও আম্মী এসে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

চম্পারাণীর মরণ-বাঁচা ঃ

চম্পার বাড়ি পূর্ববাংলায়। ওর বাবা তাকে পাঠায় পশ্চিম বাংলায় বিশ্বস্ত লোক মারফত। কলকাতায় পিসির বাড়িতে পৌঁছে দেবার কথা। কিন্তু বিশ্বস্ত লোকটি তাকে গণিকালয়ে নিয়ে পৌঁছে দিল। সে গ্রাম্য,অশিক্ষিত সোজা সরল মেয়ে। এসে পড়ল বেআব্রু লজ্জাহীন মেয়েদের দলে। গণিকালয়ের কুৎসিত জীবনযাপন তাকে কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। এখানে একদিন সে ইজ্জত বাঁচাতে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। শরীরের পেছনের অংশটা পুড়ে যায়। এরপর তাকে বিখ্যাত হাসপাতালে ভর্তি করা হয় চিকিৎসার জন্য। পতিতাপল্লীর লোকজন চম্পার উপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখত যাতে সে পালিয়ে যেতে না পারে।

মিতাকথন ঃ

মিতা কলকাতা শহরতলির এক উদ্বাস্তু কলোনীর মেয়ে। নীতা,মিতা,ছোট দুই বোন ও মা-বাবাসহ তাদের সংসার। মিতার বাবা প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। মিতার বয়স যখন চৌদ্দ বছর তখন তাদের বাবা মারা যান। নীতা-মিতা এরা বরাবর মেধাবী ছাত্রী ছিল। বাবার মৃত্যুর পর মিতা স্কুল ছেড়ে দেয়—তবে পড়া ছাড়েনি। চাকরি নেয় জ্যাম জেলি ও আচার তৈরির কারখানায়। মিতার দিদি নীতা সবসময় মিতার জন্য ভাবত কিভাবে কাজ করে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে। এত পরিশ্রম করা কি সম্ভব মিতার পক্ষে। তবে গর্ভধারিণী মা কিন্তু এতটা শঙ্কিত নন। একদিন কারখানা থেকে বাড়ি ফেরার পথে মিতা ধর্ষিতা হল। উঠতি মাস্তান বাহিনীর শিকার হল সে। সে রাতে তার আর বাড়ি ফেরা হয়নি। ভোরে রক্তাক্ত

ক্ষত-বিক্ষত দেহ সূর্যালোকে দেখতে পাওয়া গেল। পুলিশ আসে এবং আস্তানা হয় জেলখানায়। আর ধর্ষণকারীরা বেপাত্তা। বহাল তবিয়তে ঘুরে ফিরে আছে।

মহিলা ওয়ার্ডে আরও দু'জন রীণা এবং পুতুল এসে মিতার সঙ্গী হয়েছিল। পুতুল মনিবের বাড়ি থেকে দুটি পুরোনো শাড়ি চুরি করে পালিয়েছিল। আর রীণা কামার্ত যৌন অভিলাষ পূরণ করতে দেয়নি বলে পরদিন মিথ্যে চুরির দায়ে তাকে পুলিশ ধরে নিয়েছিল।

রীণা মিতা পুতুলের কয়েদী জীবনের নানা বিচিত্র দুর্বিষহ অবস্থা সুনিপুণভাবে লেখিকা বর্ণনা করেছেন—এগুলি পাঠে গা শিহরিয়া ওঠে।

মারিসফোর্ড ঃ

মারিসফোর্ড ফরাসী দেশের— উদ্দেশ্য সারা পৃথিবী ভ্রমণ। টাকা ফুরিয়ে যাওয়াতে ঝামেলায় পড়তে হয়। পাসপোর্টের মেয়াদ ও ভিসার সমস্যা দেখা দেয়। নেপাল,বাংলাদেশ ভ্রমণের পর ইন্ডিয়াতে ঢোকার পরই গ্রেপ্তার হলেন। তিনি প্রচন্ড বুদ্ধিমতী ও সপ্রতিভ। বিদেশিনী হওয়া সত্বেও গায়ে প্রহারের দাগগুলি বেশ জ্বল জ্বল করছিল। জেল সুপারের কাছেও কোন অভিযোগ করেনি। মারিস ইংরেজী জানতেন না—তাই ভাষাগত সমস্যা ছিল। ওঁর বিষয়টা একেবারেই হাল্কা ধরনের। তাই ওঁর এ ধরনের শাস্তি হওয়া উচিত হয়নি। ফরাসী রাষ্ট্রদূতকে জানানো হবে—এ আশ্বাস দিয়ে সুপার সাহেব চলে গেলেন। সুপার সাহেবকে এগিয়ে দিতে গেলেন মেট্রন সঙ্গে মীরা আরতিরা। এরপর মারিস সুপার সাহেব ও মেট্রনের নকল অভিনয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন। উনি যে বুদ্ধিমতী ও কৌতুক প্রিয় তার স্বাক্ষর রেখে দিলেন। ফরাসী রাষ্ট্রদূত তাঁকে ছাড়িয়ে নেবার বন্দোবস্ত করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল পৃথিবী দর্শন করা। ভারতে এসে তাঁর জেল হল এবং সঙ্গে নারকীয় অভিজ্ঞতা। তাঁকে অবশেষে ফ্রান্সে ফিরে যেতে হয়।

বিদ্যেসুন্দরীর বিচার ঃ

বিদ্যা ওরা দুই বোন। সে ছোট্ট। ওর পড়াশোনা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। ওর দিদির বিয়ে হয়। দিদির বাচ্চা প্রসবকালীন সময়ে বিদ্যার জাম্বু (জামাইবাবু) বিদ্যাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। দিদিকে হাসপাতালে দেখাতে নিয়ে যাবার ছলে তাকে দূরে এক ভাড়া বাসায় তুলে। তারপর সিঁদুর পরিয়ে দেয় এবং স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকতে শুরু করে। লম্পট ছেলেটি ওদের দোকানের ক্যাশবাক্স থেকে টাকা চুরি করে নিয়েছিল অর্থাৎ সবই পূর্ব থেকে পরিকল্পনা করা ছিল। ইতিমধ্যে বিদ্যা গর্ভবতী হয়ে যায়। টাকার প্রয়োজনে সে বাড়িতে ফেরে। ওর মা ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। ছেলের সঙ্গে ভিতরের ভাব গোপন রেখে স্বাভাবিকভাবে সব কথা জেনে নেয়—বিদ্যাকে নিয়ে এতদিন কোথায় ছিল ইত্যাদি। তারপর জানালেন যে ওর কোন আইনগত অধিকার নেই পারিবারিক ব্যবসায়। কারণ, তাকে তিনি ত্যাজ্য পুত্র করেছেন। তবে ছেলের

পরিত্যক্তা স্ত্রী ও নাতির পূর্ণ দায়ভার তিনি বহন করবেন। এদিকে তিনি সমস্ত সিদ্ধান্ত বিদ্যার বাবাকে জানিয়ে দিলেন।

এদিকে যথাসময়ে বিদ্যার পুত্রসন্তান জন্মাল। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পরদিনই পুলিশ বিদ্যা ও তার জাম্বুকে গ্রেপ্তার করে। বিদ্যার জাম্বু গ্রেপ্তার হল নাবালিকা অপহরণ ও ধর্ষণের দায়ে। কিন্তু বিদ্যার কেন জেলবাস হল এর পেছনে যে কি আইন ছিল জানা নেই। আর ওর সদ্য জন্মানো সন্তানকে জাম্বুর মা এসে নিয়ে গেল নাতির পরিচয় দিয়ে। বিদ্যার আশ্রয়স্থল হল জেলখানা। সঙ্গে জেলের ভেতরের নানা রকম যন্ত্রণা। ওর বাবা ওকে পরিত্যাগ করেছে। জেলখানার ভেতর বসে নানা কথা ওর মনে পড়ত। ওর বাবা ওকে বিদ্যেসুন্দরী বলে ডাকত। বাবার বড় আদরের ছিল ছোট্ট মেয়ে বিদ্যে। সখ ছিল ভাল করে বিয়ে থা দেবার। এসব কথা তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেত। কেইস শেষ হবার পর তাকে লিলুয়া হোমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর এদিকে ওর জাম্বুর কেইস তুলে দিয়েছেন ওর বাবা। তবে ওর মা ওকে ঢুকতে দেননি। তার আশ্রয় হয় শ্বশুরবাড়িতে। ঘর জামাই হয়ে থাকতে লাগল। এসব শুনে বিদ্যা মাথার সিঁদুর মুছে ফেলল। হাতের শাখা ভেঙ্গে ফেলল। সে বঞ্চনার শিকার হল। আর প্রকৃত অপরাধী জাম্বু স্ত্রী পুত্র নিয়ে ঘর সংসার করতে লাগল। পুরুষের (বাবার) বিধানে তার জীবন দুর্বিষহ হল। ওর অভিমান বাবার প্রতি। কিন্তু ওর বাবার চিন্তা চৈতন্যের ধারে কাছেও বিদ্যার অভিমানের ও বিপর্যয়ের ছোঁয়া প্রবেশ করেনি। অসহায় বালিকা অসহায় থেকে গেল।

<u>দুই নারী ঃ</u>

এ গল্পে দুই নারীর ভাগ্য বিড়ম্বনার কাহিনী লিখা হয়েছে। তাদের কাহিনী অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। একজন হাওড়ার শিবানীদি ও অপরজন নবদ্বীপের মাসী। জেলখানার ভেতর অন্যান্য বন্দীদের সাথে লেখিকা মীনাক্ষী সেনও তাদের এ নামেই ডাকতেন। মাসী খুনের প্রমাণ লোপাট করেছে বলে মামলা হয়েছে। প্রথমে নিম্ন আদালতে তারপর সরকারী খরচে হাইকোর্টে কেইস চলে আসে। অর্থাৎ মফঃস্বল থেকে চলে আসে মহানগরীর জেলখানায়। আর্থিক কারণে ভাল উকিল ধরতে পারেনি। তাই জামিন এর ব্যবস্থাও হয়নি। আশায় আছে হাইকোর্টের বিচারে অব্যাহতি পাবার। ইতিমধ্যে সাড়ে তিনবছর জেল খাটা হয়ে যাবে। খুনি কে তা বের হয়নি তবে মাসী জেলবাসীদের নিকটা যা বর্ণনা করেছে তা থেকে জানা যায়—খুন হয়েছিল তিন মাসের শিশু—মাসীর নাতি। শিশুর মা-ই শিশুটিকে গলা টিপে খুন করেছিল। ভেবেছিল কেউ বুঝতে পারবে না কিভাবে শিশুটি মারা গেল। সবার মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক মা কেন নিজ সন্তানকে খুন করবে? এর পেছনেও একটা মর্মান্তিক ইতিহাস রয়েছে। শিশুটির মা,মাসীর পুত্রবধু ছিল শুঁড়িখানার মালিকের মেয়ে। ওর মা মারা যাবার পর মেয়েটি বাবার সঙ্গে বড় হতে থাকে। অবিবেচক বাবা তাকে ব্যবসার স্বার্থে ব্যবহার করত। মেয়েকে দিয়ে

শুঁড়ি খানায় খদ্দেরদের মদের গ্লাস এগিয়ে দিতে বাধ্য করত। তাতে সে অনিবার্যভাবে যা হবার তাই হল। সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। তখন ওর বাবা মাসীর সোজা সরল ছেলেকে ধরে এনে বিয়ে দিয়ে দেয়। বিয়ের চারমাস পরেই শিশুটির জন্ম হয়। এ নিয়ে চলে বাড়িতে অশান্তি। সে বাবার বাড়িতে যাবে না। স্বামীর ঘর করবে। ভেবেছিল শিশুটিকে মেরে ফেললে বোধ হয় ঝামেলা মিটে যাবে। অবধারিতভাবে লোক জানাজানি হয় এবং পুলিশ আসে। পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তিতে বলে স্বামী এবং শ্বশুর নির্দোষ। অভিযোগ তুলে শাশুড়ীর উপর। মাসীদের বাড়ি থেকে সবাই বউকেই দোষী সাব্যস্ত করে। বাবা টাকা পয়সা খাইয়ে মেয়েকে মুক্ত রাখে। আর বউ এর স্ববিরোধী কথা বার্তায় মাসী খুনের দায় থেকে মুক্ত হয় তবে প্রমাণ লোপাটের দায়ে অভিযুক্ত হয়। তবে মাসীর ছেলে ও স্বামী মাসীর পাশে ছিল। ওরা নিয়মিত মাসীকে দেখাশোনা করত।

আর শিবানীদির ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়েছিল—আর দশজন মেয়ের মতোই। প্রেমে প্রতারণা, অবৈধ সহবাস,অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর অস্বীকার করা ইত্যাদি।

শিবানী অত্যন্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। তার উপরে রোগাপাতলা চেহারা। আকর্ষণীয় কিছু ছিলনা। তবে বয়সের স্বভাবে যৌবন এসেছিল এবং এক অবস্থাপন্ন ঘরের শিক্ষক ছেলের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। সেটা দৈহিক সম্পর্কে পরিণত হয়। শিবানী গর্ভবতী হয়। পাড়ার লোকজন শিবানীর পক্ষে ছিল। ওরা চাপ দেয় ছেলের বাড়িতে। কিন্তু প্রভাব প্রতিপত্তির জোরে অস্বীকৃত হয়।

শিবানী ছেলেটিকে অত্যন্ত ভালবাসত এবং জানত সেই তার স্বামী। অভিযোগ ছিল ছেলেটির বাবার উপর। বাবাই তাকে আসতে দেয়না। শিবানী তা বিশ্বাস করত। এদিকে বাপের বাড়িতেও তার স্থান হয়নি। জেলখানার নিরাপদ আশ্রয়ে তাকে চলে যেতে হয়।

রুগ্ন স্বাস্থ্য শরীরে আরেকটি জীবন বড় হতে থাকে। সবার আশঙ্কার মধ্যে সে সন্তানের জন্ম দিল। সন্তানকে কি করে বাঁচাবে ভেবে আকুল। ওষুধপথ্য কিছুরই যোগান নেই। চেয়ে চিন্তে কোনক্রমে শিশুর জীবন রক্ষা করে চলেছিল সে। বাচ্চাটি অতি দুর্ভাগা কেননা শিবানীর বুকে কোন দুধ ছিলনা।

বিচারের দিন শিক্ষক ছেলে অস্বীকার করল শিবানী ও তার ছেলেকে। মুখের উপর বলে দিল চিনে না তাকে। হাকিম রক্ত পরীক্ষার কথা বলল। শিবানীর ছেলের প্রকৃত বাবা কে তা প্রমাণের জন্য। কিন্তু শিবানীর মনোভাব অন্য রকম। সে বলল আমাকে বাইরে যেতে দিন—আমার ছেলেকে বাঁচাতে হবে। এ ছেলে শুধু আমার। সে আর কোন দিন তার পিতৃত্ব দাবী করতে পারবেনা। অর্থাৎ মনে মনে তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছে।

এক্ষেত্রে শিবানী অন্যান্য মেয়েদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্যান্য মেয়েরা শত প্রবঞ্চনার

পরেও আবার স্বামীর ঘরে যেতে চায়। স্বামীকে নিয়ে ঘর করতে চায়।

কিন্তু জেলখানা থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে শিবানী শিশু সন্তানকে নিয়ে! এমন সময় নবদ্বীপের মাসী এসে প্রস্তাব দিল উনার বাড়িতে চলে যাবার জন্য। একজন স্ত্রীলোকের অভাবে ঐ সংসারটি ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছে। সে রাজি হয়ে গেল। শীর্ণ,উপবাসী,মলিন দুর্বল শরীর,কিন্তু মন প্রচন্ড শক্তিশালী,জেলখানার সবাই শিবানীর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। কিন্তু শিবানীর বুকে অসীম সাহস। প্রতারক প্রেমিকের দ্বারা ধাক্কা খেয়ে যেন জীবনে কঠিন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়েছে।

<u>দেশে দেশে দেশ হারা ঃ</u>

১। মেয়াদী নম্বরে পশ্চিম পাকিস্তানী মাসীরা ও বর্মী মাসীরা ছিল। তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের সুযোগে লেখিকার বিরাট অভিজ্ঞতা হয়েছিল—একথা গ্রন্থে তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানী বন্দিনীরা মনে প্রাণে ঘৃণা করে শেখ মুজিবর রহমানকে। কারণ, এরা নাকি বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের শেষে অত্যাচারিত হয়েছিল এবং বিতাড়িত হয়ে ভারতে এসে জেলখানার নিরাপদ আশ্রয় পায়। ভারতে থাকতেও তারা রাজি। তাদের কপালমন্দ, তাই ধরা পড়ে জেল খানাতেই থাকতে হচ্ছে। তবে তাদের উপর কোন অত্যাচার করা হয়নি। মুক্তি পেয়ে ওরা পশ্চিম পাকিস্তানে যাবে। বাংলা দেশ থেকে উচ্ছেদ হয়ে পাকিস্তানে যাবার পথ হচ্ছে ভারতের ভিতর দিয়ে। এরা কোন অপরাধী নয়।

তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের এক মিলিটারী অফিসারের কন্যা মুন্নি। সে এক নজরকাড়া মেয়ে। তাকে আর সবার থেকে সহজেই আলাদা করা যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার সময় পশ্চিমী মিলিটারিরা কি নির্মমভাবে বাংলাদেশীদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল—সে সব আলোচনায় মুন্নির উৎসাহী না হবারই কথা। তবে অন্যান্য সামাজিক সমস্যা বা অবস্থা সর্ম্পকে তার আগ্রহের শেষ ছিলনা। লেখিকার সাথে তার জমজমাট কথাবার্তা হত।

মুন্নির মা,হামিদার মা,নানীদের নিকট বাংলাদেশী মুক্তিযোদ্ধারা বিশ্বাসঘাতক,কারণ তারা নিজ দেশের মিলিটারির বিরুদ্ধে নেমেছিল।

মুন্নির বয়স চৌদ্দ। আর তারই সমবয়সী হামিদা, আসমা। হামিদা-আসমা মুন্নির মত এতটা ক্ষুরধার নয়। তবে প্রাণ প্রাচুর্য্যে ভরপুর। পশ্চিম পাকিস্তানের লোকগুলি পূর্ববাংলার মুসলিমদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে,অবজ্ঞার চোখে দেখে। বিশেষতঃ মুজিবর রহমানের নাম শুনতে পারেনা। মুজিবর রহমানের নাম শুনলে তপ্ত তেলজলের মত চিড়বিড়িয়ে ওঠে। উনার বিয়ে হয়েছিল লাহোরে। নানা ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীতে কাজ করতেন। দেশ স্বাধীন হবার পর পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করে সপরিবরে পূর্বপাকিস্তানে চলে আসেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর উচ্ছেদ হয়ে ভারতে এসে জেল বন্দী হয়। নানীরা নিঃসন্তান ছিলেন।

জেলখানার ভিতর উৎসবের দিনে খাবারের বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। দুর্গাপুজোর সময় মাংস পোলাও রমজানের সময় কাবলি ছোলা,মিষ্টি, চপ্ ইত্যাদি। সবাই মিলে আনন্দ করে ভাগ করে খেত। ভাগাভাগি করে খাওয়ার মধ্যে একটা উষ্ণ হৃদয়ের ছোঁয়া অনুভব হত। লেখিকা নিজে এসবের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। 'ঈদ্ মোবারক',বিজয়ার কোলাকুলি সবই চলত।

দেশে দেশে দেশ হারা -২ ঃ

২। সুদূর বার্মার একদল মানুষের সাথে লেখিকার দেখা হয়ে গেল জেলখানায়। ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত হয়ে ওরা এসেছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অবস্থা খুবই করুণ। ওদের জন্য এই পৃথিবীতে জলের অভাব। অন্য কয়েদীরা গরাদের ভেতর দিয়ে থালাতে করে তখনকার মত জল সরবরাহ করেছিল। অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অল্প। বালুরঘাট জেলখানা থেকে স্থানান্তরিত হয়েচিল। ওরা বার্মা থেকে এসেছিল পূর্ব পাকিস্তানে। বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ায় সেখানে থেকে বিতাড়িত হয়ে বালুরঘাট সীমান্তে দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। 'ফরেন ইন্টার্নি অর্ডিন্যান্স' বলে ওরা আটক হয়। প্রেসিডেন্সী জেলের 'খাটনিঘরে' ওদের থাকার জায়গা হয়। মুসলিম হলেও পশ্চিমীদের সাথে ওদের বিস্তর ফারাক। ভাষায় সমস্যা বড় সমস্যা। তাই ওদের ব্যাপারে কৌতূহল নিবৃত্ত করা কঠিন ছিল। বার্মীরা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মানুষ—প্রত্যেকেই দেখতে ভাল। গায়ের রং ফর্সা,দেহে কমনীয়তা আছে।

বর্মীদের দলের এক মাসী অবজ্ঞা অবহেলায় অচিকিৎসায় মারা গিয়েছিল। এ যেন ঠান্ডা মাথায় খুন। যার বিচার কোনদিন হবেনা। মাসীর ছিল দু-মাসের একটি শিশু। জেলখানার ভিতর তার জীবন রক্ষা হবার কথা নয়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ওর দিদির বুকের দুধ খাওয়ার অভ্যাস হয়ে যায়।

লাভ কেইস ঃ

একটি মেয়ে বিয়ে করেছে,তবে বিয়ের বয়স হয়নি। এদিকে সে অন্তঃসত্ত্বা। বাবা তাকে জেদ মেটানোর জন্য লিলুয়া হোমে রেখে দেন—যদি সে তার ভালবাসার পাত্রকে ভুলে যায়। মেয়েটি হোমে সন্তানের জন্ম দেয়। ছাড়া পেয়ে শ্বশুরবাড়ি যায়। মেয়েটি যে অজুহাতে জেলে বন্দী ছিল তা লাভ কেইস।

রীতা নামে একটি মেয়েকে ওর মা লাভ কেইসে ফাঁসিয়ে জেলবন্দী করেছিল। মিথ্যা অভিযোগ এনেছিল গৃহশিক্ষকের বিরুদ্ধে। মায়ের হীন বেশ্যা বৃত্তিতে রীতা সহমত ছিলনা—এই ছিল তার অপরাধ।

শিবানী বুলবুল নামের মেয়েদের ও ভাগ্য বিড়ম্বনা হয়। তাদের সন্তানেরা পিতৃ পরিচয় পেলনা। কত মেয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

আরেকটি মেয়ে লাভ কেইস এ বন্দী হয়ে জেলে ছিল।ওর শ্বশুর ওকে ফুঁসলিয়ে ছিল কোর্টে যেন বলে সে নিজে নিজে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে—এ কথা বললে ওর ছেলে ছাড়া পেয়ে যাবে। আর পুত্রবধূটি আবার জেলে ফিরে আসবে। হলও তাই।

খুনের মামলার বন্দিনীদের কথা ঃ

খুনের মামলায় অভিযুক্ত হয়ে বহু নারী বন্দী হয়ে এসেছিল। শান্তিবাঈ,শ্যামাবাঈ,ভানু, মহাদেবীয়া,সরযূ—এদের নিয়ে এই গল্প।

শান্তিবাঈ নাচগান জানা লক্ষ্নৌ ঘরানার বংশধর। এরা ঠিক দেহ পসারিনী নয়,তবে তাদের বাঁধা বাবু থাকে। এদের থেকে টাকা পয়সা পায়। একবার শান্তিবাঈ এর বাঁধাবাবুর গলায় দড়ি দেওয়া মৃত দেহ পাওয়া যায় তার বাড়িতে। লোকটির স্ত্রী শান্তিবাঈকে অভিযুক্ত করে। বলা হয় টাকা পয়সার লোভে তার স্বামীকে খুন করেছে। শান্তিবাঈ এর বক্তব্য ছিল যার কাছ থেকে চাইলেই টাকা পাওয়া যায় তাকে খুন করতে যাব কেন? একা এক নারী এক পুরুষকে খুন করে দড়িতে ঝোলানো সম্ভব নয—তাই পাশের ঘরের শ্যামাবাঈকেও অভিযুক্ত কবা হয়। শ্যামাবাঈ-র একটি শিশু সন্তান ছিল। ওকে নিয়েই জেল খাটতে আসে। শিশুটিকে বাঁচাতে পারেনি শ্যামাবাঈ। বাঈদের পেছনে তো কোন লোকবল থাকে না, সুতরাং শিশুটি মারা গেল পুষ্টির অভাবে। এটাও একটা খুন। কিন্তু এসব খুনের কোন বিচার হয়না। পরবর্তী সময়ে বিচারে শ্যামাবাঈ নির্দোষ প্রমাণিত হয় এবং ছাড়া পায়।

গ্রামের সহজ সরল মেয়ে ভানু। শাশুড়ি তাকে সব সময় অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিত। একদিন ভানু বসে হাতুড়ি দিয়ে কয়লা ভাঙছে আর শাশুড়ি তার নিত্য কর্মটি শুরু করেছে। ভানু সহ্য করতে না পেরে হাতের হাতুড়িটি ছুঁড়ে মারে কলহপ্রিয়া শাশুড়ির উদ্দেশ্যে। হাতুড়িটি মাথায় লাগে এবং সে মারা যায়। তার স্বামীও ত্যাগ করেছে—মাতৃ হত্যাকারিণী বলে। তার আপিল সরকারী নিয়মে হাইকোর্টে গেছে। কিন্তু ছাড়া পেলেও কোথায় যাবে? জেলের ভেতর আর বাইরের মধ্যে কোন ফারাক যে আর নেই। এখানে তবু পাগলাবাড়ির পাগলদের ধমকে নিয়ন্ত্রনে রাখার চেষ্টায় নিয়োজিত।

বিচারে যেসব অপরাধীর অপরাধ প্রমাণিত হয় তাদের মেট বলা হয়। জেলের আইন বলেই এরা জেল প্রশাসনে অংশ নিয়ে থাকে। পাগলা বাড়ির মেট হিসেবে শান্তিবাঈ,ভানু মহাদেবীয়া—পরিচিত ছিল। তবে ভানু অতশত ভিতরে ঢুকতনা। খাবার দাবার ও ওষুধ বন্টনের 'বিশেষ বিলি বন্টনে' অংশ নিত না।

লালমখমলি গাউনপরা এক ধনী মহিলাকে দেখে সবাই চমকে উঠে। কারণ ধনীরা তো এখানে থাকতে আসেনা। ওরা টাকা পয়সা প্রভাব প্রতিপত্তির জোরে ছাড়া পেয়ে যোয়। ওই মহিলা আর ছাড়া পাচ্ছেনা। মহিলা ভাইঝিকে গলা টিপে খুন করেছিল। এ নিয়ে সে সময়

কলকাতার কাগজে তোলপাড়। মহিলা জেলখানায় নানা বিষয়ে প্রতিবাদ করত। কিন্তু ভাইঝির ব্যাপারে কিছু বলতনা। আর অন্যান্য ব্যাপারে প্রতিবাদের ঢং বিরক্তিকর ছিল। যাই হোক অবশেষে দিন পনেরো জেল খেটে জামিনে বেরিয়ে গেল।

মহাদেবীয়া ও শান্তি বাঈ ছাড়া পেয়ে যায়।

নূরজাহান বছরের পর বছর জেল খেটেছে। তার বিচার বন্ধ ছিল। অবশেষে একদিন নূরজাহানের বিচার হয়। আর বিচারে মাত্র ছমাসের জেল। তাই রায়ের সঙ্গে সঙ্গে ছাড়া পেল। তার একটা বাচ্চা ছিল—জেলখানায় মারা যায়। সে সব সময় বসে কুরুশ দিয়ে নানা ডিজাইনের জিনিস বানাত। নানা নক্সা করা জিনিসগুলি মেট্রন মা,সুনীতি মা,নীহার মা,বিজয় মা,শিখা-মাদের দিত।

জেলখানার ভেতর কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ তাদের মা সম্বোধন করা হত। মেট্রন বা রাধুনিদের মা সম্বোধনের রেওয়াজ ছিল।

দরিদ্র সাঁওতাল কন্যা শনিচারী যাবজ্জীবন কারাদন্ড ভোগ করেছিল জেলে।

হাজতি নম্বর ঃ

হাজতি নম্বরে বিচারাধীন বন্দীদের থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে ঐ ঘরে সাজা পাওয়া মেয়াদী এবং নিরপরাধ বন্দিনীরা থাকত। শিশুরা, না-অপরাধী পাগলরাও থাকত। নক্সালবন্দী ও আনন্দমার্গীরাও। হাজতি নম্বরের ভিড় দিনে দিনে বেড়েই চলেছিল। আয়তন তো আর বাড়ছেনা। শুলে একজনের পা অপরের গায়ে লাগে। হাসি,কান্না,ঝগড়া গল্প সবই চলে সমান তালে—হৈ হৈ রৈ রৈ।

হাজতি নম্বরে ছিল শিখা। তার দাপটে অন্যান্য বন্দিনীদের অবস্থা কাহিল। সে ছিল সকলের ত্রাস। এ হেন কাজ নেই যে সে পারেনা। অশ্লিল ভাষায় গালাগাল মারপিট, সবই সে অবলীলায় করে যেত।

জেলে আসার কারণ হল শিখা ছিল গরিব ঘরের মেয়ে—তার স্বামী শ্রমিক। কারখানার মালিকের ছেলের সাথে শিখা পালিয়ে যায়। পালিয়ে কিছুদিন থাকার পর টাকা পয়সা ফুরিয়ে যায়। তারপর শুরু করে জালিয়াতি। পুলিশের হাতে দুজনই ধরা পড়ে। ছেলেটি অবশ্য জামিনে বাড়ি চলে যায়। শিখার স্বামী তাকে ত্যাগ করেছে। ওর আর কেউ নেই খোঁজ খবর করার। কাজেই তার আর জামিন হয়নি। সে সহজেই মেট্রনের অতি কাছের লোক হয়ে গেল। শিখা প্রধান মেট হয়ে ওঠে। সে আচারে ব্যবহারে যেমন ব্যতিক্রম,তেমনি পোশাক আশাকেও উদ্ভট। শুধু হাত কাটা ব্লাউজ আর সায়া পড়ে ঘুরে বেড়াত। শিখার নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের বর্ণনা লিখে শেষ করা যাবেনা। শারীরিক চাহিদা পূরণের জন্য শিখার পুরুষ

সঙ্গীর অভাব হয়না। তার আবার মেয়ে সঙ্গীও চাই। মনের চাহিদা পূরণ না হলে নানা ভাবে অত্যাচার চালাত অন্যান্য বন্দিনীদের উপর। বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর জেলখানার মৃদু আলোতে শিশু,কিশোর-কিশোরী,বৃদ্ধাদের সামনে চলত জৈবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থের প্রয়াস। শুধু শিখা নয় অন্যান্য বন্দিনীরাও এই আচরণে সামিল হত।

এ পরিবেশেই ছিল রীতা। সে সুন্দরী ও ধনী পরিবারের মেয়ে। বাবার অমতে কুপাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। তাই বাবা ঐ কুপাত্রের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জেলে রাখার বন্দোবস্ত করে। অবশ্য শ্বশুর বাড়ির লোকজন রীতার পক্ষে ছিল।

হাজতি নম্বর থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাবজ্জীবন সাজা পাওয়া মহিলা সরযূ। সে ছিল খুনি। জেলে আসার আগে সরযূ ছিল ছোটখাট বাড়িঅলি। বিক্রি করে দেওয়া একটি মেয়েকে ভুলিয়ে ভালিয়ে জোর করে দেহ ব্যবসায় নামাতে পারেনি। তাকে মারতে মারতে মেরেই ফেলে। তারই ফলস্বরূপ তার যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়। সে ছিল প্রচন্ড নিষ্ঠুর,শিখার একেবারে উপযুক্ত দোসর। শিখা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অন্য জেলে স্থানান্তরিত হয়।

মহাদেবীয়া, মীরা ছিল—এরাও মারদাঙ্গা করত। শিয়ালদা স্টেশনের নিকটে থাকা এক পকেটমার এল। চটপটে সুশ্রী চেহারাব তরুণী। স্টেশন চত্তরের নানা অপরাধের কথা হড়বড়িয়ে বলতে লাগল। নিজের কথাও বলল। চার সন্তানের জননী সে। স্বামীর ফার্নিচারের দোকান। এখন তার স্বামী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। পাকা বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে সে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়াশোনা করে। পকেটমারের কাজ করে সে এত কিছু করেছে। এ কাজে সে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছে। সফলতাও এসেছে। 'আন্ডার ওয়ার্ল্ড' এর জগতে চলে আসে। ওর পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। ও আর বাড়ি যেতে পারেনা।

পেশাদার অভিজ্ঞ চোর পুঁটি। তার বয়স তেইশ/চব্বিশ। জেলের ভেতর সে যৌন অত্যাচার চালাত। শিশুরাও রেহাই পেতনা তার হাত থেকে। সমকামিতায় সিদ্ধহস্ত। অবশেষে জেলের ভেতরই সে আত্মহত্যা করে।

আরতি, পুতুল, রীণারা ছিল। ওদের জীবন ভাগ্যবিড়ম্বিত। জগতে মেয়েদের জীবন অহেতুক নানা ঝামেলায় জড়িয়ে যায়। জেনে বুঝেও ওদের পক্ষ কেউ নেয়না। গৃহ পরিচারিকার কাজ করতে আসা মেয়েরা নানাভাবে শিকার হয়।

তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারনে বিভিন্ন বয়সের মানুষের বন্দী জীবন কাটাতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব কোন কারণ নেই। শুধু আইনের প্যাচ বললে ঠিক নয়—আইনের উদাসীনতায় বা বিচার বিভাগের ব্যর্থতার কারনে। সাধারণভাবে আমরা মনে করি জেল খানায় বন্দী থাকাটা কী মর্মান্তিক! আবার জেলখানার ভিতরে অবৈধভাবে জেল কর্তৃপক্ষের দ্বারা,বন্দিনীদের দ্বারা বন্দিনীদের উত্তেক্ত করা, প্রহার করা, নির্যাতন করা—এটা নিত্য নৈমেত্তিক রুটিনে দাঁড়িয়ে

গেছে। অব্যবস্থা চূড়ান্ত নিম্নমানের খাবার, জলের অভাব ইত্যাদি নানা অসুবিধার কথা—জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে বিরোধ করার মত অবস্থা। প্রাপ্য আদায়ের জন্য এখানেও আন্দোলন করতে হয়—তাতে কিছুটা হলেও বরফ গলে।

জেলখানার কদর্যকাহিনী বিভিন্ন লেখকদের লেখার মাধ্যমে প্রকাশিত হবার ফলে কর্তৃপক্ষ কিছুটা হলেও নড়ে চড়ে বসেছেন। সংশোধনের কিছুটা প্রয়াস হয়েছে। ভাষাগত বাধা একটা বড় বাধা। শুধু এই সমস্যার জন্য বহু নিরপরাধীকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতিদের ভাষা কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় অবোধ্য থেকে যায়। সহমর্মিতা ও সহানুভূতি নিয়ে প্রতিটি বিষয় দেখলে নিশ্চয়ই অনেক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হত।

চেতনার অভাব বড় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। মানুষ জানেই না তাদের জন্য কি আইন রয়েছে। কি সুবিধা রয়েছে কার কাছে গেলে প্রকৃত উপকার হবে সেটা বুঝতে হবে। সরকার রয়েছেম নানাভাবে সাহায্য করার জন্য—কিন্তু তার কাছে তো যেতে হবে।

শক্তির আরাধনা ও বাঙালির শারদ উৎসব

শক্তির উপাসনা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। জীবনের সুখ-শান্তি, আত্মার উৎকর্ষ এবং পরিণামে নিজের সত্তার পূর্ণ বিকাশে মানুষ নিজের ভিতরে যে শক্তি সংরক্ষিত আছে তার বিকাশ ও যথাযথ প্রয়োগের উপর জোর দেয়। এ শক্তির যথোচিত বিকাশে বাধা উপস্থিত হলে জীবনধারা অবরুদ্ধ হয়ে যায় — অপরদিকে সঠিক প্রয়োগে জীবনের সার্থকতা আসে। শক্তি কখনো গুপ্ত আবার কখনো প্রকাশ্য। তবে সমগ্র শক্তির কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। সাধারণের চোখে শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি চোখে পড়ে। শক্তির বিকাশের ও প্রকাশের বিভিন্ন স্তর ভেদ রয়েছে—শারীরিক বিকাশের স্তর, মানসিক বিকাশের স্তর ও হৃদয়ের বিকাশের স্তর। শারীরিক বিকাশের স্তরে আসুরিক বল-বীর্য, দম্ভ-দর্প এসবের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মানসিক বিকাশের স্তরে বুদ্ধির সাধনা দ্বারা মানুষ প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করতে পারে এবং স্বার্থ, সুখ ভোগে জড়িয়ে পড়ে। আর শক্তির বিকাশেব তৃতীয় স্তরে হৃদয়ের বিকাশে মানুষ স্বার্থ ত্যাগ করে পরার্থে জীবন উৎসর্গ করতে উৎসাহবোধ করে। ক্রমে ক্রমে সাধনার দ্বারা মানুষ চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে।

শক্তির আরাধনা প্রাগৈতিহাসিক। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেও পাঞ্জাবের হরপ্পা এবং সিন্ধুদেশের মহেঞ্জোদারো নগরে দেবী আরাধনার প্রমাণ মিলে। উক্ত নগরদ্বয়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে অসংখ্য মৃন্ময়ী দেবী মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

শক্তি পূজা বৈদিক যুগেও প্রচলিত ছিল। বেদে দেবী সূক্তের উল্লেখ রয়েছে। ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্ত্র ঋগ্বেদে আছে। এ দেবীর বিভিন্ন মূর্তি — শিবদুর্গা, সিন্ধু দুর্গা, অগ্নিদুর্গা এবং অন্যান্য দেবীর উল্লেখ আছে। সামবেদীয় কেনোপনিষদের উপাখ্যান থেকে জানা যায় ব্রহ্ম ও তৎশক্তি অভেদ। চণ্ডীপূজার প্রথমেই গায়ত্রী ছন্দরূপে আবির্ভূতা। গায়ত্রী বেদমাতা ও শ্রেষ্ঠ বেদমন্ত্র। ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ বেদের বিধান। গায়ত্রী প্রাতে ঋগ্বেদ ধারিনী কুমারী, মধ্যাহ্নে যজুর্বেদধারিনী যুবতী এবং সায়াহ্নে সামবেদ ধারিনী বৃদ্ধা। কুমারীর ন্যায় মহাকালী ব্রহ্মরূপা ব্রাহ্মী। যুবতীর ন্যায় মহালক্ষ্মী বিষ্ণুরূপ। বৈষ্ণবী এবং বৃদ্ধার ন্যায় মহাসরস্বতী শিবরূপা মাহেশ্বরী। চণ্ডী ও গায়ত্রী উভয়ই প্রাণস্বরূপা। ঋক্ মন্ত্রের দ্বারা পরমাত্মার স্তব। যজুমন্ত্র দ্বারা তাঁর পূজন এবং সামমন্ত্র দ্বাবা তাঁর ভজন। চণ্ডীপরম আত্মময়ী। বেদমাতাই চণ্ডীরূপে প্রকাশিত।

বৌদ্ধধর্মে শক্তিবাদের বহু নির্দশন দেখা যায়। হিন্দুদের নিত্যপাঠ্য চণ্ডীখানি একসময় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণের প্রিয় ছিল। জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর স্বহস্তে লিখা চণ্ডী নেপালে পাওয়া

গিয়েছে প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্বে। বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের নালন্দা ও বিক্রমশিলায় তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপনা হত। হিন্দুতন্ত্রে যে দশমহাবিদ্যা - কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলার বর্ণনা আছে - তা বৌদ্ধতন্ত্র থেকে গৃহীত। বাংলার জনপ্রিয় দেবীদ্বয় কালী ও সরস্বতী বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি। জাপানে এক বৌদ্ধদেবী পূজিতা হন — তাঁর নাম সপ্তকোটী বুদ্ধমাতৃকা চনষ্টী দেবী। জাপানী — ভাষায় 'চনষ্টী' এবং সংস্কৃত 'চণ্ডী' একই অর্থ। বৌদ্ধ শাস্ত্র 'মহাবস্তু'তে উল্লেখ আছে — বুদ্ধদেব যখন জননীর সঙ্গে কপিলাবস্তুতে আসেন তখন শাক্যবংশের শাক্যবর্ধন মন্দিরে অভয়াদেবীর পদবন্দনা করেন। আর অভয়াদেবীই দুর্গাদেবী। চীনের ক্যান্টন শহরে অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দিরে একটি শতভুজা দেবীমূর্তি আছে।

জৈন ধর্মে শক্তি আরাধনার বহুল প্রচলন ছিল। রাজস্থানের আবু পাহাড়ে যে বিখ্যাত শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত জৈন মন্দির রয়েছে তার চূড়াতে ষোলটি জৈনদেবীর বিভিন্ন মূর্তি খোদিত দেখা যায়। জৈনগণ সরস্বতীকে বিদ্যা, জ্ঞান ও কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং শাসনদেবী রূপে ভক্তি করেন। তাঁদের মন্দিরে সরস্বতী ও অন্যান্য দেবীর মূর্তি পূজিত হয়। শ্রীগুরু গোবিন্দ সিংহের 'দশমবাদশাহ কি গ্রন্থ' এর চতুর্থ অংশ মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অনুসারেই লিখিত।

মহাভারতে দেবী উপাসনার উল্লেখ পাওয়া যায়। যুদ্ধে জয়লাভের জন্য যুদ্ধারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ দুর্গাদেবীকে প্রণাম ও প্রার্থনা করার উপদেশ অর্জুনকে দেন। বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে যাবার সময় পাণ্ডবগণ ঋষিগণের পরামর্শে অজ্ঞাতবাসের সাফল্য কামনায় দুর্গাদেবীর স্তব করেন। কুমারী, কালী, কপালী, মহাকালী, চণ্ডী, কান্তারবাসিনী প্রভৃতি দেবীর নাম মহাভারতে পাওয়া যায়। বিন্ধ্যাচলের অরণ্যবাসীগণ কর্তৃক প্রথমে দেবী 'কুমারী' রূপে পূজিতা হন। এরপর তিনি শিব সঙ্গিনী হয়ে 'উমা' নামে পরিচিতা হন। মহাভারতে বিরাট পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির স্তুতিতে দেবীকে মহিষাসুরনাশিনী, বিন্ধ্যবাসিনী, মদমাংসবলিপ্রিয়া বলেছেন। ভবভূতির 'মালতীমাধব' এ উল্লেখ আছে চামুণ্ডা দেবী নরবলিসহ পূজিতা হতেন এবং তাঁর মন্দির পদ্মাবতী নগরীর বাইরে শ্মশানের পার্শ্বে বিদ্যমান। পদ্মাবতী বর্তমান উজ্জয়িনী এবং সপ্তমোক্ষধামের অন্যতম। 'মালতীমাধব' 'শ্রী শ্রী চণ্ডীর' পরবর্তী। সুতরাং দেবীর চামুণ্ডা নাম ও চণ্ডিকা মূর্তি সর্বপ্রথম চণ্ডীতেই পাওয়া যায়।

কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ অনুসারে রাবণ ও রাম উভয়ই দেবীভক্ত ছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে এর উল্লেখ নেই। দুর্গা পূজার মন্ত্রে আছে — 'রাবনস্য বিনাশায় রামস্যানুগ্রহায় চ অকালে বোধিতা দেবী'। শারদীয়া পূজার কল্পনা কৃত্তিবাসের নয় — এর বহু পূর্ব থেকেই বাংলাদেশে এ পূজা প্রচলিত ছিল। কারো কারো মতে ভগবত পুরাণ থেকে কৃত্তিবাস এ উপাখ্যান গ্রহণ করেছেন। তবে প্রবাদ অনুসারে শরৎকালে রামই দেবীর অকালবোধন করেছিলেন রাবণ বধের জন্য। রাবণ ও মেঘনাদ উভয়ই দেবীর আরাধনা করতেন। রামের আরাধনায় তৃপ্ত হয়ে দেবী রাবণকে পরিত্যাগ করে রামের পক্ষে আসেন। এ মতে বাসন্তী

পূজাই প্রকৃত দেবী পূজা। কিন্তু শ্রী শ্রী চণ্ডীর মতে শরৎকালেই সুরথ ও সমাধি দেবী পূজা করেন। দেবী ভাগবতের মতে শরৎকালেই দুর্গা পূজার উৎপত্তি। বিতর্ক যা-ই থাক, রামচন্দ্র ১০৮ পদ্ম দিয়ে পূজার সংকল্প করেছিলেন, পদ্ম জোগাড়ও হয়েছিল, কিন্তু পূজার সময় রামচন্দ্র দেখেন একটি পদ্ম কম। রামকে পদ্মলোচন বলা হত, তাই তিনি তাঁর ধনুক দিয়ে নিজের একটা চোখ উৎপাটন করতে উদ্যত হন — এমন সময় ছলনাময়ী দেবী আবির্ভূতা হয়ে ভক্তের হাত ধরে বাধা দেন এবং অভীষ্ট বর দান করেন।

সম্রাট আকবরের সময় বিভিন্ন পুরাণ ও শক্তি পূজা বেশ উল্লেখযোগ্য ভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল — বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত পুরাণ, কালিকা পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবী ভাগবত, বামন পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ ইত্যাদি। ১৫৮০ সালে আকবরের রাজত্বকালে মনুসংহতিাব টীকাকার কুল্লুকভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ তৎকালীন সময়ে প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রতিমায় দুর্গা পূজা করেন। ষোড়শ শতাব্দী থেকে প্রতিমা গড়ে দুর্গা পূজা বঙ্গদেশে বেড়েই চলেছে। দেবী ভক্তের স্রোত সারা ভারতে থাকলেও বঙ্গদেশে এর প্লাবন।

বঙ্গদেশে শাক্তসাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত — এ পাঁচশত বৎসর যে বিপুল শাক্ত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে — তা বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ। চণ্ডী, দুর্গা, অম্বিকা, সরস্বতী, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, গঙ্গা — প্রভৃতি দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই মূলত কাব্য গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সে সময়ে চণ্ডী অবলম্বনে রচিত গ্রন্থগুলি — দ্বিজকমললোচনের চণ্ডিকামঙ্গল, অন্ধকবি ভবানী প্রসাদ রায়ের দুর্গামঙ্গল, গোবিন্দ দাসের কালিকামঙ্গল, শিবচরণ সেনের গৌরীমঙ্গল, হরিশ্চন্দ্র বসুর দেবী মঙ্গল, রামশঙ্কর দেবের অভয়ামঙ্গল, বালদুর্লভের দুর্গাবিজয়, হরিনারায়ণ দাসের চণ্ডিকামঙ্গল এবং জগৎরাম বন্দ্য ও তাঁর পুত্র রামপ্রসাদ রচনা করেন দুর্গা পঞ্চরাত্রি। ঐ সময়ে বহু চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়। তবে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁদের মধ্যে অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ।

বাংলায় শাক্ত সাধনার জোয়ার ছিল। বাংলার শাক্তসাধকগণের মধ্যে হালিশহরের রামপ্রসাদ, বর্ধমানের কমলাকান্ত, নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ, তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ, মেহারের সর্বানন্দ ঠাকুর প্রভৃতির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের শাক্ত সংগীত বাংলা ভাষার অমর সম্পদ। দক্ষিণেশ্বর ও হালিশহরের পঞ্চবটীদ্বয় এবং তারাপীঠের সাধনস্থল বাংলাকে তীর্থে পরিণত করেছে। রামকৃষ্ণদেব তন্ত্রসাধনায় ছিলেন অভূতপূর্ব এবং সুদূর প্রসারী। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর উপদেশে তিনি বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত চৌষট্টি তন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ হয়েছিলেন। শক্তিমঙ্গল তন্ত্র অনুসারে ভারতভূমি তিন ভাগে বিভক্ত। বিন্ধ্যাচল থেকে চট্টলভূমি হল 'বিষ্ণুক্রান্তা', বিন্ধ্যাচল থেকে কন্যাকুমারীকা 'অশ্বক্রান্তা', এবং বিন্ধ্যাচল থেকে নেপাল, মহাচীন প্রভৃতি দেশ 'রথক্রান্তা' নামে বিখ্যাত ছিল। প্রত্যেক ক্রান্তায় ৬৪ করে মোট ১৯২টি তন্ত্র সমগ্র ভারতে প্রচলিত ছিল। সমগ্র তন্ত্র

শাস্ত্রের সার চণ্ডীর মধ্যে নিহিত। তাই শাক্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে চণ্ডী এত সারবতী ও সমাদৃতা। গীতার ন্যায় চণ্ডীও নিত্যপাঠ্য। দেবী পূজার প্রধান অঙ্গ চণ্ডীপাঠ। মহাভারতের একান্নটি দেবীপীঠস্থানে অর্থাৎ শক্তি সাধনার কেন্দ্রে চণ্ডী নিয়মিত পাঠ হয়।

শ্রী শ্রী চণ্ডীতে দেবীর নিম্নোক্ত নামাবলী রয়েছে — চণ্ডিকা, চামুণ্ডা, নারায়ণী, শাকম্ভরী, সরস্বতী, সনাতনী, মহামায়া, শতাক্ষী, রক্তদন্তিকা, ভগবতী, জগদ্ধাত্রী, বিশ্বেশ্বরী, দেবজননী, বেদজননী, সাবিত্রী, মহাদেবী, মহাসুরী, পরমেশ্বরী, তামসী, রাজসী, সাত্ত্বিকী, শিবা, সিংহবাহিনী, খড়্গিনী, কালী, গদিনী, ভদ্রকালী, শঙ্খিনী, শূলিনী, চক্রিনী, চাপিনী, অম্বিকা, ঈশ্বরী, বরদা, শ্রী, মহেশ্বরী, ত্রয়ী, দুর্গা, গৌরী, লক্ষ্মী, অলক্ষ্মী, অপরাজিতা, পার্বতী, কল্যাণী, ভীমাক্ষী, ভৈরবনাদিনী, ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, বারাহী, নরসিংহী, ঐন্দ্রী, শিবদূতী, কাত্যায়নী, সর্বেশ্বরেশ্বরী ইত্যাদি।

সমগ্র ভারতে এবং বঙ্গদেশে দেবীর মহিষমর্দিনী মূর্তিই প্রচলিত এবং পূজিত। মধ্যভারতের উদয়গিরি গুহাতে খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকের মহিষমর্দিনী মূর্তি রয়েছে। এ মূর্তি দ্বাদশভূজা এবং সম্ভবত প্রাচীনতম মহিষমর্দিনী মূর্তি। মহাবলিপুরমের মহিষমর্দিনী মণ্ডপে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের অষ্টভুজা মূর্তি অঙ্কিত রয়েছে। ইলোরাতে ও অনুরূপ মূর্তি দেখা যায়। ভুবনেশ্বরে বৈতাল দেউলে মহিষমর্দিনী দুর্গার একটি সুন্দর মহিষাসুরমর্দিনী অষ্টভুজা মূর্তি আছে। কিন্তু বাংলায় মহিষাসুরমর্দিনী দশভুজা মূর্তিই সর্বত্র প্রচলিত এবং পূজিত।

বাংলায় বর্ষার পর শরতের আগমন। লীলাকাশে সাদা মেঘের লীলাখেলা। প্রকৃতি জগৎ বর্ষার স্নেহরসে ঘনসবুজ, গাছ গাছালি যৌবনপ্রাপ্ত। যেদিকেই তাকানো যায় পল্লবিত শাখালতা। নদী-নালা-খাল-বিল-পুকুর জীবনরসে পরিপূর্ণ। প্লাবন নেই, খরা নেই, দাবদাহ নেই — আছে শুধু স্নিগ্ধতা, আত্মার আত্মীয়ের ডাক, মায়ের ডাক, মায়ের আকর্ষণ, নদীর পাড়ে সাদা কাশফুল হাসতে থাকে, দুলতে থাকে, বাতাসের তালে তালে ঢেউ খেলে। ভোরে শিউলি ঝরা প্রাঙ্গণে সুবাস ছড়ায়। পূজা পূজা গন্ধ — এরই মাঝে ছুটির ঘণ্টা বাজে। দূরদেশের আত্মীয় - বন্ধুর ঘরে ফেরার পালা। বিশ্বকর্মা পূজা দিয়ে শারদ উৎসবের শুভ সূচনা হয়। দেবশিল্পীর আরাধনার ঢাকের বাদ্যি জানান দেয় - দুর্গোৎসব দোরগোড়ায়।

তারপর পিতৃ তর্পনের মহাপুণ্যলগ্ন দেখতে দেখতে চলে আসে। টেলিভিশনের শত চ্যানেলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সব বাড়িতে রেডিওর খোঁজ পড়ে — নূতন ব্যাটারী ঢুকানো হয়। মহালয়ার পূণ্য প্রভাতে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠ ও সঙ্গে বাংলা গানের স্বর্ণ যুগের এক ঝাঁক শিল্পীর মধু কণ্ঠ। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখা হয় - যদি মিস্ হয়ে যায় আকাশবাণীর বিশেষ প্রভাতী অনুষ্ঠান। তারপর রাস্তায় রাস্তায় মানুষের ঢল। আহ্, ছুটির দিন - নিশ্চিন্ত প্রাতর্ভ্রমণ। টেলিভিশনেও মহালয়ার অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয় - মহিষাসুরবধ জীবন্ত চাক্ষুষ হয়।

শুম্ভ-নিশুম্ভ দানবদ্বয়ের নিধনের উদ্দেশ্যে দেবগণ দেবীর যে স্তব করেছিলেন তাতে আছে —

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তি রূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

চণ্ডীর ৫ম অধ্যায় এ দেবতাগণ মহামায়ার স্তব করার সময় বলেছেন যে দেবী চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, মমতা, তুষ্টি ও ভ্রান্তিরূপে সর্বভূতে বিরাজিতা। শুধু তাই নয়, মানবদেহের প্রত্যেক অঙ্গে এবং বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতে দেবী প্রকাশিতা। এ স্তবগুলি বছরের পর বছর ধরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের রেকর্ড করা কণ্ঠে শুনে চলেছে বাঙালিরা তবু আশা মিটেনা — প্রতি বছরই শোনা চাই।

রেডিওতে 'আগমনী' গান বাজানো হয়। দেখতে দেখতে মহাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী, মহানবমীর শেষে দশমীর করুণ সুর বেজে উঠে। যথাসময়ে বিসর্জন হয় প্রতিমা। 'বিজয়া'র গান বেজে উঠে। পূজার ক'টা দিন যে কিভাবে কেটে যায়। বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। পূজা আসছে ভাবনাটাই বেশি ভালো লাগে — চলে গেলে একটা শূণ্যতা এসে গ্রাস করে। পূজা বাড়ি ও ক্লাবগুলির দিকে তাকালে বিমর্ষভাব অনুভূত হয়।

পূজার সময় রাস্তায় জনজোয়ার, নূতন ও বিচিত্র পোষাকে মানুষের ঢল রাস্তায় ও প্যান্ডেলে। দর্শক ও পূণ্যার্থীদের ভিড়। জাঁকজমকপূর্ণ পূজাগুলি দেখার জন্য লম্বা লাইন। মানুষ অফুরন্ত উৎসাহ উদ্দীপনায় কষ্ট স্বীকার করে ধৈর্য ধরে পূজা দেখে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণ অনেকে আবার দিনের বেলাতেই ঠাকুর দর্শন ও প্রণাম সারেন। আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশনে পূজায় ভিড় সবচেয়ে বেশি। এত লোকের অঞ্জলি প্রদান ও প্রসাদ বিতরণ এমন সুশৃঙ্খলাভাবে হয় যে অবাক হতে হয়। কুমারী পূজা ও হয় যথা নিয়মে। পূজা প্রাঙ্গনে বেশ বড়সড় বইমেলা বসে — ভক্তেরা প্রাণ খুলে বই, গানের ক্যাসেট সংগ্রহ করতে পারেন।

পূজা উপলক্ষ্যে বাঙালিরা নূতন পোশাক কিনেন ও সাধ্যমত প্রিয়জনদের উপহার দেন। এত 'আনন্দ ধারা'র মধ্যে কোথাও আবার করুণ দৃশ্যও দেখা যায়। ধনীর বাড়ির ছেলেমেয়েরা দুটি, তিনটি, চারটি করে পোশাক পেয়ে যায় — আবার কোন বাবা হয়তো একটাও জুটাতে পারেন না। তার ছেলে বা মেয়েটির করুণ দৃষ্টি পূজার আতিশয্যকে কিছুটা ম্লান করে দেয়। অনেক সমাজসেবী সংস্থা — বর্তমানে এসব দায় কিছুটা মাথায় পেতে নিয়েছে। তাই এখন পূজায় এদিকে সেদিকে বস্ত্র বিতরণ ও পোশাক বিতরণের খবর শোনা যায়।

পূজার সময় — গ্রাম বা শহরতলি থেকে আসা কৃষক বা দিনমজুর বাবাকে দেখা যায় কাঁধে দু'বছরের শিশু কন্যাকে বসিয়ে ও এক হাতে ঘরনীকে ধরে প্যান্ডেল প্যান্ডেলে পূজা দেখতে। আর স্ত্রীর হাতে ধরা পাঁচ বছরের শিশু পুত্রটি। পূজা দেখার অনাবিল আনন্দে এরা

ভেসে বেড়ায়। পথে পথে খাবারের দোকান — নানা আকার ও আকৃতির বেলুন, গ্যাস বেলুন। ছোটদের হাতে হাতে বেলুন বা গ্যাস বেলুন দেখা যায়। কারোর বেলুন ফেটে যায়, কারোর গ্যাস বেলুন অসাবধানবশতঃ আকাশে উড়ে যায়। তখন মুখটা মলিন দেখায়। আবার কেউ বন্দুক ও ক্যাপ হাতে পটাশ্ পটাশ্ আওয়াজ করে খুশির বন্যায় ভেসে পূজা দেখে — অবশ্য মূর্তি ও সাজসজ্জার চেয়ে বন্দুকের দিকেই খেয়াল বেশি। আবার কাউকে দেখা যায় গোমড়া মুখ করে মা'র হাত ধরে হেঁটে চলে যায় — বন্দুক পায়নি বলে।

দুর্গা পূজা মানেই উৎসব — আর উৎসব মানে সকল ধর্মের, বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে, ধনী-গরীব স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেবে। সবাই উৎসবে অংশগ্রহণ করে, পূজা দেখতে বেরোয় — আর ধনী-গরীবের তফাৎটা পরিস্কার হয়ে যায়।

দুর্গা পূজা ধনীদের — কারণ প্রতিমা গড়ে পূজা করা খরচ সাপেক্ষ। তবে অনেক নিষ্ঠাবান ধার্মিক নিম্নবিত্ত ব্রাহ্মণের বাড়িতে ঘটপূজা হতে দেখা যায়। যদিও উৎসবের আমেজ থাকে না। বর্তমানে পূজা করার উপযোগী পুরোহিত পাওয়াও দুস্কর। পূজার প্রায় দু'মাস আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি প্ল্যান-প্রোগ্রাম, বাজেট ও চাঁদা সংগ্রহ। চাঁদা নিয়ে কোথাও কোথাও বচসা হতে দেখা যায়। কোন কোন অঞ্চলে নয়-দশটা ক্লাবকে চাঁদা দিতে হয়। এটা একটা ভাবনার বিষয়। শরতের আনন্দের সাথে কিছুটা বিষাদ এসে মিশে অনিবার্যভাবেই।

বাঙালির প্রধান উৎসব দুর্গা পূজা — নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত এবং সেলিব্রিটি প্রত্যেকের হৃদয়ের উৎসব। সেলিব্রিটিরাও সারা বছর ব্যস্ত থাকেন — কিন্তু পূজার সময়টা ফ্রি থাকেন — যাতে পূজার উত্তাপটা ঠিকভাবে গায়ে লাগাতে পারেন। সরকারী ও আধা সরকারী দোকানে কাপড় ও পোশাক পরিচ্ছদের মূল্যের ছাড় দেওয়া হয় - প্রতি বছর। সরকার নির্ধারিত মুল্যে মাছ মাংসের ব্যবস্থা করেন। ন্যায্যমুল্যের দোকানে সুলভমুল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস দেওয়া হয় সাধারণ ভোক্তাদের সুবিধার জন্য।

উৎসব পার্বনের বিধান যাঁরা শিখিয়েছেন তাঁরা বিশ্বপ্রেমিক, প্রকৃতি রসিক সন্দেহ নেই কিন্তু একটা জিনিস যা উপলব্ধিতে আসে তা হল পুরুত ঠাকুর ছাঁদা যা-ই বাধুঁন সেটা প্রত্যক্ষ ফল নয়, প্রত্যক্ষ ফল হল পূজার যা আয়োজন করা হয় — যেমন ফল-মূল, দই-সন্দেশ এসব গরীব সংসারে হলেও মানুষের পেটে পড়ে কিছু। এক মুসলিম বন্ধুকে আক্ষেপ করে বলতে শুনেছিলাম বারো মাসের তেরো পার্বনের ফলমূলটা কিন্তু মুসলিম বা খ্রীষ্টান দরিদ্র ঘরের ছেলে-মেয়েদের পেটে পড়ে না।

তবে উৎসব বাড়িতে বা বারোয়ারি পূজায় সবার জন্য দ্বার অবারিত। উন্মুক্ত মনে যে আসে সে-ই প্রসাদ পায়। গরীবের নিকট পূজা প্রকৃত উৎসবে পরিণত হওয়াই সার্থক।

চতুর্থ জাতীয় শিশু উৎসবে যোগদানের অভিজ্ঞতা

চতুর্থ জাতীয় শিশু উৎসব অনুষ্ঠিত হয় গোয়ার কারকোরমে। সময়কাল ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০০৪ইং। পাঁচদিনের অনুষ্ঠান ছিল। ত্রিপুরা থেকে ১১ জন শিশু শিল্পী যাদের বযস আট থেকে বারো ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিল। সময়টা যেহেতু ডিসেম্বর মাস—বার্ষিক পবীক্ষা শেষ তাই শিশুদের সঙ্গে পিতা-মাতাগণ সোৎসাহে যোগদান করার জন্য প্রস্তুত হযে যান। জাতীয় শিশু উৎসবেব ব্যবস্থাপনায থাকে National youth Project. বিভিন্ন বাজ্যে এব শাখা আছে। National youth Project এর 'ত্রিপুরা শাখা' আমাদের পাঠাবাব ব্যবস্থা কবে। তবে আর্থিক সাহায্য ছাড়া অন্যান্যভাবে সুবন্দোবস্ত করে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে। যাবার পূর্বে এই সংস্থার একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান করা হয়। তাতে ত্রিপুরার ক্রীড়া ও যুব কল্যাণমন্ত্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া হোলিক্রস স্কুলের পিন্সিপাল ফাদার ডেভিড অদয়কালাম এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পূর্ণাত্মানন্দ মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে শিশু শিল্পীদের সঙ্গে উনাদের পরিচয় হয় এবং ফুল দিয়ে তাদের বরণ করে উৎসাহিত করা হয়। শিশু শিল্পীরা এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সমবেত নৃত্য এবং সঙ্গীত পবিবেশন করে গণ্যমান্য অতিথিদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল 'প্রেস ক্লাবে'। প্রেসক্লাবের ঘর ঐদিন দর্শকের ভিড়ে ঠাসাঠাসি ছিল এবং তারিখ ছিল ১৩ই ডিসেম্বর ২০০৪। এরপর ১৮ই ডিসেম্বর সকাল ১০টায় শিশু শিল্পীদের রাজভবনে নিয়ে যাওয়া হয় রাজ্যপালের সঙ্গে পরিচিতি এবং শুভেচ্ছা বিনিময় এর জন্য। রাজভবনে ওরা উষ্ণ সংবর্ধনা পায়।

আর আমাদের যাত্রায় দিন ধার্য হয়েছিল ১৯শে ডিসেম্বর। এগারো (১১) জন শিশু শিল্পী সহ মোট ত্রিশ (৩০) জন মিলে দল গঠিত হয়। সিদ্ধান্ত হয় সড়ক ও রেল পথে যাবার। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা হয়। সাগর ট্র্যাভেল্সে প্রায় সবার টিকিট কাটা হয়। ১৯শে ডিসেম্বর বেলা এগারোটায় সাগর ট্র্যাভেল্সে চলে আসি। সোনাই (নীলাঞ্জনা) কে নিয়ে ও মালপপত্র গুছিয়ে চলে আসি। একে একে সবাই চলে আসল। National Youth Project এর কর্মকর্তাগণ আসলেন। এখানে সমস্ত শিশুদের গ্রুপ ছবি তোলা হয়। তারপর মালপত্র বাসে তুলে বসে যাই। গাড়ি কাটায় কাটায় একটায় ছেড়ে ছিল। সময় এর দিকে ট্র্যাভেল্স এর খেয়াল আছে। খুব সুন্দর বাস। বসার ব্যবস্থা ভাল। ত্রিপুরা পাহাড়ের জন্য বিখ্যাত। ত্রিপুরাকে তাই বলাই হয় পাহাড়ী রাজ্য। ধলেশ্বর, চন্দ্রপুর, রেশমবাগান, কাশীপুর, খয়েরপুর, রানিরবাজার, মোহনপুর পেরিয়ে জিরানিয়া— এখানে ত্রিপুরার বিখ্যাত জাতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি (এন.আই.টি)

অবস্থিত। তারপর ধনীনদীর সেতু, কলাবাগান পেরিয়ে চম্পকনগরে আসি। এই জায়গাগুলির রাস্তা সোজা— কারণ সমতল ভূমি।

সমতলের সোজা রাস্তা পেরিয়ে প্রথম দেখা মিলল বড়মুড়ার। পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা এঁকে বেঁকে চলেছে। আমাদের বাসও ঠিক সেইভাবে বাঁক নিতে নিতে চলল। বাস তেলিয়ামুড়ায় এসে পৌঁছাল। এবার শহরের ভিতর দিয়ে বাস অগ্রসর হচ্ছে। তেলিয়ামুড়া শহরের সঙ্গেই একটি নদী আছে নাম খোয়াই। তারপর তো বিরাট পাহাড়। নাম আঠারোমুড়া। যেমন উঁচু তেমনি লম্বা। যেন আর শেষ হয় না। আমি ও সোনাই (নীলাঞ্জসা) একই সীটে পাশাপাশি বসে আছি। পেটের ভিতর যেন মোচর দিয়ে উঠছে। তবে চোখ আছে বাইরে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছি দু'চোখ ভরে। যাইহোক পেরিয়ে আসলাম। বাস দু'এক জায়গায় থেমেছে। এরপর বাস এসে থামল পানিসাগরে। রাত তখন আটটা। রাতের খাবার সবাই খেয়ে নিলাম। এরপরের জার্নি তো বেশ স্বাভাবিক। বাস হুঁ হুঁ করে গতি বাড়িয়ে চলতে লাগল। মেঘালয়ের ভিতর দিয়ে চলেছি। পাহাড়ের পেট বেয়ে একবার উপরে ওঠা, আবার নীচে নামা। আঁকাবাঁকা পথ, তবে রাস্তা ভাল, মসৃণ। বাইরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে না। বাসে সবাই কম্বল মোড়া দিয়ে ঘুমাতে ব্যস্ত। ভোর হতে না হতেই অতি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখে পড়তে লাগল। বাড়িগুলি পাহাড়ের গা ঘেসে ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে। পথ ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। উপর থেকে নীচের দৃশ্য অথবা নীচ থেকে উপরের দৃশ্য অতি চমৎকার। রাতের বেলা বিজলীবাতির সারি দেখার মতো। কখন মনে হয়েছে যেন মর্তধামে আকাশের তারামন্ডল নেমে এসেছে। শিলং শহরটি অতি সমৃদ্ধ তাই এর রূপ যেন ফেটে পড়ে। অবশেষে ভোর বেলা শিলং শহর অতিক্রম করলাম। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে না হয়ে পারে না। 'শেষের কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ শিলং এর বর্ণনা দিয়েছেন। স্বপ্নের নগরীর ভিতর দিয়ে আমাদের বাসটি চলে গেল' আবেশে তাকিয়ে রইলাম দু'দিকে। গীর্জা, স্কুল, অফিসবাড়ি চোখে পড়ল।

কয়েকঘন্টার মধ্যেই আমরা ঈপ্সিত গুয়াহাটিতে এসে পৌঁছলাম। গুয়াহাটি মেট্রপলিটন সিটি। কাজেই আগরতলা থেকে অনেক বড়। সকল কিছুই যেন বেশি বেশি। বাস পল্টন বাজারে এসে থামল। কাছেই অগুনতি হোটেল। 'ময়ূর হোটেল'এ আমাদের ওঠার কথা ছিল। জায়গা না থাকায় আমরা 'ট্যুরিস্ট হোটেল'এ উঠি। একটা রাতের ব্যাপার।

হোটেলে স্নান-টান সেরে বেরিয়ে পড়ি খেতে অন্য সহযাত্রীদের সঙ্গে। খেয়ে দেয়ে দু'পাশের পশরা দেখতে দেখতে হাঁটছি। ফুটপাথ হকারদের দখলে। হরেক রকম জিনিসের মেলা। জিনিস দেখারও যে বিরাট আনন্দ! হোটেলে এসে বিশ্রাম নিলাম কিছুটা সময়। তারপর আবার বিকেলে বেরুলাম। রাস্তায় দেখা হয়ে গেল পিন্টু ও মন্দাক্রান্তার সঙ্গে। মন্দাক্রান্তা আমাদের টীম ম্যানেজার। এরা সাতজন উঠেছে গুয়াহাটি 'ইয়ুথ হোস্টেল'এ। ওদের সাথে ইয়ুথ হোস্টেলে গেলাম। তারপর কাছেই আছে নেপালি মন্দির। গেলাম দেখতে—মন্দিরে

কীর্তন হচ্ছে। এখানে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি স্থাপিত। ফুটপাথের দোকানপাট সত্যিই নয়নাভিরাম। আগুনে ছ্যাকানো কচি ভুট্টা পেয়ে গেলাম। দেরি না করে সোনাইকে কিনে দিলাম। অন্য দু'চারটি টুকিটাকি জিনিস কিনলাম। আমরা চা খেলাম। রাত ৮.৩০ মিঃ নাগাদ হোটেলের নীচে খেয়ে দেয়ে উপরে উঠি। কিছুক্ষণ টিভি দেখে তারপর ঘুম।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ভাবছি কী করা যায়! ২১শে ডিসেম্বর গুয়াহাটিতে স্ট্রাইক— গাড়ির চাকা ঘুরবেনা। এরপর দেখি মোটামুটি অনেক গাড়িই চলছে। হোটেলের ম্যানেজারের সাথে কথাবার্তা বলে খোঁজ খবর নিলাম। এরপর বেরিয়ে পড়ি। পিন্টু-মন্দাক্রান্তা এদের সাথে দেখা হল। এরা কামাক্ষা যাবে। পিন্টুর সাথে গুয়াহাটি রেল স্টেশনে আসি। বিরাট স্টেশান। আমরা পল্টন বাজার এলাকা থেকে পেছনদিক দিয়ে ঢুকি। আর বেরুলাম সামনা দিক দিয়ে। তারপর আমি সোনাইকে নিয়ে রিক্সা করে 'কাছারি' চলে আসি। ভাড়া পাঁচ টাকা। এখান থেকে আসাম রাষ্ট্রীয় পরিবহনের (ASTC) বাস ছাড়ে। বাস চলে আসল পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। উঠে বসলাম। ভাড়া পাঁচ টাকা করে। ব্রহ্মপুত্র নদের তীর ঘেঁসে রাস্তা। তাই ব্রহ্মপুত্র নদ অতি কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়ে গেল। নিজেকে ধন্য মনে করতে লাগলাম। আমাদের ত্রিপুরায় বড় নদী নেই— তাই জলের আকর্ষণ বোধ হয় একটু বেশীই আমার। বড় নদী বা সমুদ্র দেখলে মন হালকা হয়ে যায়। নদের তীরে সুন্দর বাগান করা আছে। নানা প্রকার গাছ ও ফুলে সুশোভিত। বাস পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছে। কামাক্ষা পাহাড় বেশ উঁচু। তবে রাস্তা বেশ চওড়া ও সুন্দর। রাস্তাকে আরো ভালো করার কাজ চলছে। পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে আমাদের বাস একেবারে মন্দিরের কাছে চলে এল। এখানে প্রচুর পান্ডা। এক পান্ডার সঙ্গে চলে গেলাম তাড়াতাড়ির জন্য। পুজো করে, মন্দির প্রদক্ষিণ করে তারপর সৌভাগ্য কুন্ড দেখলাম। ফেরার জন্য রওয়ানা হয়েছি। পথে প্রচুর খাবারের দোকান ও অন্যান্য জিনিসের দোকান। একটি ফটো কিনলাম। তারপর হালকা প্রাতরাশ (পুরি তরকারি) সেরে নীচে এসে দেখি প্রচুর অটো রিক্সা ও ট্যাক্সি। আমরা একটা প্রাইভেট কার পেয়ে যাই। এতে করে আমরা পল্টন বাজারের কাছে চলে আসি। তারপর রিক্সা করে হোটেলে ফিরি। বিকেল আড়াইটের ট্রেন ধরতে হবে। সেভাবে খাওয়া দাওয়া ও গোছগাছ সেরে নিলাম।

একুশে ডিসেম্বর সকাল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ফাঁকে ফোঁকরে অল্পস্বল্প বৃষ্টিও হয়েছে। দুপুরে যখন বেরুলাম তখন দেখি রাস্তা ভেজা। আমরা দুপুর একটায় তৈরি হয়ে যাই। কুলি ছাড়া গত্যন্তর নেই। একমাত্র কুলিই পারবে মালপত্র প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দিতে। কুলি ডাকা হল। বেশ কয়েক জন কুলি এল। কুলি যার যার মাল বহন করছিল- আমরা সেই কুলিকে অনুসরণ করে পেছন পেছন ছুটতে লাগলাম। আমার ও সোনাইর টিকিট ছিল আর.এ.সি। আগেই ইন্টারনেটে খোঁজ নিয়েছি আমাদের টিকিট কনফার্ম হয়েছে। কোচ নং পরে জানায়। তাই স্টেশনে ঢুকে প্রথমে কোচ নম্বরের খোজ করি। জেনে গেলাম পাঁচনং কোচ এবং সীট

নং ৪৫, ৪৬। কুলি সমস্ত মালপত্র ঠিক জায়গায় তুলে দিল। বিনিময়ে সে নিল চল্লিশ টাকা। সোনাইকে নিয়ে ঘর থেকে একা বেরিয়েছি—কিন্তু যখন যার কাছে কিছু জানতে চেয়েছি বা সাহায্য চেয়েছি তা যথাযথভাবে পেয়েছি।

গুয়াহাটি-দাদর এক্সপ্রেস দুপুর আড়াইটেয় ছাড়ার কথা। আমরা সবাই এসে আগে-ভাগেই বসে যাই ঠিকঠাকভাবে। ট্রেন নির্ধারিত সময়ে ছেড়ে দেয়। খুব উৎসাহ নিয়ে যাত্রা শুরু করি। দিনের বেলা ট্রেন চড়তে খুব ভাল লাগে—দু-পাশে সব কিছু দেখা যায়। কিন্তু ট্রেন ছাড়ার দু'এক মিনিটের মধ্যেই মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। গুয়াহাটি স্টেশন লাগুয়া ঝুপড়ির সারি আর শেষ হয়না। ঝুপড়িগুলির উপরে ছেড়া পলিথিন আর বেড়াগুলি প্যাকিং বাক্সের কাগজ দিয়ে তৈরি। মানুষ যে এত দীনহীন ভাবে থাকতে পারে তা না দেখলে জানা যায় না। একে একে বিভিন্ন স্টেশন পার হতে লাগলাম। কামাক্ষ্যা পাহাড় দেখা গেল, এখানে একটা স্টেশনও আছে। মালিগাও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়টি চোখে পড়ল। রঙ্গিয়া, বঙ্গাইগাঁও, তুনিয়া, কোকড়াঝাড় আরো কত কি স্টেশনে! ফকিরাপুর স্টেশনে ট্রেন থামল অনেকক্ষণ। রাতের খাবার আমরা এখানে পেয়ে যাই। প্রচন্ড ঠাণ্ডা। সুতরাং খেয়ে দেয়ে কম্বল টম্বল বের করে বিছানার ব্যবস্থা করে সবাই শুয়ে পড়ি।

পরদিন অর্থাৎ ২২শে ডিসেম্বর ২০০৪ইং সকাল পাঁচটায় ঘুম ভাঙ্গে। ট্রেন মালদা স্টেশনে দাঁড়ানো। ট্রেন এখানে বেশ কিছু সময় দাঁড়ালো। তারপর ট্রেন আবার চলতে শুরু করল। প্রকৃতি মুখ ভার করে আছে। কুয়াশাচ্ছন্ন সব দিক। বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে পরিষ্কার কিছু দেখা যায়না। হকাররা হরেক রকম সামগ্রী ও খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আসতে লাগল। চা-বিস্কুট দিয়ে দিন শুরু হল। ট্রেনের পেন্ট্রি থেকে এসে জল খাবার দিয়ে গেল। ব্রেড-বাটার এবং ভেজিটেবল কাটলেট, সঙ্গে টমাটো সস্। ইতিমধ্যে দুপুরের খাবারের অর্ডারও নিয়ে গেল।

শীতকালে প্রকৃতি নিরাভরনা হয়ে থাকে। শস্যক্ষেত্রগুলি ফসল শূন্য। বিস্তীর্ণ কোঠা করা ধান ক্ষেত। কদাচিৎ কোথাও অল্প স্বল্প শস্য চোখে পড়ে। ফাঁকা ক্ষেতে প্রায়ই বক পাখিদের দেখা যাচ্ছে—যেহেতু তুষার শুভ্র কাজেই দৃষ্টি এড়ায় না। সরষের ফুল কিছু কিছু চোখে পড়ল। প্রচুর খেজুর ও তালগাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে-বিভিন্ন উচ্চতায়।

ঝাড়খন্ডের ভিতর দিয়ে যাবার সময় পথের পাশে প্রচুর পাথর টাঁই করা ছিল। এগুলি অন্যত্র নিয়ে যাবার জন্য—বড় টুকরাও ছিল, আবার কুচিও ছিল। কখনও সমতল দিয়ে আবার কখনো পাহাড়ের গা ঘেসে ট্রেন যাচ্ছিল। সাহিবগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত ঝাড়খন্ড ছিল।

এরপর ট্রেন ঢুকল বিহারে। এখানে মাঠে কিছু কিছু সবুজের ছোয়া দেখা গেল। ট্রেন যত এগুতে লাগল ততই সুন্দর শস্যরাজি দেখলাম। সরষের ক্ষেত উল্লেখ করার মতো। এছাড়া টমেটো, আখ, জোয়ার, বাজরা ইত্যাদিও ছিল। অন্যান্য ফসলের জন্য ক্ষেতগুলি টুকরা টুকরা

করে তৈরি করা ছিল। দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য দেখতে দেখতে চলতে লাগলাম। দুপাশের জলা ভূমিতে প্রচুর জলজ উদ্ভিদ। এগুলিতে বেশ সুন্দর বেগুনি, সাদা রঙের ফুল হেলায় ফুটে রয়েছে।

ভারতবর্ষে একেবারে নিম্ন আয়ের মানুষ যারা (বি.পি.এল) তারা খুপড়ি ঘরে বাস করে। এখানে কত ধরনের খুপড়ি যে আছে-তা ট্রেনে ভ্রমণ করলে চোখে পড়ে। বাক্সের কাগজে, পাতায়, পলিথিনে, পাথরে, ইটে এবং টিনে আরো কত কি? টালির ছাদও চোখে পড়ে। কোন বিদেশী আমাদের দেশে রেলে দুদিন ভ্রমণ করলে এখানকার মানুষের অর্থনৈতিক চিত্রটি বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না। বিভিন্ন ধরনের খুপড়ি ঘরের চিত্র এবং হকারদের অবস্থা দেখে তাদের জীবনযাত্রা অনুমান করা খুবই সহজ হবে।

গুয়াহাটি থেকে আমাদের সঙ্গে একটি মুসলিম পরিবার উঠেছিল। একই কোপে আমরা যাচ্ছিলাম। ওবা আসামেব হোজাই থেকে এসেছিল। মা-বাবা, তিন ছেলে। মা ছেলেদের নিযে হোজাই থাকেন। ডন্‌বস্‌কো স্কুলে ছেলেদের পড়ান। এদের আসল বাড়ি করিমগঞ্জে। ভদ্রলোক মোম্বাই থাকেন। সেখানে তিনি পাবফিউমের ব্যবসা করেন।

বিহারে মোটা পলিথিনের পাইপ দিয়ে জমিতে জলসেচ করে চমৎকার রবিশস্য হচ্ছে। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। প্রচুর মোষ দেখা গেছে। ট্রেনে মোষের দুধের সন্দেশ ও রসগোল্লা পাওয়া গেল। ক্ষেতের মধ্যে বহু মহিলা শ্রমিক আগাছা পরিষ্কারের কাজ করে। ধানের রোয়া লাগানোর কাজেও মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা কম নয়। এছাড়া দৈনন্দিন জীবনে রাস্তার বিভিন্ন কাজে ও গৃহ নির্মাণের কাজে প্রচুর নারী শ্রমিকদের নেওয়া হয়। চা-বাগানে মহিলা শ্রমিক অতি সুপরিচিত। একটা বিরাট অংশের মেয়েরা গৃহস্থের বাড়িতে ঝি এর কাজ করে থাকে। মহিলাদের বিভিন্ন কাজে নিযুক্তির বহর দেখে রাষ্ট্রসংঘের একটি পরিসংখ্যান এর কথা মনে পড়ে। রাষ্ট্রসংঘের হিসেব অনুযায়ী নারীরা পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ কাজ করে; আয় করে দশ ভাগের এক ভাগ; আর পৃথিবীর মোট সম্পত্তির মাত্র একশ ভাগের এক ভাগ নারীদের অধিকারে। ৫০ শতাংশ খাদ্য উৎপাদিত হয় নারীদের দ্বারা।

চাষীরা তাদের গরু-মোষগুলিকে নিজ সন্তানবৎ স্নেহে লালন-পালন করে। বহু গরু এবং মোষের গায়ে শীত নিবারণের জন্য বস্তা জড়িয়ে রাখতে দেখা গেছে। আর সরষে ক্ষেতের কথা বারবারই বলতে ইচ্ছে করে— কারণ কিছুটা পর পরই বিরাট বিরাট সরষের ক্ষেত দেখা যায়। মনে হয় যেন হল্‌দে গালিচা পাতা।

বাইশ তারিখ (ডিসেম্বর) বিকেলের দিকে রৌদ্রের ঝিলিক দেখা দিল, তবে কুয়াশা কাটেনি। দৃষ্টি বেশি দূর পৌঁছায় না। বিকেলে সূর্যকে দেখা যাচ্ছিল বড় থালার মত। মেঘ একবার ঢাকে একবার উন্মুক্ত করে। সূর্য ও মেঘের লুকোচুরি খেলা চলছিল। সূর্যের কোন তেজ নেই একেবারে শান্ত, স্নিগ্ধ। সমগ্র প্রকৃতি জগৎকে আবিষ্ট করে রেখেছিল।

আমাদের ট্রেন গুয়াহাটি দাদর এক্সপ্রেস বিকেল পাঁচটায় পাটনা জংসনে পৌঁছায়। বিহারের রাজধানী পাটনা। স্টেশনটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বিরাট স্টেশন। ট্রেন এখানে ১৫ মিনিট দাঁড়াল। রিজার্ভ কামরায় প্রচুর যাত্রী উঠে গেল। তাতে আমাদের দূর পাল্লার যাত্রীদের অসুবিধা হল। আমরা দীর্ঘ সময় ট্রেনে থেকে শ্রান্ত-ক্লান্ত। অনেকের সঙ্গে বাচ্চাকাচ্চা আছে। এ সমস্ত অবৈধ যাত্রীদের জন্য মূল যাত্রীদের নানা দুর্ভোগ পোয়াতে হয়। বিহারের আইন শৃঙ্খলা ঢিলেঢালা-এ অপবাদের চাক্ষুস প্রমাণ হল। আইন শৃঙ্খলার দিকে রেল দপ্তর আরো একটু কড়ামনোভাব নিতে পারে।

এরপর ট্রেন দানাপুর এসে থামল। বক্সার হল বিহারের শেষ স্টেশনে। তারপর উত্তর প্রদেশে প্রবেশ করলাম। তেইশ তারিখ (ডিসেম্বর, ২০০৪ইং) সকালে প্রচন্ড ঠান্ডা। একটি ছোট স্টেশনে আসলাম। সূর্যকে দেখা গেল। সকালের সূর্য ঝকঝকা চক্চকা। বড় সোনার থালার মতো। কিন্তু আকাশে প্রচুর মেঘ থাকাতে ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। মেঘের আড়াল থেকে সূর্যকে উঁকিঝুকি দিতে দেখা যাচ্ছিল। কারণ, আকাশে তখন প্রচুর মেঘের দাপট। দুপাশে উঁচুনীচু জমি। কিছু পাথুরে টিলাও চোখে পড়ল। নীচু জায়গায় কিছু কিছু শস্যাদি গাছ। আবার দূরে উঁচু পাহাড়ও দেখলাম। রাস্তার পাশে তেঁতুল গাছ, আম গাছ, কূল গাছ, নীম গাছ— আরো কত নাম না জানা গাছ দাঁড়ানো। ডাল্ডি স্টেশন পেরুলাম। রাস্তায় কাজু বাদামের বাগান, বড় বড় প্রচুর বেল গাছ রাস্তার দু'পাশে রয়েছে। সিহোরা রোড স্টেশন পেরিয়ে গেল আমাদের ট্রেন। গোসালপুর নাম লেখা দেখলাম। ইটভাটা আছে রাস্তার পাশে। টালির ঝুপড়িঘর প্রচুর। দেবরী স্টেশন অতিক্রম করলাম। টালির ঝুপড়ি লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে।

জব্বলপুরের দিকে ট্রেন এগিয়ে চলেছে। পাহাড়ের মাঝখানে ট্রেন দাঁড়াল অন্য ট্রেনকে পাশ দেবার জন্য। পাহাড়ে প্রচুর পাথর। কিছুটা সামনে যাবার পর রাস্তার দুপাশে প্রচুর বড় বড় আবাসন দেখা গেল, তিন-চার তলা বাড়ি। শহরের দিকে রাস্তা ঢুকে পড়েছে। আমরা জব্বলপুর পৌঁছাই সকাল নয়টায়। ট্রেন এখানে ১৫ মিনিট দাঁড়াল। গরম গরম আলুর বড়া ও ডালের বড়া কিনে খেলাম। আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন—তবু অল্প রোদ এর অস্তিত্ব পেলাম। ট্রেন ছুটতে লাগল। জায়গাটা যে সম্মৃদ্ধ তা টের পাওয়া গেল। তবে ঝুপড়ি ঘরের অভাব ছিল না। কয়েকটি স্টেশান পার হবার পর দুপাশে প্রচুর শস্যভূমি দেখতে পেয়েছি। ক্ষেতে বিভিন্ন শস্যগাছ লাগানো হয়েছে। ক্ষেতগুলি একেবারে সবুজ। মেসিনের সাহায্যে জলসেচ হতে দেখলাম। লাইন করে ফোয়ারার সারি। বিনা পয়সায় অপরূপ দৃশ্য দেখা হল। Indian Oil এর বিশাল বিশাল তেলের ডিপো দেখলাম। ট্রেনে বসে বড় বড় পেয়ারা পেলাম — জোড়া ৫ টাকা। ট্রেন যত এগিয়ে যাচ্ছিল তত বিস্তীর্ণ নয়নাভিরাম শস্যক্ষেত্র চোখে পড়ল। আখ ক্ষেতও ছিল। 'Bread Basket' এর ভিতর দিয়ে যে চলেছি তা বুঝা গেল।

সামনে বসা মুসলিম বৌ এর সাথেও মাঝে মাঝে গল্প হয়েছে। তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান

সম্বন্ধে খোঁজ নেই। আসামের হোজাই থেকে এসেছিল ওরা। বৌ বলল, 'আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠান অনেকটা হিন্দুদের মত হয়ে গেছে। কনেকে সাজিয়ে বসায়, বরযাত্রী বরকে নিয়ে আসে। আপনাদের পণ্ডিতের বদলে আমাদের পীর বা মৌলবি আসেন। মেয়েকে বিভিন্ন দান সামগ্রী দেওয়া হয়।' জিজ্ঞাসা করলাম ছেলের বাড়ি থেকে কোন দাবী দাওয়া করে নাকি? উত্তরে জানাল, 'না, ছেলের বাড়ি থেকে দাবী-দাওয়ার রেওয়াজ নেই।' বৌ-এর হাতে বাঙ্গালি হিন্দুদের মত লাল পলা ছিল। মুসলিম ভদ্রলোক খুব স্নেহ বৎসল। ছেলেদের দিকে বেশ লক্ষ্য রাখছিল এবং বিভিন্ন খাবার জিনিস কিনে দিচ্ছিল। ভদ্রলোক ভারতের বেশ প্রশংসা করল—ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে। এখানে মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পাারে। বোরখা পরা বাধ্যতামূলক নয়। এসব ওনার ভাল লাগে। তবে তিনি কিন্তু মুরগীর মাংস নেননি—মুরগী যেহেতু জবাই করে কাটা নয়। এ কথাটা প্রকাশ করতেও পিছপা হননি। মুসলিম ভদ্রলোক ট্রেনে নিরামিস ও ডিম খেয়েছেন।

শালিচৌকা রোড স্টেশনে ট্রেন আবার দাঁড়াল দু-মিনিট। শস্যক্ষেত্রের মাঝে মাঝে বড় বড় বৃক্ষ দন্ডায়মান। মাঝে মাঝে আমের বাগান চোখে পড়েছে। একটি বড় নদী অতিক্রম করলাম। বেশ গভীর ও প্রশস্ত—তবে জল নেই। শীত আস্তে আস্তে কমতে লাগল। উজ্জ্বল রৌদ্র চারদিকে। সবকিছু ঝলমল করছিল সূর্যালোকে। সামান্য জলাতে বিরাট বকের দলের দেখা পেলাম। তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছে হয়। বনখেরি (Bankhedi) স্টেশন পেরিয়ে গেলাম। রাস্তার পাশে বিরাট শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত—শুধু গাছ লাগানোর অপেক্ষা। বাগরা তাওয়া (Bagra Tawa) স্টেশন পেরিয়ে বড় বড় পাথরের টুকরার টাঁই দেখা গেল। বাগরা তাওয়া স্টেশনের পর একটা টানেল পেলাম। তাওয়া ব্রীজ ও নদী পেরিয়ে সামনে যেতে লাগলাম। নীচু ও উঁচু জমি— তবে প্রচুর শস্যক্ষেত্র এবং গাছ-গাছালি দুদিকে। দূরে শৈল শ্রেণি দন্ডায়মান। সন্তালাই (Santalai) স্টেশন অতিক্রম করলাম। কাঁটা গাছের প্রচুর ঝোপ দুদিকে।

আমাদের ট্রেন মধ্যপ্রদেশে ঢুকে পড়েছে। দুদিকে শস্যক্ষেত্র আর কাঁটা গাছ। অনুচ্চ কাঁটা গাছের ঝোপগুলি শস্যক্ষেতের মাঝে এবং কিনারে রয়েছে। শস্যক্ষেত্র সবুজ। কৃষকেরা ক্ষেত পরিচর্যা করছে। সার দিচ্ছে ছিটিয়ে। ক্ষেতগুলিতে জলসেচ করা হয়েছে। তাই যথেষ্ট ভেজা ছিল। ইতারসি জংশনে (Itarsi Jn.) এসে দাঁড়াল ১৫ মিনিট। স্টেশনে ভাল ভাল খাবারের ব্যবস্থা ছিল। ভাল ফল ও ছিল। ট্রেন আবার চলতে শুরু করল। দুপাশে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট কাঁটা গাছের ঝোপ। মনে হয় যেন কাঁটা গাছের বাগান সযত্নে করা হয়েছে। মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত রুক্ষ। তাই শস্য তেমন আর দেখা যাচ্ছিল না। পাথুরে মাটি। বহু জাগয়া খালি পড়ে আছে। মাঠে ছাগলের পাল পাওয়া গেল। পাহাড়ে বিশেষ কোন উঁচু বৃক্ষ নেই। গরু-মোষের পাল ফাঁকা মাঠেই চরছিল। সবুজ ঘাসের দেখা নেই।

খাড্ডোয়া জংশনে ট্রেন আসে ৩টা ৩০ মিনিটে। দশ মিনিট দাঁড়ায় এখানে। সোনাইকে

থামস্ আপ্ কিনে দিই। ট্রেন আবার চলতে শুরু করল। দুপাশে একই দৃশ্য— তবে অতিরিক্ত ছিল দুপাশে বোগেন ভেলিয়ার সারি। চমৎকার দেখাচ্ছিল। ধূসর মৃত্তিকাই বেশি, মাঝে মাঝে সবুজ কৃষি। এর পর পেয়ে গেলাম বড় বড় কলা বাগান। সবুজ পাতা— মনে হয় এর চেয়ে পবিত্র বুঝি আর কিছু নেই। বিভিন্ন আকারের কলা গাছের বাগান। যেন ভগবানের অপূর্ব সৃষ্টি। সিঙ্গাপুরী কলা গাছ সাইজে ছোট হয়— কিন্তু কলাগুলির সাথে আমরা সবাই পরিচিত— বড় বড় কলা— সুস্বাদু ও সুমিষ্ট। এদিকে প্রাকৃতিক বনায়ন প্রায় নেই বললেই চলে। মাঠগুলিতে ঘাস নেই— যা আছে শুকিয়ে গেছে। কলাবাগানগুলি কী অপরিসীম যত্নে ও পরিশ্রমে তৈরি করা হয়েছে। চর্তুদিকে ধূসর প্রান্তর মাঝখানে যেন ওয়াসিস্ (Oasis)।

দরগা-ই-হাকিমি (DARGA-E-HAKIMI) জংশনের কাছেও প্রচুর কলাবাগান চোখে পড়েছে। দরগা-ই-হাকিমির পর থেকে যত মহারাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে গেছি ততই রাস্তার দু'ধারে কলা বাগানের সারি দেখা গেছে। মাইলের পর মাইল কলা বাগান আমি জীবনে প্রথম দেখি। সত্যি, ভগবানরূপী মানুষই-এ অপূর্ব সৃষ্টি করতে পারে। যে কলাগাছগুলি ফল দিয়ে সেরেছে- সেগুলিকে মাটি থেকে কিছুটা উপরে কেটে ফেলা হয়। তারপর মূল গাছটির গুড়ি থেকে বহু চারা জন্মায়। সেই চারাগুলি অন্যত্র ক্ষেত্র প্রস্তুত করে লাগানো হয়। তারপর জল ও সার দেওয়া হয় প্রয়োজন মতো। যত কলাবাগান দেখেছি তাতে মনে হয়েছে এখানকার কলা ভারতের নাগরিকদের হয়ে বিশ্বের আরো বহু দেশের নাগরিকদের মুখের লালসা নিবৃত্ত করতে পারবে।

তাপ্তী নদী পেরিয়ে আসলাম। বিরাট নদী, কিন্তু শুকনো। জল নেই বললেই চলে। পাথুরে নদী। ভুসাবল জংশনে ট্রেন থামল প্রায় তিরিশ মিনিট। জংশন সংলগ্ন এলাকায় প্রচুর ঝুপড়ি ঘর দেখা গেছে। চাল টিনের। এক সঙ্গে গাদাগাদি করে ছিল। সন্ধ্যা ছয়টা বেজে ১৫ মিনিট। তাই অন্ধকার নেমে এসেছে বিশেষ কিছু আর দেখা যায়নি।

জলগাও জংশনে আমরা পৌঁছলাম সন্ধ্যা সাতটায়। এখান থেকে সারা মোম্বাই শহরে জল সরবরাহ করা হয়। বর্ষার জল বড় বড় জলাধারে সঞ্চয় করে রাখা হয়, পরে সেই জল প্রক্রিয়াকরণ করে সরবরাহ করা হয়। এখানে ট্রেন প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়াল। ৭:৪৫ মিনিটে ট্রেন আবার ছাড়ল। অন্ধকারে দূরে আলোকমালা দেখা যাচ্ছিল শহরের। আরো দূরে পাহাড়ের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছিল। এরপর জানলা বন্ধ করে দেওয়া হয় নিরাপত্তার জন্য। আস্তে আস্তে খেয়ে দেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়ি। পরদিন ভোরে অর্থাৎ ২৪শে ডিসেম্বর আমাদের ট্রেন দাদর এসে পৌঁছায়। গুয়াহাটি-দাদর এক্সপ্রেস সাতটি রাজ্য ছুঁয়েছে— অসম, পশ্চিমবাংলা, ঝাড়খন্ড, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র। দাদর স্টেশনে মালপত্র নামিয়ে রেখে অপেক্ষা করি। হোটেল ঠিক করা হল। নাম 'হোটেল-আল্-করিম', ডোংরী রোড, মোম্বাই ৪০০০০৯, দূরভাষ নং-২৩৭৭-৮৭৭০, ২৩৭৮-১৮১৪। আমরা সবাই হোটেলে চলে যাই।

'হোটেল-আল-করিম' একটু ভিতরের দিকেই ছিল— তবে সর্বসুবিধাযুক্ত। মনে হয়েছে যেন বাড়ি ঘরেই আছি। হোটেলে এতগুলি লোক পরিচিত-এটা একটা বিরাট সহায়। ছাদে কাপড় শুকিয়েছি— কোন ইতঃস্তুতঃ ছিল না চলা ফেরায়। আমরা স্নান-খাওয়া দাওয়া সারি। আর এদিকে হোটেল থেকে ট্যুরিস্ট বাসের ব্যবস্থা করা হয়। সবাই মিলে গিয়ে বাসে ওঠি। বাস সময়মত ছেড়ে দিল। মোম্বাই শহর ঘুরতে যাচ্ছি মনের অনুভূতিই আলাদা।

গাইড সঙ্গে আছে—কাজেই আরো নিশ্চিন্ত। মোম্বাই শহরে বিরাট লম্বা উড়ালপুল। চওড়া রাস্তা উপরে নীচে সমানে। যানজট এর ঝামেলা নেই। দুপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে যাচ্ছি। বাস প্রথমে চলে আসল গেইট-ওয়ে-অব-ইন্ডিয়াতে। এখানে বেশ কিছু সময় দিল দেখার জন্য। আমরা ঘুরে ফিরে দেখলাম এবং ছবিও তোলা হল। এখানেই তাজ হোটেল—নূতন এবং পুরাতন দুটিই দেখলাম। তারপর বাস ধীর গতিতে চলতে লাগল। আর আমরা বাসে বসেই রাজা ভাই টাওয়ার, বোম্বে হাইকোর্ট, সাইন্স ইনষ্টিটিউট, মন্ত্রণালয় —এসব গাইডের সাহায্যে দেখি। তারপর নরিম্যান পয়েন্টে দেখি এ্যাসেম্বলি হাউস, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কমন বন্ড, ওয়ার্লড ট্রেড শপিং সেন্টার, হোটেল ওবেরয়, রিজারভেশন কাউন্টার ইত্যাদি।

তারপর আসি ম্যারিন ড্রাইভে। এটা U আকারের। তখন ঝলমলে রোদ। বাসে বসেই সাগর দেখি। বিভিন্ন আকারের জাহাজ ও নৌকা সাগরে ভাসমান। মহারাষ্ট্রের মহানগরী আমাকে একেবারে মুগ্ধ করে রেখেছে। সামুদ্রিক পখিগুলি যেন সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে তুলেছে। একদিকে ইট-পাথর কংক্রীটের বিশাল বিশাল নানা অট্টালিকা, আর একদিকে অপার সমুদ্র। রাজভবন, ওয়াংখেড়ে স্ট্যাডিয়াম, সুনীল শেঠির বোটিং ক্লাব দেখে তারপর আমাদের বাস আসে নানা-নানীর গার্ডেনে। তারপর গীরগাও বীচ, মারবার হিলস, জৈন মন্দির হয়ে বাস কমলা নেহেরু পার্ক এর সামনে এসে থামে। রাস্তার বাঁ পাশে হ্যাঙ্গিং গার্ডেন আর ডান পাশে কমলা নেহেরু পার্ক। এখানে বড় বড় প্রচুর গাছ আছে। বিভিন্ন খাবার দাবারের ব্যবস্থা আছে। পানীয় জল আছে। জায়গাটা চমৎকার। মোম্বাই শহরে এ ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ আছে—না দেখলে বিশ্বাস হবার নয়। তারপর বাস গিয়ে থামল 'মহালক্ষ্মী মন্দির' এর কাছে। বেশ হেঁটে মন্দিরে লাইন করে পূজা দেবার ব্যবস্থা। অনেকটা সময় এখানে চলে গেল। যাক সবাই এসে বাসে আবার বসি। টাওয়ার অব্ সাইলেন্স, রেসকোর্স পার্ক হয়ে চলে যাই নেহেরু সাইন্স সেন্টারে। এখানে অডিটোরিয়াম আছে। ঘুরে ফিরে সবাই দেখল। নীচে অর্থাৎ গ্রাউন্ড ফ্লোরে খাবারের চমৎকার ব্যবস্থা। সবাই কোপন কেটে পছন্দমত খাবার খেতে পেল। বিভিন্ন ধরনের খাবার আছে। আমি ও সোনাই রাইস মিল খাই—চলিশ টাকা করে প্রতি মিল। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ধীরে সুস্থে আবার আমরা রওয়ানা হই। দূরদর্শনকেন্দ্র, থাপার হাউস, এ্যায়ারপোর্ট দেখে সোজা আমাদের বাস চলল ফিল্ম সিটির উদ্দেশ্যে। এটাকে আবার 'ছোটা কাশ্মীর'ও বলে। এখানে প্রচুর বড় বড় গাছ। পাহাড়ে থরে থরে সাজানো গাছ-গাছলি। নীচে

উপরে সর্বত্রই বাগান। যথেষ্ট পরিচর্যায় আছে দেখলে বুঝা যায়। পানীয় জল ও শৌচাগারের বন্দোবস্ত আছে। প্রচুর গাড়ি এখানে দাঁড়িয়ে ছিল। লোক প্রচুর। স্ন্যাকস এর অনেক দোকান। চা-কফি, ঠান্ডা পানীয় সবই আছে। সুতরাং সবাই টিফিন সেরে গাড়িতে গিয়ে বসল। শহরের মানুষ সবুজের আকর্ষণে এসব জায়গায় আসে-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপরূপ। এবার আমরা গুলমোহর বীচ হয়ে জুহু বীচের দিকে রওয়ানা হলাম।

জুহু বীচের আগে ইসকন মন্দিরের কাছে আমাদের বাস দাঁড়ায়। ইসকন মন্দির দেখে তার পর সবাই জুহু বীচে যাই। তখন সূর্য ডুবে ডুবে। তাড়াতাড়ি ছবি তোলা হল। এরপর সবাই বেশ কিছু সময় সামুদ্রিক হাওয়া ও সৌন্দর্য উপভোগ করল। জুহুবীচের স্পর্শে যেন আলাদা অনুভূতি জোগায়। এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বীচ কম আছে। পরিবেশও সুন্দর। সারা দিনের ক্লান্তি সব এখানে ধুয়ে মোছে গেল। অল্প বিস্তর সবাই জলে নেমেছে। ঢেউ এর ধাক্কা সবাই অনুভব করেছে। আমার তো ঝিনুক কুড়ানো এক নেশা। জুহু বীচ ছেড়ে চলে আসতে মন চাইছিল না। সবার মন যেন এখানে এসে আরো খুলে গেল। সবাই আরো থাকতে চায় এখানে।

দিনটি ছিল চব্বিশে ডিসেম্বর। বড়দিন উপলক্ষে সারা শহরই আলোর মালায় সুসজ্জিত। মনে হয়েছে যেন স্বপ্নপুরীর ভিতর দিয়ে চলছি। দীর্ঘপথে কয়েকটা বিয়ের অনুষ্ঠানও দেখেছি। ফাঁকা মাঠে আলোর রোশনাই ছড়িয়ে বিয়ে বাড়িগুলি সাজানো হয়। আর সঙ্গে থাকে ফুলের বাহার। আলোর মালা, ফুলের মালা এবং তোড়া দিয়ে বিয়ে বাড়িগুলি অপরূপ হয়ে ওঠে। রাত নটা নাগাদ আমরা হোটেলে পৌঁছি। বিশ্রাম-খাওয়া-দাওয়া সারি।

পরদিন পঁচিশে ডিসেম্বর। ছোট গ্রুপ করে আমিও মনিদীপা নীলাঞ্জসা ও হৃদিনাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। উদ্দেশ্য মোম্বাই বাজার দেখা। ট্যাক্সি করে মহাত্মা মার্কেটে চলে যাই। এখানে বিরাট বড় বাজার। একই ছাদের তলায় কী যে নেই? আমরা পোশাক, গয়নাগাটি কিনি। বেশ সস্তাই হয়েছে।

তারপরদিন অর্থাৎ ছাব্বিশে ডিসেম্বর চলে যাই দাদর। এখান থেকেই গোয়ার বাস ছাড়বে। মালপত্র একটা হোটেলে রেখে বেরিয়ে পড়ি বাজার দেখতে। সবাই যার যার মত করে দাদরে কেনাকাটা করল। এরপর সন্ধ্যায় বাসে করে গোয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। পথে বাস থামিয়ে খাওয়া দাওয়া হল। বাস চলতে লাগল পাহাড়ের ভিতর দিয়ে। তবে অনুচ্চ পাহাড়। পরদিন ভোরবেলা অর্থাৎ সাতাশে ডিসেম্বর বাস থামল এবং আমরা চা-টা খেয়ে নিই। জল ও বাথরুমের সুব্যবস্থা ছিল। পানাজি গিয়ে পৌঁছাই বেলা এগারোটা নাগাদ। সেখান থেকে অন্য একটি বাসে করে আমরা কারকোরেমে যাই যেখানে চতুর্থ জাতীয় শিশু উৎসবের প্রস্তুতি শেষ। কারকোরেম দক্ষিণ গোয়াতে অবস্থিত। আমরা গিয়ে যথারীতি শিবিরে যোগদান করি। অনেকে ছাব্বিশ তারিখই পৌঁছে যায়।

সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা পর্যন্ত সারাদিন নানা কর্মসূচী। ছেলেমেয়েদের সন্ধ্যাবেলা স্থানীয় বাড়িতে নিয়ে যেত। উদ্দেশ্য মেলামেশা এবং মত বিনিময়। পরদিন সকাল বেলা ওরা বন্ধুর বাড়ি থেকে চলে আসত। এসে আটটায় অনুষ্ঠানে যোগদান করত। একটি বিরাট স্পোর্টস কমপ্লেক্স-এ অনুষ্ঠানটি হয়েছিল। বিরাট মাঠ। পাশে জিমনেসিয়াম হল। মাঠের এক প্রান্তে বিরাট প্যান্ডেল করা হয়। শিশুদের বসার ব্যবস্থা শতরঞ্জিতে। আর অভিভাবক কর্মকর্তাদের জন্য চেয়ার। বিরাট স্টেজ। মাইকের ব্যবস্থা অতি উত্তম। মোটামুটি অনুষ্ঠানসূচি ছিল—

১) সকাল সাড়ে আটটায় জমায়েত।
২) সকাল নয়টায় পতাকা উত্তোলন।
৩) সাড়ে দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত বিশেষ কার্যক্রম— ছবি আঁকা ইত্যাদি।
৪) আটাশে ডিসেম্বর শুভারম্ভের বিশেষ অনুষ্ঠান হয়, সাড়ে নটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত।
৫) সকাল নটায় স্ন্যাক্স এর আয়োজন ও চা টিফিন থাকত।
৬) দুপুর বারোটা থেকে দেড়টার মধ্যে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা।
৭) বিকেল চারটা থেকে পাঁচটা বিভিন্ন খেলাধূলার আয়োজন।
৮) বিকেল পাঁচটা থেকে ছটা বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত শিশু শিল্পীদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শন।
৯) সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টা প্রার্থনা।
১০) সাড়ে ছ'টার পর শিশুরা স্থানীয় বন্ধুদের বাড়ি যেত।

এরূপ ছিল দৈনন্দিন রুটিন। গোটা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করতেন ডঃ এস.এন. সুব্বারাও। শৃঙ্খলা পরায়নতা, দেশপ্রেম, আদব-কায়দা, জাতীয় সংহতি ইত্যাদির উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি প্রয়োজনে শিশুদের প্রশংসা করেছেন আবার ভর্ৎসনাও করেছেন। শিশুদের সার্বিক চবিত্র গঠনের উপর আলোকপাত করেছেন। কথাবার্তা অত্যন্ত খোলামেলা ও ঘরোয়াভাবে হয়েছে। গোটা অনুষ্ঠানটি এত সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হয়েছে যে তা উত্তম প্রশংসার দাবি রাখে।

৩০শে ডিসেম্বর সমস্ত শিশু (বহিরাগত ও স্থানীয়), অভিভাবক, কর্মকর্তাগণ, নিমন্ত্রিত অতিথি সবাইকে নিয়ে প্রায় পঁচিশটি বাস সকাল দশটায় রওয়ানা হয় দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের জন্য। মপাসাতে নেমে বাচ্চাদের লাইন করে সেন্ট জাভিয়ার্স চার্চ দেখাতে নেওয়া হয়। এই চার্চটি বড়দিন উপলক্ষে সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য খোলা হয়। তাই দর্শনার্থীর প্রচন্ড ভিড়। শায়িত মরদেহ দেখতে হলে বিরাট লাইন, অন্তত দুই ঘন্টা সময় লাগবে। চার্চের ভিতর দেখে আমরা বেরিয়ে পড়ি। বিরাট চার্চ। ভেতরের কারুকার্য দেখার মত। ফটো নিয়েছি।

আর সেন্ট জাভিয়ারের শায়িত ফটো কিনে নিলাম দশ টাকায়। চার্চের ভেতরে অনেকে

বসে আছে। আর প্রাঙ্গনে হাজার হাজার লোকের বসার জন্য চেয়ার পাতা। এখানে খ্রীষ্টানদের প্রার্থনা সভার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাইবেল পাঠ চলছিল। বড়দিন উপলক্ষে এই ঐতিহাসিক চার্চটি দশদিন খোলা থাকবে। এই চার্চটি ওল্ড গোয়াতে।

বেলা একটায় সমস্ত বাস আমবাগানে নিয়ে আসা হয়। পূর্বেই কর্মকর্তাগণ পৌঁছে যান খাবার ও জলের গাড়ি নিয়ে। কাগজের প্লেইট, চামচ ও জলের পাউচ সবার হাতে হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। তারপর খাবার বিতরণ করা হয় তাদের পদ্ধতিসুলভ সুশৃঙ্খলায়। বড় বড় ডাস্টবিন ছিল। খাবার পর সমস্ত প্লেইট, চামচ, জলের শূন্য পাউচ ডাস্টবিনে ফেলা হয়। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা লাইনে সকল কিছু করল। সঙ্গে একটি অ্যামবুলেন্সও ছিল। একটি মন্দিরও পাওয়া গেল।

খেয়ে দেয়ে পানাজির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই দুপুর আড়াইটেয়। প্রথমেই চোখে পড়ে নানা আকারের বাগান। ডঃ বি.আর.আম্বেদকর পার্ক, শহরের মাঝখানে ছোট জাহাজ মান্ডবী নদীতে। পানাজি মান্ডবী নদীর তীরে অবস্থিত। নদীর তীর বরাবর অনেকটা পথ যাচ্ছি— দেখতে পেলাম ছোট-বড় নানা আকারের ফুলের বাগান। কলা এ্যাকাডেমী, হেলথ সার্ভিস, রিলায়েন্স ওয়েব ওয়ার্লড, সুইমিং পুল, কামাত হসপিটেল, গোয়া সাইন্স সেন্টার ইত্যাদি। বাস্তাব পাশে বড় বড় ঝাউগাছ, কাজুবাদাম গাছ। ক্র্যাস্ট বাজার, মীরামার বীচ, ভগবান মহাবীর বাল বিহার, গোয়া প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, গোয়া ড্যান্টেল কলেজ এবং হসপিট্যাল পেরিয়ে আমাদের বাসগুলি মারগাও এর দিকে রওয়ানা হল। লেইকে অসংখ্য বক এবং মাঠে মোষ চড়ছিল। উড়াল পুল আছে —যানজট হয় না। মারগাও হয়ে ক্যাম্পে পৌছাই সন্ধ্যা ছটায়।

এবার একটু পেছনে যাই। আটাশ তারিখ বিকেল পাঁচটায় যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয় তার সবটা আমি চাক্ষুষ করেছি। একঘন্টায় অনুষ্ঠানটি নিম্নরূপ—

১) কুর্মি নাচ-অনুষ্ঠানটি গোয়ার শিশুরা প্রদর্শন করেছে।
২) বিহু নাচের মাধ্যমে আসামের শিশু শিল্পীরা নূতন বছরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।
৩) রাজস্থানী নাচ—দিল্লীর দুটি মেয়ে সবুজ ঘাগরা ও লাল উত্তরীয় পরে প্রদর্শন করেছে।
৪) ট্রাইবেল নাচ—কৃষকদের-অরুণাচল প্রদেশের সাতটি মেয়ে লাল পাছরা, সাদা শার্ট এবং কালো জ্যাকেট পরে পরিবেশন করেছে।
৫) মহারাষ্ট্রের ছেলে ও মেয়েরা সমবেতভাবে দেশাত্মবোধক গান করেছে— সারে জ্যাঁহা সে আচ্ছা......।
৬) একক নৃত্য—নাগাল্যান্ডের একটি ছোট মেয়ে নেচেছে একটি লোক নৃত্য।
৭) পন্ডিচেরী লোকনৃত্য—পন্ডিচেরীর চারজন মেয়ে কৃষকদের নাচ করেছে ভাল ফসলের জন্য।
৮) মধ্যপ্রদেশের চার জন মেয়ে নেচেছে—নাচটি ছিল লোকনৃত্য।

৯) বিহার থেকে পাঁচজন শিশুশিল্পী সমবেত গান করেছে সবাই যেন ভালবাসায় থাকে।
১০) কেরালা থেকে দশটি ছেলে মেয়ে লোকগীতের সাথে নাচ দেখিয়েছে।
১১) ত্রিপুরা থেকে ছটি মেয়ে ভূপেন হাজারিকার গানের সাথে পা-মিলিয়েছে।

গোয়াতে বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীদের জন্য সুব্যবস্থা আছে। সারি সারি চেয়ার আটকানো আছে — এগুলি খোয়া যায় না। গোয়া ছোট্ট পাহাড়ী রাজ্য। মাটি পাথুরে। মাঝে মাঝে সমতল ভূমি ও তেরচা ভূমি। ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাটের কাজে নানা আকারের পাথর ব্যবহার করা হয়। এখানে পর্তুগীজ ভাস্কর্য ও প্যাগোডা ভাস্কর্যের যুগলবন্দীর সঙ্গে আধুনিক ভাস্কর্যের অদ্ভুত মিলন হয়েছে। পৌরাণিক বাড়িগুলির ছাদ টালির। কারকোরেম থেকে পানাজি আসার পথে প্রচুর নারকেল বাগান ও কাজুর বাগান চোখে পড়েছে। সমুদ্রের খারি আছে। এর জলে মৎস্য চাষ ও জমিতে জলসেচ হয় পাকা ড্রেনের সাহায্যে।

গোয়ার রাস্তাঘাটের উপর বেশ নজর আছে। উড়ালপুলও আছে — কাজেই যানজট হয় না। রাস্তার বাগানগুলি পরিচর্যা করা হয়। গাছ ও ফুলগুলি বেশ সতেজ। সহজেই দৃষ্টি কেড়ে নেয়। গ্রামের দিকে মেযেদের ফুলের মালা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। এদের দেখে আর্থিক অনটনেই আছে মনে হয়েছে। শহরে ফল তরিতরকারী নিয়ে মেয়েরা বাজারে বসে বিক্রির জন্য।

৩১শে ডিসেম্বর ছিল উৎসবের শেষ দিন। সকালবেলা প্রথমে জমায়েত হয় সাড়ে আটটায়। পতাকা উত্তোলন হয় ন'টায়। এরপর সবাই এসে যার যার নির্দিষ্ট জায়গায় বসে। সমাপ্তি অনুষ্ঠান শুরু হয়। নিউ এডুকেশোনাল ইনস্টিটিউটের ছাত্রীরা স্বাগত সংগীত এর সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে। এরপর পণ্ডিচেরীর দুটি মেয়ে ভারত নাট্যম্ নাচ দেখায়।

তৃতীয় পর্যায়ে ডঃ সুব্বা রাও শিশুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ রাখেন। তিনি শিশুদের সামনে তাদেব উপযোগী কবে বক্তব্য পেশ করেন। দুনিয়াতে ২২০টি রাষ্ট্র আছে। বিভিন্ন দেশের বাচ্চাদের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন। আমাদের দেশের বাচ্চারা বিভিন্ন রাজ্য থেকে দুর-দুরান্ত থেকে এসেছে — এদের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল। তিনি স্বীকার করেন অনেকেই জীবনে প্রথম রেল চড়েছে এবং সমুদ্র দেখেছে। বিভিন্ন রাজ্যের শিশুদের সঙ্গে পৃথকভাবে কথা বলেন। তিনি রাজ্যের নাম বলতেন আর শিশুরা ওঠে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ রাজ্যের শ্লোগান বলত। অসমের শিশুরা শান্তির বাণী নিয়ে এসেছিল। অরুণাচল ভারতের প্রহরী স্বরূপ। বিহার, ছত্তিশগড়, দিল্লির শিশুরা সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। হরিয়ানার শিশুরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল না। ডঃ সুব্বা রাও তাতে বিরক্ত হয়েছেন। কর্ণাটকের বাচ্চাদের শ্লোগান ছিল "আজকের বাচ্চারা কালকের দায়িত্বশীল নাগরিক।" কেরালায় মালয়ালম ভাষা — তাদের শ্লোগান "আমাদের রক্তে মানুষের খুন বহিতেছে।" মধ্যপ্রদেশ — "দিলকে জোড়া দিলে ভারত জোড়া লাগবে।" উড়িষ্যা "আমরা সব ভারতীয় এই আমাদের পরিচয়।" পণ্ডিচেরী

— "হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারত একই রহে।" ত্রিপুরা — "আমরা সবাই ভাই ভাই, যুদ্ধ নয় শান্তি চাই।" গোয়া —"কাশ্মীর হ্যইয়া কন্যাকুমারী ভারত মাতা এক হ্মারী।"

ডঃ সুব্বা রাও এর আক্ষেপ বড় বড় লোকজন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী আসলে সরকার নানা ভাবে তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শিশুদের জন্য তেমন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

তিনি শিশুদের সামনে একটি ছোট্ট গল্প বলেন। এক গ্রামে একটি মন্দির তৈরী হবে। এ উদ্দেশ্যে সভা হল — কিভাবে কি করলে ভাল হবে। মন্দির তৈরী হবে পাথর দিয়ে যাতে দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয়। প্রায় দুশ শ্রমিক নিয়োগ করা হল মন্দির নির্মাণের জন্য। দেখাশোনা করারও লোক আছে। কাজ চলছে পূর্ণোদ্যমে। এক ব্যক্তি এক শ্রমিককে জিজ্ঞাসা করল — কেন কাজ করছ? উত্তরে শ্রমিক বলল — দিনভর কাজ করে পয়সা পাই — তাতে আমার পেট ভরে। একই প্রশ্ন দ্বিতীয় শ্রমিককে করলে — উত্তরে সে বলল, মন্দিরের জন্য কাজ করছি, কিছু একটা হচ্ছে। সবার সাথে আমিও কাজ করছি। তৃতীয় শ্রমিক উত্তরে বলল —"আমার মন্দির আমি বানাই।" দৃঢ়তার সঙ্গে তৃতীয় শ্রমিক জবাব দিল।

ডঃ সুব্বা রাও বাচ্চাদের বললেন, তোমরা তৃতীয় শ্রমিকের মতো নয়া ভারত নির্মাণের কাজ করে যাও। তোমরা মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে ও অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে কাজ করবে।

এরপর তিনি শিশুদের প্রশ্ন করেন — তোমরা কে? উত্তরে সবাই বলে — "আমরা ভারত মাতা নির্মাতা।"

তিনি শিশুদের বলেন, "ফুল হল প্রেমের প্রতীক। ফুলকে যেমন ভালবাস মানুষকেও ঠিক তেমনি ভালবাসবে। অতিথিকে সম্মান জানাবে। আপ্যায়ন করবে।"

অর্গানাইজিং সেক্রেটারী একনাথ নায়েক তাঁর বক্তব্যে বলেন, এই শিশু উৎসব ২০০১ সাল থেকে শুরু হয়েছে। ২০০২ সালে হয়েছে যোধপুরে। ২০০৩ সালে হয়েছে পাঞ্জাবের মোহেলিতে। ২০০৪ সালে হল গোয়ার কারকোরেমে। আর ২০০৫ সালের জন্য স্থান নির্বাচন হয়েছে কেরালা।

তিনি বলেন, ভাইজির স্পিরিটের জন্যই এ অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর উদ্যম এর প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না। অর্গানাইজিং সেক্রেটারী প্রস্তাব রেখেছেন এ উৎসব বৎসরে দুবার করার জন্য — একবার গ্রীষ্মকালে এবং একবার শীতকালে। অনুষ্ঠানে একটি শোভেনীরও প্রকাশিত হয়।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক বিনয় তেন্ডুলকর। কলা ও সংস্কৃতি মন্ত্রী রামরাও দেশাই শিশুদের সামনে বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন। এই শিশুদের মধ্যে থেকে কেউ

রাষ্ট্রপতি হবে। কেউ প্রধানমন্ত্রী হবে। আবার অন্য কিছুও হবে। জীবনের বিভিন্ন ধারায় বিভিন্নভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষক হবে। তোমরাই ভাবী কালে ভারতকে উজ্জ্বল করবে। জাতীয় শিশু উৎসবের জন্য মাননীয় মন্ত্রী আড়াই লাখ টাকার অনুমোদন দিয়েছেন।

বেলজিয়াম থেকে একজন মহিলা প্রতিনিধি এই উৎসবে যোগদান করেন। তিনি 'ন্যাশানেল ইয়ুথ প্রজেক্ট'— এর মতো একটা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন। উনার বক্তব্যের মাধ্যমে জানতে পারি বেলজিয়ামে মাত্র তিনটি ভাষা প্রচলিত। আর বেলজিয়ামে দশ লাখ মানুষের বাস।

এরপর বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত শিশুদেরও বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়। ত্রিপুরা থেকে নীলাঞ্জসা ছোট্ট বক্তব্য রাখে। অসম থেকে একটি ছেলে বেশ সুন্দর করে বলে। অন্যান্য রাজ্য থেকেও বলেছে। ভাইজি সবাইকে তারিফ করেছেন। শিশুরা সবাই খুশি এবং গর্বিত এরকম একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পেরে। ভবিষ্যতে আবার যোগদানের ইচ্ছা ওরা প্রকাশ করেছে। এখানে এসে অনেক নূতন অভিজ্ঞতা হয়েছে — তাতে তারা কৃতজ্ঞ। নিজেদের নানাভাবে সমৃদ্ধ করতে পেরেছে।

সবশেষে শিশুদের জন্য শংসাপত্র ও উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় এ্যাস্‌ক্রট এর হাতে।

ত্রিপুরা দর্পণ— ১৭,২৩ ফেব্রুয়ারী, ১২ই মার্চ, ২০০৫ইং

ছাব্বিশের উৎসবের সমাপ্তি—সাতাশের জন্য অপেক্ষা করে থাকা বছরভর

আগরতলা বইমেলা-বই উৎসব -বই পার্বণ—সারা বছর মানুষ মুখিয়ে থাকে এর শুভ সূচনার জন্য। এবারের বইমেলা ছিল (২৫ মার্চ- ৩রা এপ্রিল ২০০৮) ২৬তম। হাঁটি হাঁটি পা পা করে পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত।

২৫ মার্চ বিকেল সাড়ে চারটেয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মঙ্গলদীপ জ্বেলে উদ্বোধন করেন ২৬তম বইমেলার। মঞ্চে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অসম সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কনক সেন ডেকা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কবি মন্ত্রী অনিল সরকার। প্রধান অতিথি পরামর্শ দিয়েছেন রামায়ণ মহাভারত জানার জন্য। স্মরণাতীতকাল থেকে ভারতের মাটিতে জল হাওয়ায় যে মহাকাব্যদ্বয় ভারতের পারিবারিক, সমাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উর্বর ফসল ফলিয়েছে—নীতি নির্ধারণে ও রূপায়ণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে —সে অমর মহাকাব্যদ্বয়ের প্রাসঙ্গিকতা ভুলে গেলে চলবে না। এদের অমর কাহিনীকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে সাহিত্যিকগণ সাহিত্য সাধনার রসদ খুঁজে পেয়েছেন। এদের রাসায়নিক ও জারণ ক্ষমতা এতটাই শক্তিশালী যে আজও তা ভারতের সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। আগামী আরো বহুযুগ নিয়ন্ত্রণ করবে। স্নেহের রসে সিক্ত করে নিবিড়ভাবে বেঁধে রাখবে এবং সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় থাকবে।

শ্রদ্ধেয় কনক সেন ডেকা বলেছেন, জগতে দুটি জিনিসের প্রয়োজনীয়তা কোনদিন ফুরোবে না। 'শব্দ' এবং 'কর্ম'— শব্দ এবং কর্মের সাহায্যে সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে এগিয়ে যাচ্ছে। শব্দের দ্বারাই আমরা অনুপ্রেরণা পাই, আকৃষ্ট হই, সম্বিত ফিরে পাই। আর কর্মের মহিমা চিরন্তন। নিষ্কাম কর্মের কথা গীতাতেও আছে। গীতার শ্রেষ্ঠ বাণী 'কাজ করে যাও, ফলের আশা করো না'। কর্মের দ্বারাই যাবতীয় সাফল্য, উন্নতি—মানুষ সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছেছে। কর্মের দ্বারাই জগৎ ক্রিয়াশীল।

মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, ভাল বই ভাল মানুষ তৈরি হতে সাহায্য করে। বই প্রত্যেক ঘরে ঘরে ভাল মানুষ তৈরি করে দিতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে ভাল মানুষের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি। ভাল মানুষ তাদেরই বলা হবে যারা নিজের জন্য কম ভাবেন, অন্যের জন্য বেশি ভাবেন। সভ্যতার সংকটে একজন ভাল মানুষ বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে অপরের চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবেন। তাঁরা যা বলেন-তা করে দেখান। কাজেই বইমেলায় ভাল বই পাঠকগণ প্রত্যাশা করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী অনিল সরকার ৮০ সালের দাঙ্গার স্মৃতিচারণা করেন। চিরাচরিত পাহাড়ি বাঙালির মেলবন্ধন ও সখ্যতায় যে অবিশ্বাস জন্ম নিয়েছিল তা ছিল সাপের মতোই বিভীষিকাময়। সে কঠিন ও সমস্যাসংকুল অবস্থায় দাঁড়িয়ে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার বইমেলা করার চিন্তাভাবনা করেন। মননশীল ও চিন্তাশীল প্রতিরোধের দ্বারা সেদিনের যুদ্ধ ঘোষণা। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী ও শিক্ষামন্ত্রী দশরথ দেব পাহাড়ি বাঙালির মনের ফাটল নিরসনে বইমেলার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন এক নতুন প্রাণশক্তির। প্রথম আগরতলা বইমেলা ১৯৮১ সালের ৩০ মার্চ থকে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত চলে। উদ্বোধক ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দশরথ দেব। এরপর থেকে প্রতি বৎসরই বইমেলা অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আয়োজিত হয়েছে। দিনে দিনে কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। ভিন রাজ্য ও ভিন দেশের প্রকাশক ও জ্ঞানীগুণীদের সমাগমে আমাদের বইমেলা মাধুর্যমন্ডিত হয়ে উঠতে থাকে।

প্রথম বইমেলায় ভর্তুকি সরকারি ১০ শতাংশ ও বেসরকারি ১০ শতাংশ মোট ২০ শতাংশ ছিল। এ ধারা ত্রয়োদশ বইমেলা অর্থাৎ ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বহাল থাকে। এরপর থেকে সরকারি ছাড় উঠে যায়। ১৯৯০ সালে জোট আমলে এক বৎসর বইমেলা থেকে ত্রিপুরাবাসী বঞ্চিত হয়। এটা কংগ্রেস সরকারের দুর্বলতা ও ঘাটতি ছিল। ২০০৮ সালে নির্বাচনের জন্য বইমেলা হবে কিনা-এ নিয়ে সংশয় ছিল। কিন্তু অনেক সমস্যা ও জটিলতা এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার বইমেলা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং জনগণকে তা পরিপূর্ণভাবে উপহার দেন।

অনিবার্য কারণে এবার বইমেলা পিছিয়ে চৈত্রমাসে চলে আসে—ছিল কাল বৈশাখীর ভ্রুকুটি। ভালয় ভালয়-ই কাটে প্রথম আট দিন। শেষ দুদিন কালবৈশাখী কিছুটা বিব্রত করেছে-তবে তেমন কিছু নয়। দশদিনব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চলে শিশুউদ্যান মঞ্চ ও রবীন্দ্রভবন মঞ্চে। শিশু উদ্যান মঞ্চের অনুষ্ঠান ঃ ২৫ মার্চ ২০০৮ মঙ্গলবার—উদ্বোধন, ২৬ মার্চ ২০০৮ বুধবার—গঙ্গা-গোমতী-ব্রহ্মপুত্র দিবস, ২৭ মার্চ ২০০৮ বৃহস্পতিবার—শিশু উৎসব ১৪ বৎসব বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের বসে গল্প, ছড়া ও কবিতা লেখা প্রতিযোগিতা। শুরু হয় ৩.৩০ থেকে। এরপর সন্ধ্যা ৬টা থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের আবৃত্তির অনুষ্ঠান। ২৮ মার্চ ২০০৮ শুক্রবার—শতবর্ষ স্মরণ দিবস— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, আশুতোষ ভট্টাচার্য ও লীলা মজুমদার, ২৯ এবং ৩০ মার্চ ২০০৮ শনিবার ও রবিবার—কবি সম্মেলন-বিকেল ৫টা থেকে। ৩১ মার্চ ২০০৮ সোমবার— ভাষা সংস্কৃতি ও আদিবাসী রূপরেখা দিবস। ১ এপ্রিল ২০০৮ মঙ্গলবার—১৮৫৭-মহাবিদ্রোহ ও ঝাঁসিরাণী দিবস। ২ এপ্রিল ২০০৮ বুধবার— বিজ্ঞান ও পরিবেশ দিবস। ৩ এপ্রিল ২০০৮ বৃহস্পতিবার—সমাপ্তি অনুষ্ঠান সভাপতি অনিল সরকার, তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর, বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান করা হয়— ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ স্মৃতি পুরস্কার— শ্রী স্বপন নন্দী, সলিল কৃষ্ণ স্মৃতি পুরস্কার, শ্রীমতি মীনাক্ষী সেন, লালন ফকির পুরস্কার-শ্রী ব্রজনন্দ দাস-বৈষ্ণব (বিনোদ দেববর্মা)। কবি

সুকান্ত স্মৃতি পুরস্কার—শ্রী হিমাদ্রি দেব, শ্রেষ্ঠ বাংলা প্রকাশনার জন্য 'পৌনমী প্রকাশন'। শ্রেষ্ঠ ককবরক প্রকাশনার জন্য 'ককবরক সাহিত্য সংসদ'।

এছাড়া অন্যান্য পুরস্কারও ছিল— যা বিভিন্ন প্রতিযোগীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। গল্প, ছড়া ও কবিতা লেখার জন্য'। প্রথম শ্রেষ্ঠ স্টলের পুরস্কার পায় 'আজকাল', দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ স্টলের পুরস্কার পায 'পৌনমী প্রকাশন' এবং তৃতীয় শ্রেষ্ঠ স্টলের পুরস্কার পায় 'বুক ওয়ার্ল্ড'। শিশু উদ্যানের বইমেলা মঞ্চটি বেশ দৃষ্টিনন্দন হয়েছে। তিন দশকের নির্বাচিত প্রবন্ধের 'গৌমতী'র প্রকাশ একটি বলিষ্ঠ দলিল। বিনিময় মাত্র দশ টাকা-ফলে হটকেকের মতো বিকিয়ে যায়।

প্রথমতঃ দশম ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন ও ফল প্রকাশে দেরিজনিত বিভিন্ন মহলে উৎকণ্ঠা এবং দ্বিতীয়তঃ কলকাতা বইমেলার ধকল সামলে আগবতলা বইমেলায় অংশগ্রহণ ছিল বেশ কঠিন। দুটি মেলার মধ্যে সময়ের যথেষ্ট ফারাক না থাকায় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতার পক্ষে এক বিরাট ঝুঁকি হয়ে উঠে। ফলে অনেক প্রকাশনা সংস্থা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এবার আগরতলা বইমেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। তবে এটা ঘটনা যে আগরতলা বইমেলা দিনে দিনে তার কৌলিণ্য ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করেই চলেছে— এ ধারার কোন ব্যত্যয় হবে না। ১৯৮১ সালে প্রথম বইমেলায় বিক্রি হয়েছিল ৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ১৮৪ টাকার বই। আর গত বছর অর্থাৎ ২৫তম বইমেলায় শক্রর মুখে ছাঁই দিয়ে বিক্রি হয়েছে এক কোটি টাকার উপর। যতই ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দাপাদাপি থাকুক- বই মানুষেব ঘরে ঘরে এই মেলাব মাধ্যমেই গিয়ে পৌঁছে। কবি-সাহিত্যিক-লেখকগণ এই বইমেলাকে উপলক্ষ্য করে নতুন উদ্যমে বই প্রকাশে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ছোট ত্রিপুরায় দু'শর উপর বই প্রকাশিত হয়েছে- এবারের বইমেলায় এটা কি কম গর্বের? সাতাশের বইমেলা আরো সফল হবে-এ আশা করাই যায়। এবারের বইমেলায় কবিতার বই কম প্রকাশিত হয়েছে- তাই কবিমন্ত্রীর কণ্ঠে আক্ষেপ। আবার কোন কবি পশরা নিয়ে বসে আছেন-বই মলাটবন্দি হতে পারেনি- এমনও তো আছে। সাধ থাকলেও নানা কারণে সাধ্যে কুলোয় না।

লিটল ম্যাগ-এর স্টল বেশ জমজমাট ছিল। বইমেলা উপলক্ষ্যে ভিন রাজ্য ও ভিন দেশের জ্ঞানী গুণীদের দেখা ও তাঁদের পক্ক অভিজ্ঞতার কথা শোনা যায়। বিভিন্ন সংস্কৃতির চর্চা ও প্রদর্শন, কর্মশালা কি যে নেই বই উৎসবে। মৃৎপাত্রে চা-কফি-এটাও তো শিশু উদ্যানে বসে বাড়তি পাওনা বই পার্বণের। কবিমন্ত্রীর ভাষায় বলতে হয় বইমেলা সকলের নান্দনিক শিহরণ। বইমেলায় প্রবেশমূল্য ধার্য করার প্রস্তাব কেউ কেউ রেখেছেন। দুই টাকা প্রবেশমূল্য করলে মন্দ হয় না। সরকারের কিছুটা সাশ্রয় হবে। বইমেলার ভেতর খাবারের দোকান না থাকায় মেলার গাম্ভীর্য বেড়েছে-পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিমছাম ছিল। তবে মেলায় উৎকৃষ্টমানের চা-কফির ব্যবস্থা রাখা দরকার। ২০০৯ সালের বইমেলায় সুস্বাদো চা-কফির স্বপ্ন দেখা আমার মতো অনেকেই দেখতে শুরু করেছেন তো?

দৈনিক আরোহণ— বুধবার, ৯ই এপ্রিল, ২০০৮ইং

সাতাশের শেষে আটাশের প্রতীক্ষা

২৭তম বইমেলা ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ থেকে ১১ই মার্চ ২০০৯ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আগরতলা শিশু উদ্যানে। ১২ দিনের মেলা। ১৯৮১ সালের ৩০শে মার্চ ২৪টি স্টল নিয়ে যার যাত্রা শুরু। তখন ভর্তুকী ছিল ২০ শতাংশ। দশ শতাংশ সরকারের আর দশ শতাংশ প্রকাশকের। বই কিনে সরকারি দশ শতাংশ ছাড়ের জন্য লম্বা লাইন পড়ে যেত। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আনুকূল্যে ত্রিপুরাবাসী জানল 'বইমেলা' কী জিনিস। ১৯৮০ সালের জুন মাসের দাঙ্গার রক্ত ছাপ মুছে জাতি-উপজাতি হাত ধরে বইমেলায় মেতেছিল। দশরথ দেব, নৃপেন চক্রবর্তী — এঁদের দূরদর্শিতার ও সদ্ইচ্ছার তুলনা হয় না।

রাশিয়ার 'রাদুগা' প্রকাশনীর বিভিন্ন বই এর কথা ভোলা যায় না। বিশেষ করে ছোটদের বই — যেমন সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই তেমনি কাগজ ও ছবি। দামেও সস্তা। এত উঁচুমানের বই স্বল্পমূল্যে পাওয়া থেকে এখানকার শিশুরা বঞ্চিত থেকে গেল। নব্বই এর দশকে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার পতনের পর প্রকাশনীটি উঠে গেল ভারত থেকে। 'সোভিয়েত ল্যান্ড' ম্যাগাজিনটিও চোখে ভাসে। সঙ্গে সুদৃশ্য ক্যালেন্ডার।

ছোট্ট পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা, লোকসংখ্যাও কম — কিন্তু মেধা-মনন-খেলাধুলার পরিচর্যার খামতি নেই। খেলাধুলায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় খেলার আসরে পদক তালিকায় সুউচ্চ শীর্ষস্থান দখল, ইন্ডিয়ান আইডল সৌরভী দেববর্মা বা স্মিতা, অনুপম ও সোমদেব দেববর্মা — সবই আধুনিক ত্রিপুরার মুকুটে নিত্য নূতন পালক সংযোজন।

বাইরের গুণীজন আগরতলা বইমেলার প্রশংসা করে যান। মেধা-মনন-শিল্পের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মঞ্চ, মেলা, প্রাঙ্গণ, তোড়ন, মেলার ভেতরের রাস্তাগুলির নামকরণ। এক একটা দোকানের নজর কাড়া সাজসজ্জা — ফলে মেলার ভেতরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে একটা আবেশের ভাব চলে আসে। আবিষ্ট না হয়ে বোধ হয় কারোর পক্ষেই থাকা সম্ভব না।

লেখক-প্রকাশক-পাঠক-বইপ্রেমী সারা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। এবারও দু'শর মতো বই মলাট বন্দি হয়েছে। শিশু উদ্যান মঞ্চে ও অন্যান্য নানা মঞ্চে আয়োজন করে ঘটা করে বই প্রকাশ বা আবরণ উন্মোচিত হয়েছে। বিভিন্ন দিন বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের হাতের ছোঁয়ায় বই প্রকাশিত হয়েছে। বইমেলার আগের থেকেই বই প্রকাশ শুরু হয়ে যায়।

খবর ও ছবি পত্রিকায় দেখে জানি ও আনন্দিত হই। অনেকে আবার নিজের বই এর

বিজ্ঞাপন নিজেই দিয়ে দেন পত্রিকায় — তাতে বিভিন্ন স্তরের পাঠকগণ তা জানতে পারেন। তবে একটা বড় অংশের লেখক-লেখিকা রয়েছেন — তাঁরা নিজের বই এর প্রচার নিজেরা করতে চান না। বড়জোর বইমেলা মঞ্চে সাদামাটা ভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করে থাকেন এবং যথারীতি প্রকাশিত হয় — কিন্তু এসবের প্রকাশ খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। শিক্ষা সংস্কৃতি ও লেখালেখি জগতের এ খবরগুলি স্থানীয় পত্রিকায় স্থান পাওয়া উচিত বলে মনে করি। এ দিকটায় সাংবাদিক বন্ধুগণ যদি আরো একটু উদার ও সহমর্মী হন তবে আগরতলা বইমেলা আরো আপন ও মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠবে। এছাড়া প্রকাশকদের নিকট খোঁজ নিলেই নূতন বই-এর হদিস পাওয়া যাবে।

প্রকাশকদের মুখে শোনা যায় এবার ব্যবসা জমছে না — এ কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। কারণ পরিসংখ্যান এ দেখা যাচ্ছে বিক্রি বেড়েছে। এবার সোয়া কোটি টাকার বই ১২ দিনে অগণিত পাঠকের ঘরে পৌঁছেছে।

মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে পাঠক বেড়েছে, চেতনাও বেড়েছে। এখন তো বইমেলার সংখ্যাও বেড়েছে। আগরতলায় একাধিকবার বইমেলার আয়োজন হচ্ছে বিভিন্ন নামে। মহকুমাগুলিতে ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে বইমেলা হচ্ছে। সব মেলাতেই অল্প বিস্তর বই বিক্রি হচ্ছে। অর্থাৎ বই ত্রিপুরার পাহাড়-পর্বত-সমতল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা, কবি সম্মেলন -- মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার কর্মশালা। ধর্ম-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-গরিব ও বয়স নির্বিশেষে সকলকে একত্রিত করার মহৎ মহড়া। ভিন রাজ্য ও ভিন দেশের জ্ঞানী-গুণীজন আসছেন — মত বিনিময় হচ্ছে। লাভবান হচ্ছে মানব সমাজ এর কোন গণ্ডি নেই। গঙ্গা-গোমতী-ববাক-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার মানুষ হাত ধরাধরি করে আছে - এ এক নূতন বোধের সৃষ্টি। একের সুখে-দুঃখে অপরে সহানুভূতিশীল। পাশে কেউ আছে—এ ধারণাই যথেষ্ট।

তবু কান পাতলে শোনা যায় অনেক নূতন লেখক-লেখিকা, কবি, প্রকাশকদের ক্ষোভের কথা। যিনি শ্রম ও সময় সাপেক্ষে একটা পাণ্ডুলিপি তৈরি করলেন এবং সেই পাণ্ডুলিপি যিনি মলাটবন্দি করতে সাহায্য করলেন — তাঁদের ভূমিকা ব্রাত্য নয়। যাঁরা কিছু করেন তাঁরা যেন টের পান। গোটা মেলার স্টলগুলিতে শুধু বহিঃরাজ্যের বই সাজিয়ে রেখে কেনাবেচা করলে বই এর ব্যবসা হতে পারে, মেধা-মননের বিকাশে কতটকু সহায়ক হবে? কবি সম্মেলন ও লেখক সম্মেলন বর্ধিত আকারে যোগ্য মর্যাদায় হোক না! নজিরবিহীন সরকারি উদ্যোগে আমাদের যে প্রাণের বইমেলা তার তাৎপর্য গৌরব আরো বৃদ্ধি পাবে। নূতন বই-এর তালিকা বইমেলায় প্রকাশিত হতে বেশি শ্রম লাগার কথা নয়। তালিকাটি প্রস্তুত করে বইমেলা অফিসের সামনে ঝুলিয়ে দিলে সবাই জানতে পারবেন। মেলার পূর্বে স্থানীয় পত্রিকায় একটা ছোট্ট বিজ্ঞপ্তি — নূতন বই এর নাম জানানো হোক। তাহলেই লেখক-প্রকাশকগণ উৎসাহিত

হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে আমার বিশ্বাস।

শিশু উদ্যানের পূর্বদিকে একটি উন্নতমানের শৌচাগার তৈরি হয়েছে। এরফলে বইমেলা আরো সম্পূর্ণ হয়ে উঠল। মেলার ভেতরে পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখলে অনেকের কাজে আসবে — পিপাসা নিবৃত্তির সমস্যা থাকবে না।

গ্রন্থাগার-গ্রন্থাগারিক বই এগুলির ব্যবস্থা হাই-হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুলে করলে ভালো হয়। ছাত্র-ছাত্রীদেরও বইমুখো করা যাবে। এবার বহু স্কুলে 'লাইব্রেরি ফান্ড' মঞ্জুর হয়েছে — এটা শিক্ষাব ক্ষেত্রে আনন্দ সংবাদ।

আশার কুহকে ২৮তম বইমেলার জন্য বৎসরব্যাপী আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করে থাকব। কর্মকর্তাগণ নূতন নূতন ডালি নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হবেন। যেখানে মনের প্রসারতা সেখানেই শান্তি — আর যেখানে শান্তি সেখানেই উন্নতি সমৃদ্ধি। সীমিত ক্ষমতায় মহান যজ্ঞ তাই তো সম্পন্ন হচ্ছে। আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছি, আরো যেতে হবে সকলের মিলিত প্রচেষ্টায়।

দৈনিক আরোহণ— বুধবার, ১৮ই মার্চ, ২০০৯ইং

লিঙ্গ বৈষম্যের অভিশাপ থেকে এখনো মেলেনি মুক্তি

গত ১২-৯-০৯ ইং শনিবার ত্রিপুরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরী হলে একটি ওয়ার্কশপ হয়— বিষয় 'Ensuring Gender Justice' অনুষ্ঠানটি ত্রিপুরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের Women study cell ও ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে হয় - সকাল ১১টায়। অনুষ্ঠানটি দুভাগে হয় প্রথমে জেনারেল সেশান এবং লাঞ্চ এর পর ট্যাকনিক্যাল সেশান। অনুষ্ঠানটি শুরু করার কথা ছিল মাননীয় ভি.সি. অধ্যাপক অরুণোদয় সাহা মহাশয়ের। কিন্তু বিমান দেরিতে আগরতলায় পৌঁছায় তিনি নির্দিষ্ট সময়ে এসে পৌঁছতে পারেননি। তবে তিনি নির্দেশ পাঠিয়ে দেন অনুষ্ঠান সময় মতো শুরু করে দেবার জন্য এবং অনুষ্ঠান যথাসময়ে শুরু হয়ে যায়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী পিয়ালী ধর। বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নির্ধারিত সময়ের আগেই হলে পৌঁছে যান। বিভিন্ন এন.জি.ও নিমন্ত্রিত ছিল।

আপ্যায়নের দায়িত্বে যারা ছিলেন ঠিকঠাকভাবে অতিথিদের সাক্ষর সংগ্রহ করে কাগজপত্র সহ ফোলিও দিয়ে বসবার জায়গায় পৌঁছে দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে অতিথিদের বরণ করেছেন। স্বাগত ভাষণ রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের Women's study cell-এর কর্ডিনেটর ডঃ চন্দ্রিকা বসু মজুমদার। তিনিই কর্মশালার আহ্বায়িকা। তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে জানতে পারি ভারতের ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৬টি Women's study cell রয়েছে। নারীদের শিক্ষা এবং তাদের সামাজিক অবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে কাজে যুক্ত থাকে।

ডঃ তপতী চক্রবর্তী বলেন সমাজে নারী ও পুরুষ সমান মর্যাদায় থাকবেন- কারোর প্রতি কোন অবিচার বা অসমতা থাকবেনা। আমাদের দেশে আইন আছে- আইনের অভাব নেই। কিন্তু সমাজ আইন গ্রহণ করছেনা। মেয়েদের বিরুদ্ধে হিংসার ঘটনা সারা পৃথিবী জুড়েই বাড়ছে। ন্যাশানাল ক্রাইমব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে মেয়েদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ ২০০৬ এর তুলনায়- ২০০৭এ ১২.৫ শতাংশ বেড়েছে। তিনি বলেন এক সময় মনে হতো অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর মেয়েদের নির্যাতনের শিকার হতে হয়না। কিন্তু বিগত মাসগুলিতে মানসী, শবরী-র মতো মেয়েদের মৃত্যু—ধারণা পাল্টে দেয়। এরা উচ্চ শিক্ষিতা এবং উচ্চপদে কর্মরতা ছিলেন। বহু শিক্ষিকা এবং অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী মহিলা কমিশনে এসে দীর্ঘ সময় ধরে নির্যাতনের কথা বলে যান—কিন্তু লিখিতভাবে কোন অভিযোগ দেন না। পরন্তু অনুরোধ করেন কমিশন যেন কোন ব্যবস্থা না নেয়। কাজেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে নারীমুক্তির

সম্পর্কটা এসে প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। আবার শিক্ষার আলোক পেলে মেয়েরা তাদের উপর নেমে আসা নির্যাতনকে প্রতিরোধ করার শক্তি পাবে—এ ধারণা পাল্টে গেল। সাম্প্রতিক সময়ে জিরানিয়ার সুনীতা (মেধাবী উচ্চ শিক্ষিতা) এবং সোনামুড়া যাত্রাপুরের গোপার মৃত্যু ভাবিয়ে তুলেছে। ওরা নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি।

পুরুষ প্রধান সমাজে মেয়েদের মূল্য কম ও ছেলেদের মূল্য বেশি—এ ধারণাই মেয়েদের ওপর নির্যাতনের প্রধান কারণ। ভারতীয় সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার রয়েছে — আইনও রয়েছে — তবু স্বাধীনতার ৬২ বছরে ভারতে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠিত হল না। ত্রিপুরায় নারী পুরুষরা রাজনৈতিকভাবে যতটা সচেতন সামাজিক ভাবে ততটা সচেতন না।

বিশ্বমন্দার কারণে চলছে অর্থনৈতিক সংকট সারা পৃথিবী জুড়ে। নারীপুরুষ উভয়ই কাজ হারাচ্ছেন। নির্যাতন বাড়তে থাকে নারীদের উপর। দেশে খরা, বন্যা, যুদ্ধ বা দাঙ্গা যা-ই আসুক না কেন তার আঘাত সবচেয়ে বেশি পড়ে নারীদের উপর। সংবিধান, আইন, পুলিশ, প্রশাসন বা মহিলা কমিশন মেয়েদের নির্যাতন কমানোর চেষ্টা করতে পারে— কিন্তু বন্ধ করা যাবেনা। সমাজের যাবতীয় বৈষম্য কমলে নারী নির্যাতন কমতে পারে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পারিবারিক আদালতের বিচারক শ্রী দাতামোহন জমাতিয়া বলেন সংবিধানের ১৪ নং এবং ১৫ নং ধারা মহিলাদের বাঁচার আইনী অধিকার। সুপ্রীম কোর্ট বলেছে প্রত্যেক অফিসে মহিলা সেল করতে হবে তাদের নিরাপত্তার জন্য। আমরা এমনই সামাজিক কাঠামোর মধ্যে আছি যে স্বাধীনতার ৬২ বছর পরও সুপ্রীম কোর্ট চিন্তিত নারীদের নিরাপত্তার জন্য। উপজাতি মহিলারা এখনও বাবার সম্পত্তি পাননা। তিনি আরো বলেন শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘটে সুযোগ এবং ইচ্ছার সমন্বয় হলে। দেশে কন্যা ভ্রূণ হত্যা লুকিয়ে চুরিয়ে হচ্ছে। ফলে জনসংখ্যার অনুপাতে দেখা যায় নারীরা সংখ্যায় কম। ত্রিপুরায় অনুপাত ১০০০ ঃ ৯৪৮ এবং কেরালায় ১০০০ ঃ ১০২৬ জন। কেরালায় মহিলার সংখ্যা অনুপাতে বেশি। এছাড়া আদালত চালাতে গিয়ে তাঁর অমানবিক অভিজ্ঞতার কথা বলেন। স্বামীরা কত তুচ্ছ কারণে স্ত্রীদের নিগ্রহ করে। এর মধ্যে স্ত্রীদের রান্না ভালো লাগে না - এটাও একটা কারণ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ অরুনোদয় সাহাও মনোজ্ঞভাবে তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ রাখেন। প্রচলিত লিঙ্গ বৈষম্য দেখে তিনিও বিচলিত। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। পরিবারে এবং সর্বত্র প্রকৃত ক্ষমতা পুরুষরাই ভোগ করেন এ সত্যটি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি।

মীনাক্ষী সেন তাঁর বক্তব্যে নানা দিক তুলে ধরেন। নারী ও পুরুষেরা সামাজিক - সাংস্কৃতিক ভাবে যে ভূমিকা পালন করে তাকেই বুঝায় জেন্ডার (gender)। আর সেক্স (sex)

বায়োলজিক্যল (biological)। বাচ্চার জন্মদান মা করেন। মায়েরাই এতদিন মাতৃত্বকালীন ছুটি পেয়ে এসেছেন বাচ্চার দেখাশুনা করার জন্য ।ইদানীং পিতৃত্ব কালীন ছুটির কথা শোনা যায়। বাচ্চার দেখাশোনা যত্নআত্তি পিতা বা যে কেউ করতে পারেন। কিন্তু দেখা যায় মায়েদেরই করতে হচ্ছে। মানুষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে যেতে পারেনা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পিতারা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার ছেলেদের। ছেলে আসল উত্তরাধিকারী। লক্ষ্য রাখা দরকার লিঙ্গ অনুপাতের দিকে—অনুপাত যেন সমান সমান থাকে। কন্যা ভ্রূণ যাতে হত্যা না হয় । উভয় লিঙ্গেরই স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা প্রয়োজন। কারণ স্বাস্থ্যই সম্পদ। আয়ুস্কাল উভয়ের কতটা। যে অবহেলিত হবে তার আয়ুস্কাল কম হবে। স্বাস্থ্যের সুযোগ সুবিধা উভয়েই যেন সমান পায়। কোন কোন পরিবারে দেখা যায় ছেলেদের অসুখ হলে এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা আর মেয়েদের বেলায় হোমিওপ্যাথি। শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েরা শিক্ষিকা অথবা নার্স হবে। আর ডাক্তার হলে স্ত্রীরোগের —এর বাইরে নয়। অন্যান্য বৃহত্তর ক্ষেত্রে যেন মেয়েরা বেমানান। এখনও সমাজে এসব রয়েছে—অনেকেই এর বাইরে কিন্তু ভাবতে পারছেন না। তাত্ত্বিক ও বাস্তব আন্দোলনে, নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বে, মন্ত্রিত্বে, নীতি নির্ধারণে মেয়েরা যেন অনুপযোগী। মিছিল বড় করার জন্য মেয়েদের দরকার —প্রার্থীপদের বেলায় অযোগ্য বিবেচিত হয়। নারীদের ৩৩ % সংরক্ষণ বিল এখনও অধরাই থেকে গেল।

মীনাক্ষী সেন আরো বলেন - মেয়েদের জন্য কোন সুযোগ সুবিধা চাই না - চাই সমান সমান / gender gap থাকলে পার্থক্য আসে - তারপর আসে নির্যাতন । লিঙ্গের ধারণা এখনও বদলায়নি। সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতের দ্বারা লিঙ্গের সমতা আনা অনেকটা সহায়ক হবে। অসির চেয়ে মসি সবসময়ই শক্তিশালী।

ত্রিপুরার উপজাতি সমাজে ডাইনী সংক্রান্ত বিশ্বাস এখনও প্রবল। এর শিকার হতে হচ্ছে বৃদ্ধা, বিধবা বা অসহায় মহিলাদের। যেসব কারণে কারোর উপর ডাইনী সন্দেহ হয় - সে সবের জন্য প্রয়োজন সচেতনতা শিবির করা। উপজাতি ভাই বোনদের বোঝাতে হবে প্রকৃত সত্য কি ? কুসংস্কার থেকে উপজাতি গ্রামগুলিকে মুক্ত করতে হবে।

পণ সংক্রান্ত বিষয়ে যে অহরহ হত্যা সংঘটিত হচ্ছে - এ বিষয়ে তিনি বলেন বর্তমানে ভোগবাদ পণ প্রথাকে যথেচ্ছভাবে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। একে প্রতিরোধ করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও আইন সম্পর্কিত বিধিগুলির যথাযথ প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ প্রয়োজন।

আদিম সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এসেও নারীদের বঞ্চনার অবসান হয়নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী নারীরা পণ্য। মানব সভ্যতার অগ্রগতির পরেও নারীদের অবস্থান তেমন পাল্টায়নি। নারীরা সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার। এ বিষয়ে পৃথিবীর বহু দেশের চিত্রই ভয়াবহ। নারী নির্যাতন ও নারীদের দুরবস্থার প্রধান কারণগুলি হল- ১) অশিক্ষা, ২) অর্থনৈতিক পরাধীনতা ৩) জাতিভেদ প্রথা, ৪) ধর্মীয়

গোঁড়ামি ৫) নেতৃত্বসুলভ গুণাবলির অভাব, ৬) পুরুষদের উদাসী এবং নির্মম মনোভাব।

মহিলা আইনজীবী বলেন- আইন তো কাউকে পৌঁছে দেওয়া যায়না। আইনটা জানতে হয়। কেউ কেউ এসে জানায় আমাকে এখন স্বামীর ভালো লাগে না—তাই দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছে। হিন্দুম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রথম বিয়ে আইনত সিদ্ধ। স্বামীকে আশ্রয়, চিকিৎসা, ভরণপোষণ দিতে হবে। যে আক্রান্ত হয় তার বাঁচার ব্যবস্থা সরকার করবে। কিন্তু আদালতে যেতে হবে - মহিলা ও শিশু বিনা খরচে মামলা করতে পারে। বহু আইনজীবী রয়েছেন যারা মামলা চালিয়ে দেন কোন ফি না নিয়ে। আক্রান্তদের এগিয়ে আসতে হবে। ভাই-বন্ধু প্রতিবেশি বা আত্মীয় স্বজনরা সহৃদয়ভাবে আক্রান্তের পাশে দাঁড়ালে সুবিচার পাওয়া সহজ হয়।

ছাত্রছাত্রীদের থেকে নানা সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। আলোচনার মাধ্যমে সেগুলির উত্তর তারা পেয়ে যায়। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরামর্শ দেওয়া হয়। শহর ও গ্রামের সমস্যা, জাতি-উপজাতি - মুসলিম পরিবারের সমস্যা সমাধানের জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে উচ্চশিক্ষিত যুবক-যুবতীদের। তারাই পচাগলা সমাজের পরিবর্তন করে সুস্থ সমাজের পত্তন করতে পারবেন আর তবেই লিঙ্গ বৈষম্য দূর হবে। এটাই আজকের দাবী শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের নিকট — অভিজ্ঞ বয়োজ্যষ্ঠবা পেছন থেকে নানা পরামর্শ ও সাহস জুগিয়ে যাবেন।

দৈনিক আরোহণ— শুক্রবার, ২ অক্টোবর, ২০০৯ইং

মহাকরণের নতুন বাড়ি ঃ কিছু কথা

ত্রিপুরা রাজ্যে শাসন পরিষদের সৃষ্টি হয়েছিল মহারাজ বীরচন্দ্রের আমলে। শাসন পরিষদের কাজ চলত ঈশানচন্দ্র মাণিক্য নির্মিত রাজপ্রাসাদে। রাজপ্রাসাদটি ১৮৯৭ সালে ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যায় এবং উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ তৈরি হয়। এর আগে রাধাকিশোরের রাজত্বকালে শাসন পরিষদ ও আইন পরিষদ গঠিত হয়েছিল। এখনকার বি.এস.এন.এল অফিসের জায়গায় লাল দালানে বসে তিনি মন্ত্রী পরিষদের কাজ পরিচালনা করতেন। আর খোসবাগানে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের পুরানো বাড়িতে ছিল কাছারি ঘর। মন্ত্রী পরিষদের কাজকর্ম চালাতে গিয়ে স্থান সঙ্কুলানের অভাবে বর্তমান আই জি এম হাসপাতালে নতুন বাড়ি নির্মিত হয়েছিল। অফিস স্থানান্তরের পূর্বেই মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয় এবং তাঁর স্মৃতির জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন আসে। তখন মন্ত্রীদের পরামর্শে ওই বাড়িটি মহারানী ভিক্টোরিয়ার নামে হাসপাতাল তৈরি হয় ১৯০৪ সালে।

তারপর তৈরি হয় প্রথমে চারটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে মন্ত্রিবাড়ি যা সচিবালয় বা মহাকরণ নামে এতদিন সবাই জানত। ১৯০৫ সাল থেকে ওই লালবাড়ি রাজন্য আমল থেকে চিফ কমিশনারের শাসনকাল এবং গণতান্ত্রিক শাসনকাল চলতে থাকে। শচীন্দ্রলাল সিংহ থেকে নৃপেন চক্রবর্তী—সকলেই এখানে বসে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। স্থানাভাবে দ্বিতীয় বামফ্রন্টের আমলে এর পেছনে নতুন ত্রিতল বাড়ি তৈরি করা হয়। ১৯৮৭ সালের ৩ আগস্ট এর উদ্বোধন হয়। নতুন দালান ও পুরনো দালান মিলিয়ে মন্ত্রী ও সচিবরা বসতেন। কিন্তু দিন দিন কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় খেজুরবাগানে স্থান নির্বাচন করে নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রখ্যাত নির্মাণ সংস্থা ম্যাকিনটস বার্নকে। তৃতীয় বামফ্রন্টের আমলে সিদ্ধান্ত হলেও অর্থাভাবে কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। কাজ শুরু হয় চতুর্থ বামফ্রন্টের শাসনকালে।

এই ঐতিহাসিক মহাকরণ ভবনের উদ্বোধন হয়ে গেল ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯-এ। চারতলা বাড়ি,২৬৮টি ঘর। ৩৬৮টি থামের ওপর দাঁড়ানো। রয়েছে ১৭টি সিঁড়ি এবং ১১টি লিফট। বাড়িটি ৭টি ব্লকে বিভক্ত। এত বিশাল বাড়ি যে,কেউ একবার ঢুকলে সহজে বেরনোর পথ খুঁজে পাবেনা। মনে হবে গোলকধাঁধায় পড়েছে। সাধারণ মানুষের যাতে অসুবিধা না হয় তাই দরজা দিয়ে ঢুকেই রয়েছে রিসেপশন। উপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে দেবে কীভাবে কোথায় যেতে হবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী তপন চক্রবর্তী তো উদ্বোধনের দিনে গোলকধাঁধায় পড়ে বেরনোর পথই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। চারতলায় মন্ত্রীদের ঘর বেশ বড়। মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে যেতে হলে

মাঝের লিফট ব্যবহার করলে সুবিধা হবে,কাছে পাওয়া যাবে। চারতলায় উত্তর-পূর্বে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে মন্ত্রীদের ঘরগুলো পর পর রয়েছে। সঙ্গে গেস্ট রুমও রয়েছে। সব ঘরেই প্রচুর আলো-বাতাস। সাংবাদিকদের জন্য প্রেস কর্নার নির্ধারিত হয়েছে গ্রাউন্ড ফ্লোরের ৫ নম্বর ঘবে। এ ঘরে পৌঁছতে হলে মহাকরণের পেছনের দরজা দিয়ে গেলে সুবিধা হবে।

উদ্বোধনের মুহূর্তটি ছিল অভিনব। রাজ্যের প্রখ্যাত সেতারবাদক কালীকিঙ্কর দেববর্মা ও বাঁশিবাদক নারাযণ সরকাব যুগলবন্দীতে খাম্বাজ রাগের মূর্ছনা তোলেন কাজি নজরুলের সেই বিখ্যাত রাগাশ্রয়ী গান 'উচা টন মন ঘরে রয়না'। তারপর রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী তিথি দেববর্মন গাইলেন বাংলায় ও ককবরকে 'ও কুমারী,মধুতী,রূপশ্রী' এবং রবীন্দ্রনাথের 'হে নূতন দেখা দিক আর বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন অর্থ ও পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী। বিশেষ ও সম্মানীয় অতিথি ছিলেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার ও অঘোর দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন জননেতা বৈদ্যনাথ মুজমদার। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ফিতে কেটে দ্বাবোদ্ঘাটন করেন বিকেল ৫টা ২৪মিনিটে। বৈদ্যুতিক বোতাম টিপে মহাকরণ ভবনের উদ্বোধন কবেন তিনি। এব আগেই প্রতিটি অলিন্দে ও প্রকোষ্ঠে বয়ে গেছে আবেগসিক্ত জনস্রোত। ৭নং ব্লকের সামনে প্রশস্ত জায়গায় জনসমাবেশের ব্যবস্থা করা হয়। সভায় সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন বর্তমান ও প্রাক্তন বিধায়ক ও মন্ত্রী,স্বাধীনতা সংগ্রামী,উকিল, কৃষক,শ্রমিক,ডাক্তাব,ইঞ্জিনিযাব,সাংবাদিক,সাধারণ নারী-পুরুষও। ব্যতিক্রম শুধু বিরোধী দলের প্রাক্তন ও বর্তমান বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রীগণ। তবে প্রাক্তন মন্ত্রী বাসনা চক্রবর্তী দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মহতী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং বলেন, শিশুর যেমন বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত আলো-বাতাস,ঠিক তেমনি প্রশাসন চালাতেও দরকার উপযুক্ত গৃহের। রাজ্য গরিব কিন্তু সদিচ্ছা থাকলে যে স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া যায়,সেটাই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার মিলিতভাবে কাজ করে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন,এ প্রাসাদ জনগণের এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করাই সরকারের লক্ষ্য। জনগণের গঠনমূলক পরামর্শ গ্রহণ করেই সরকার এগিয়ে চলেছে। সরকার জনগণের কাছ থেকে প্রতিদিনই শিক্ষা গ্রহণ করছে। জনগণ এবং সরকারের মাঝখানে কোনও দেওয়াল নেই। ত্রিপুরা অনেক পাল্টে গেছে। মাথাপিছু আয় বেড়েছে। সন্তান বিক্রি করে দেওয়ার পরিস্থিতি যা জোট আমলে ছিল,তা আর নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে ত্রিপুরা প্রথম পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। আগামী এক বৎসরের মধ্যে পূর্ণ সাক্ষর হওয়া লক্ষ্য। ত্রিপুরায় দুর্গম এলাকা বলতে এখন আর নেই। সারা রাজ্যে রাস্তার জাল বিস্তৃত। প্রায় ৮০ শতাংশ জনপদে বিদ্যুৎ পৌছে গেছে। যেখানে বিদ্যুতের খুঁটি পোঁতা সম্ভব হয়নি সেখানে সৌরশক্তিব সাহায্যে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যে কৃষিজমি কম থাকলেও খাদ্যে স্বযম্ভবতাব চেষ্টা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন,বাজ্যে যা উন্নতি হয়েছে তা মন্ত্রী বা আমলাদের

দ্বারা হয়েছে একথা ভাবার অবকাশ নেই। সবটাই হয়েছে জনগণের চেষ্টায় এবং সহযোগিতায় জনগণের আন্তরিকতায় এবং ভালবাসায়।

রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ছিলেন নিমন্ত্রিত অতিথি। বিশাল বাড়ি ও মানুষের ঢল দেখে তিনি অভিভূত। আলাপচারিতায় বলেন,পশ্চিমবঙ্গের মহাকরণও এত বড় নয়। তাঁর অনুমান,দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের সচিবালয় ব্যতীত এত বড় সচিবালয় আর কোনও রাজ্যে নেই। উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা বলেন,রাজ্যের অগ্রগতি এবং জনগণের উন্নয়ন এই বাড়ি থেকেই আমরা চালিয়ে যাব। শান্তি ও সম্প্রীতির সহাবস্থানেই অগ্রগতি হচ্ছে। সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা কাম্য।

সভাপতির ভাষণে পূর্ত ও অর্থমন্ত্রী বাদল চৌধুরী বলেন,১৯৪৯সালের ১৫ অক্টোবর ত্রিপুরা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় পর এ ধরনের কর্মকান্ড এই প্রথম। সকল বাধা অতিক্রম করে ২০০৪ সালে সিদ্ধান্ত হয়,খেজুর বাগানের নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্সে সচিবালয়,বিধানসভা ভবন,রাজ্য অতিথিশালা এবং হাইকোর্ট নির্মাণ করা হবে। সচিবালযের উদ্বোধন হল। বাকি তিনটি বাড়ির কাজ আগামী দেড় বছরের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। চারটি বাড়ি নির্মাণে মোট ব্যয় হবে ১৫২ কোটি টাকা। ম্যাকিনটস বার্ন কোম্পানির সি এম ডি গৌরাঙ্গ গাঙ্গুলিকে প্রথমেই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীর পক্ষে সংবর্ধনা জানান। স্বাগত ভাষণ দেন মুখ্যসচিব সুধীর শর্মা এবং ধন্যবাদ জানান সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের সচিব নেপালচন্দ্র সিনহা। রাজ্যের উন্নয়ন যাদের ভাল লাগেনা তাঁরা এ আনন্দে সামিল হতে পারেননি। আনন্দঘন অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকতে পারেননি। তাঁদের মুখপত্রগুলিও খবরটা মর্যাদা দিয়ে ছাপতে পারেনি। কিছু পত্রিকার পাঠক বঞ্চিত হলেন। তাঁরা এটা জানতে পারলেন না যে ২০সেপ্টেম্বর সকালের পত্রিকায় কত বড় ঐতিহাসিক খবর থেকে তাঁরা বঞ্চিত হলেন।

নীহারিকা চক্রবর্তী— শনিবার, ৩ অক্টোবর, ২০০৯ই, (আজকাল ত্রিপুরা)

মূল্যবোধের শিক্ষা ও শিল্পকলা প্রয়োজন

শিল্পী সাহিত্যিকদের স্বাধীনতা প্রয়োজন। তাঁদের স্বাধীনতা না দিলে সৃষ্টির গতি থেমে যাবে। নতুন নতুন সৃষ্টি থেকে সমাজ বঞ্চিত হবে। শিল্প এবং স্থাপত্য রীতি কালে কালে বদলেছে। হিন্দুদের অসংখ্য দেবদেবী। তাদের নানা আঙ্গিকের ছবি ও মূর্তি পাওয়া যায়। সমাজে একটা বৃহৎ অংশ শিশু,কিশোর-কিশোরী—তাদের কথা তো মাথায় রাখতে হবে। প্রায় প্রতি হিন্দুবাড়ির ঠাকুর ঘরে যোনিতে বসানো শিবলিঙ্গ থাকে। শিশুরা প্রথমে এটিকে দেবতা হিসেবে মানতে চায়না—তাদের কাছে অদ্ভুত দর্শন লাগে। পরে অবশ্য প্রতিদিন পূজিত হতে দেখে অনেকটা অভ্যাসগতভাবে মেনে নেয়। নানা প্রশ্ন করে। বিশেষ করে মা'কে। তিনিও পরিস্কারভাবে বুঝাতে পারেননা। আবার একটা সময়ে ওরা বুঝে ফেলে বা কৌতুহল মন থেকে চলে যায়। কোনার্কের সূর্যমন্দিরের সুনিপুণ খোদাই শিল্প পৃথিবীর আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু শিশু, কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে নিয়ে এসব স্থান দর্শন কেমন একটা অস্বস্তিকর ঠেকে। বিয়ের পর 'হনিমুনে' এসব দেখে ছবি কিনে এনে স্বামী-স্ত্রীতে দেখতে রোমাঞ্চ লাগার কথা। পরবর্তী সময় মা-বাবা হবার পর শিশুটি যখন বড় হতে থাকে তখন এসব ফেলে দিতে হয়, না জানি কখন শিশুটির চোখে পড়ে যায়।

শিল্প-সাহিত্য জীবন-সত্যের অনুসারী। জীবনের সত্যটা প্রকাশ করাই এদের কাজ। সত্যজিৎ রায়ের সিনেমাগুলিকে অতি সহজেই আলাদ করা যায়। তিনি তো জীবনের কথা সিনেমায় দেখিয়েছেন। মানব জীবনের শেষ সম্বলটুকুকে (লজ্জা) সাদা-মাটাভাবে উদ্‌ঘাটন না করেই তিনি বিশ্বজয় করেছেন—এসব কথা সবারই জানা।

মকবুল ফিদা ভারতমাতা ও সরস্বতীর নগ্নমূর্তি এঁকে বিতর্কিত হয়েছিলেন—বাজার গরম করেছিলেন। অনেকেরই এটা ভালো লাগেনি। বি.জে.পি সমর্থকরা তাঁকে হেনস্থা করেছিল। সাম্প্রতিককালে জুলাই ২০০৭ সালে বদোদরার এম্ এস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্র-বেঙ্কট রাও ও চন্দ্রমোহন এর হিন্দুদেবদেবীর অশালীন চিত্র আঁকা নিয়ে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। ছবি নষ্ট করেছে কট্টর পন্থীরা। দুই ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। ডিন শিবাজি পানিক্কর ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়ে কর্তৃপক্ষের কোপে পড়েছিলেন—তাঁকে সাসপেন্ড পর্যন্ত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা ঐ ডিনের সপক্ষে আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েছিল। অযথা

একটা ঝামেলার সৃষ্টি হল। এমনিতেই দেশে ঝামেলার শেষ নেই, রাজনীতি-দলবাজির তোড়ে কত উন্নয়ন ভেসে যাচ্ছে। মূল্যবোধের শিক্ষা ও শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। এ ব্যাপারে ছাত্রদের জন্য কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট কিছু নির্দেশিকা থাকলে এ ধরনের বিতর্কের সৃষ্টি হতনা। মূল্যবোধের শিক্ষা ও শিল্প—কারোরই গুরুত্ব কম নয় সমাজে। সুতরাং উভয়কেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

দৈনিক আরোহন— রবিবার, ৮ জুলাই, ২০০৭ইং

মৃত্যুদণ্ড বহাল থাক এবং অপরাধ নির্মূল হোক

ইদানিং পৈশাচিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে কয়েকজন অপরাধীকে। আগে ধর্ষণ পরে খুন। ভারতবর্ষে মৃত্যুদণ্ড বলতে ফাঁসিকে বোঝায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অন্যরকম ব্যবস্থা আছে। বিষ ইনজেক্‌শান প্রয়োগ করে,গুলি করে, মুণ্ডচ্ছেদ করে, ইলেকট্রিক শক্‌ দিয়ে ইত্যাদি।

কলকাতায় হেতাল পারেখের ধর্ষক ও খুনি ধনঞ্জয় চ্যাটার্জির ফাঁসি নিয়ে খুব শোরগোল পড়েছিল। এই সুবাদে ফাঁসুড়ে নাটা মল্লিক প্রচারের আলো পেয়েছিল। ধনঞ্জয় চ্যাটার্জির পরিবারও নাছোড়বান্দা। অবশেষে ফাঁসি হয়েছিল ধনঞ্জয়ের।

বিশালগড়ের পূজা হত্যা মামলায় সমীর ভৌমিকের ফাঁসির আদেশ হয়েছে। অনেকে এইসব রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করেন মানবিক আবেদনের অজুহাতে। প্রাণ যেহেতু দেওয়া যায়না, নেওয়া হবে কেন ? স্বভাবতই মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে মৃত্যুদণ্ডের ঔচিত্য সর্ম্পকে। 'ত্রিপুরা স্পোর্টস এন্ড কালচারেল ফাউন্ডেশন' অত্যন্ত সঠিক সময়ে বিতর্ক সভার ব্যবস্থা করেছে। 'ফাঁসি তুলে দেওযাই উচিত'—এ প্রস্তাবের পক্ষে বিপক্ষে জোরালো যুক্তি এসেছে। কানায় কানায় পূর্ণ ছিল রবীন্দ্রভবন ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০০৫ ইং। ব্যালকনিতেও তিল ধারনের জায়গা ছিলনা।

আগরতলা শহরের প্রখ্যাত এবং বিশিষ্ট অধ্যাপক,আইনজীবী,সাংবাদিকগণ তাঁদের মূল্যবান যুক্তি দিয়েছেন। তবে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে হাওয়া উঠেছে। শ্রোতৃমন্ডলীর থেকেও গোপন মতামত নেওয়া হয়। বিপক্ষেই যায় দুই-তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডের বিপক্ষের মানবিক আবেদন প্রশ্রয় পায়নি। অনুষ্ঠানের শেষে ফাউন্ডেশনের পক্ষে ঘোষণা দেওয়া হয় প্রস্তাবের বিপক্ষেই শ্রোতৃমণ্ডলী রায় দিয়েছেন।

প্রস্তাবের পক্ষে বাইবেলের যুক্তি দেখানো হয়—'পাপকে ঘৃণা কর,পাপীকে নয়।' সমাজ থেকে যেহেতু পাপ দূর করা যাচ্ছেনা,কাজেই পাপীর ঘাড়ে মৃত্যুদণ্ডের খাড়া উদ্যত থাকাই সমীচিন। নয়তো অবধারিতভাবে পাপকর্ম আরো বেড়ে যেত।

সম্প্রতি সুপ্রিমকোর্টের দুই বিচারপতির এজলাসে বিচারপতি বালকৃষ্ণাণ ও বিচারপতি শ্রীকৃষ্ণ জানিয়েছেন, কোন আসামির যাবজ্জীবন জেল হলে বাকি জীবনটাকে কারাগারেই কাটাতে হবে। সশ্রম কারাদণ্ড হবে। ১২ বা ১৪ বছর পর মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই। তবে

জেল জীবনে যদি তার চরিত্রের কোন সংশোধন হয়েছে বোঝা যায় তাহলে আলাদা ব্যাপার। সরকার যদি তার মুক্তি অনুমোদন করে তবেই মুক্ত হবে। আর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড মকুব করা বা হ্রাস করার ক্ষমতা তো দেশের প্রধান শাসক তথা রাষ্ট্রপতির হাতে রয়েছে। তাঁর কাছে আবেদন করলে সাজা মকুব বা হ্রাস হতে পারে,আবার নাও হতে পারে।

দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন সর্বপ্রকার অপরাধমুক্ত সমাজ। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কোনপ্রকার অপরাধ মেনে নেবেনা। বিশেষতঃ অর্থনৈতিক অপরাধ। ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। কর ফাঁকি বরদাস্ত করা চলবেনা। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে তা শোধ যথাসময়ে করতেই হবে। ফন্দি ফিকির বের করে তা আদায় করতে হবে। সরকারী অর্থের নয়ছয় বন্ধ করতে হবে। যাবতীয় অর্থনৈতিক অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী আরো কড়া শাস্তির ব্যবস্থা প্রয়োজন। মামুলি বরখাস্ত করে কোন লাভ হয়না। অপরাধীরা যেহেতু উল্লেখযোগ্য কোন শাস্তি পায়না—তাই উত্তরোত্তর অপরাধ করে থাকে। একজনের দেখাদেখি আরো অনেকে করে ফেলে। গ্রেপ্তার হলেও জামিনে মুক্তি পেয়ে যায়।

ঠিক ঠিক কাজটা করা এবং করানোর মানসিকতা প্রয়োজন। যথাযথ কাজ না করেও মাসের শেষে মাইনে পেতে কোন অসুবিধা হয়না সরকাবী কর্মচারী হবার সুবাদে। ত্রিপুবায যেহেতু প্রাইভেট কোম্পানি বা ফ্যাক্টরি প্রায় নেই বললেই চলে তাই অন্যান্য বাজ্যেব অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল নন এ রাজ্যের সরকারী কর্মচারীগণ। প্রাইভেট ব্যাঙ্কগুলি অত্যন্ত সুচারুভাবে তাদের কাজ আদায় করে নেয়। কাজ করতে না পারলে মাইনে দেওয়া হয়না। প্রাইভেটাইজেশান যেভাবে বাজার দখল করছে তাতে আবার সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করার বাধ্যবাধকতা ফিরে আসছে। এ দিন বেশি দূর নয়। একজন লোককে ১০ থেকে ১২ ঘন্টা কর্মক্ষেত্রে থাকতে হচ্ছে। তার বিশ্রামের ও সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালন করার সময়ে টান পড়ে যাচ্ছে। ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রায় নেই বললেই চলে। প্রাইভেট কর্মচারীদের এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' ঘটা করে পালনের আর অর্থ থাকেনা। রাশ টেনে ধরার সাহস যদি সরকার দেখাতে না পারেন তবে কে ধরবে?

দৈনিক আরোহণ— রবিবার, ২৩শে অক্টোবর, ২০০৫ইং

একটি হত্যা না একটি আত্মহত্যা?

মিষ্টি, তুমি আজ আর নেই
তোমার স্মৃতিতে কাতর সবাই
জীবন ফেলে মরণকে বেছে নিলে
লোভী-লালোচের দৌরাত্ম্যে।

আত্মহত্যার চেয়ে হত্যার ঘটনাই বেশি চোখে পড়ে। গত ৯ই আগস্ট ২০০৮ সকাল সোয়া নয়টায় অমরপুর কলেজের অধ্যক্ষ গোপালমণি দাসের মেয়ে মিষ্টি দাস আত্মহত্যা করে। মেয়েটি স্নাতক স্তরে বিজ্ঞানের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। ভালবাসত একটি যুবককে (ডঃ সৌম্যময় দাস ওরফে সুমন)। শুভ পরিণয় হবার সুযোগ পেলনা। এ মৃত্যুর ঘটনা কয়েক মাস পূর্বে—কলকাতায় রিজওয়ানুর এর আত্মহত্যার দগদগে ঘা-কে মনে করিয়ে দেয়। দু'টি ক্ষেত্রেই প্রেমিক এবং প্রেমিকা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। তাদের আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা হয়।

আমাদের সমাজে বাগদানের ঘটনা এখন আর বিশেষ শোনা যায়না। আগে সামাজিক ও পারিবারিক পরিস্থিতি অনেক সহজ সরল ছিল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে জটিলতা প্রবেশ করেছে মানুষের অঙ্গনে-ভবনে মনের কোণে। মূল্যবোধ পাল্টাচ্ছে এবং ভাঁটা পড়েছে—এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। দুই পরিবারের অভিভাবকগণের বাগদান রূপায়ন পর্যন্ত টেনে নিতে পারার পারঙ্গমহীনতায় আজ এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল। এক পরিবারের আর্থিক লোভ-লালসা ও অপর পরিবারের দূরদর্শিতার অভাব—এর জন্য দায়ী। যাঁদের মেয়ে গেল সন্তান গেল তাঁদের সান্ত্বনা কোথায়? তাঁরা মনকে কি দিয়ে প্রবোধ দেবেন? নিহত মেয়েটির পিতা মহিলা কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন—সুবিচারের আশায়। সুবিচার অবশ্যই পাওয়া উচিত—পাবেনও আশা রাখি। কিন্তু রাজ্যের দুই উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে যে ঘটনা ঘটে গেল—তাতে গোটা রাজ্য স্তম্ভিত। কি দমবদ্ধকর অবস্থা। শিক্ষা দীক্ষা ও পেশার প্রতি দায়বদ্ধতা এসবও দেখা যায় মানুষের অন্তঃস্থলের যে আদিম হিংস্র ইচ্ছা—তা থেকে টলাতে পারেনি।

ইংরেজ দার্শনিক থমাস্ হব্স্ সপ্তদশ শতব্দীতে তাঁর 'লেভিয়াথান' নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন—মানুষ প্রকৃতিগতভাবে কলহ প্রিয়—ঈর্ষাপরায়ন—স্বার্থপর। আধুনিক সভ্য জগতে আইন করে এবং সামাজিকীকরণের মাধ্যমে মানুষের মনের কালিমা দূর করার প্রক্রিয়া

চলছে। সাধারণ পরিবার ও সাধারণ পরিবেশে যারা বেড়ে ওঠে তাদের ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া ফলপ্রসু হতে পারে। আর সম্ভ্রান্ত পরিবারের (শিক্ষায়, পেশায়, অর্থে) ভেতরের কাঠামো টলানো একটু কঠিন। স্বতঃপ্রণোদিত না হলে নীতি নৈতিকতা ডুকরে কেঁদে চৌকাঠ থেকে বিদায় নেয়।

কাউকে আঘাত দেওয়া উদ্দেশ্য নয়—তবে মনের অন্তঃস্থলের অনুভূতি আর চারদিকের পরিস্থিতি লব্ধজ্ঞানে বলছি আমাদের সমাজে মেয়েদের (বধূদের) অবস্থা 'নেকড়ে ও মেষ শাবক' গল্পের মেষ শাবকের মতো। অনেক বধূই জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকে। মন-মানসিকতা ব্যক্তিত্ব জলাঞ্জলি দিয়ে। বিকাশের তো আর কোন প্রশ্নই থাকেনা।

মিষ্টি'র বাবা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মেয়েকে যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন বলে দাবি রেখেছেন। ভালো কথা। তবু প্রাণের চেয়ে প্রিয় সন্তান জীবনযুদ্ধ হেরে গেল। আঘাত অপমান সহ্য করতে না পেরে নিজের জীবন নিজে বলি দিল। জীবন যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার যথার্থ শক্তি অর্জন করেনি সে। জন্মদাতা পিতা মাতার মুখের দিকে তাকিয়ে অন্তত তার বেঁচে থাকার প্রয়োজন ছিল। লায়েক-প্রতারক-হীন প্রেমিক এবং লোভী পাষন্ড হবু শ্বশুর-শাশুড়ি বেইমানী করেছে—কিন্তু জন্মদাতা মা-বাবা তো কোন বেইমানী করেননি। মিষ্টি আত্মহত্যা করে মা-বাবার প্রতি বেইমানী করল। জানি অনেক দুঃখে, অনেক যন্ত্রণায়, অনেক অপমানে এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। তবু বলব তার বেঁচে থাকার প্রয়োজন ছিল। নিজের জন্যে, মা-বাবার জন্যে, বোনের জন্যে, আত্মীয় পরিজনের জন্যে—গোটা সমাজের জন্যে। সাবলীলভাবে বেঁচে থেকে এসব লোভ লালসা প্রতারণাকে লাথি মেরে গুড়িয়ে দিতে। কেন তার মধ্যে হতাশা এল? তবে সাধারণ পরিবারের সাধারণ মেয়েরা কোথায় যাবে? যাদের পেছনে দাঁড়াবার বা সাহস যোগোবার তেমন কেউ বা কিছু থাকেনা। গলা টিপে শ্বাসরোধ করে বা কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে মারার ঘটনা তো জলভাত হয়ে গেছে—প্রতিদিনের খবরের কাগজে দেখা যায়। বিয়ের পরে শ্বশুর বাড়িতে মানিয়ে নেবার পরামর্শ মা-ই দিয়ে দেন। মানিয়ে নিতে না পারলে বাপের বাড়িতেও মেয়েদের অপদস্ত হতে হয় মর্যাদা থাকেনা। প্রশ্ন হলো মানিয়ে নেবার দায় যদি একতরফা হয়—তবে তারও তো একটা সীমা আছে। অনেক মেয়েরই জীবনের প্রতি ঘৃণা চলে আসে। ভাবে আমার জীবনের আর কি দাম? মরতে হয় শ্বশুরবাড়িতেই মরব। সমস্যার কথা মা-বাবার কাছেও জানাতে চায়না বা পারেনা।

সমাজে আমরাই ছেলের মা-বাবা, আমরাই মেয়েরও মা-বাবা। তবে দ্বৈতভূমিকা কেন? ঘরে বাইরে নারীকে নাকাল হতে হচ্ছে। সামন্ততান্ত্রিকতা শুধু সমাজের পুরুষের মধ্যে নয়—অবস্থা বিশেষে নারীদের মধ্যেও যথেষ্ট বিদ্যমান।

অন্যভাবে বলা যায় সবল দুর্বলকে রক্ষা না করে ভক্ষণ করছে। কখনো পণের অজুহাতে অত্যাচার চালায় বধূর উপর অথবা বধূ ও বাপের বাড়ির লোকজনদের হেনস্থা করে। রবীন্দ্রনাথের নিরুপমা'র গল্প আজও প্রাসঙ্গিক। ভবিষ্যতে আরো কতকাল প্রাসঙ্গিক থাকবে বলা সহজ নয়। মেয়েদের আরো বেশি করে শিক্ষিত হওয়া দরকার। শিক্ষার মাধ্যমেই মানসিক শক্তি সঞ্চয় হয় যা জীবনযুদ্ধে সহায়ক শক্তি হয়। জীবনযুদ্ধে হেরে না যাবার শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার।

দৈনিক আরোহণ— শুক্রবার, ২৯ আগস্ট, ২০০৮ইং

'রক্ষক যেথা ভক্ষক,সেথা মরা সে তো বাঁচিয়াই'

ভাবলে গা শিউরে ওঠে। ঘেন্নায় মুখ কোথায় লুকোব ভেবে পাইনা! ঘটনার প্রকাশ গত ৯ই ডিসেম্বর ২০০৭ইং বিশ্রামগঞ্জ স্কুলের ছাত্রী সুপ্রিয়া দেববর্মাকে জনৈক যুবক সুব্রত দেব অপহরণ করে। অপহৃতার বাবা রাজারাম দেববর্মা থানায় মামলা দায়ের করেন। অভিযোগ মূলে পুলিশ ১১ ডিসেম্বর যুবককে আটক করে এবং তার স্বীকারোক্তিতে আমতলি থানা এলাকার একটি বাড়ি থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ থানায় নিয়ে যায়। ঐদিন রাতে অন্যান্যদের সাথে থানায় কর্তব্যরত ছিলেন ইন্সপেক্টর নন্দন বৈদ্য। রাত বারোটা নাগাদ পাষণ্ড নন্দন বৈদ্য থানার লক-আপে মেয়েটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ মেয়েটিকে বিবস্ত্র করে ধর্ষণের চেষ্টা করে। সেদিন রাতে থানায় কর্তব্যরত ছিলেন মহিলা কনস্টেবল মুন্না রায়। তাঁর সক্রিয় বাধাদানে পাষণ্ড পুলিশ অফিসার মেয়েটির চূড়ান্ত সর্বনাশ করতে পারেনি। পরে মেয়েটি থানা থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে যায় এবং বাবাকে ঘটনা জানায়। সুপ্রিয়ার বাবা রাজারাম দেববর্মা পাষণ্ড পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন। অভিযোগ মূলে গুণধর লম্পট নন্দন বৈদ্যকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সরকার ঘটনাটাকে গুরুত্ব সহকারে দেখছেন। রাজ্য মহিলা কমিশনের সভাপতি ডঃ তপতী চক্রবর্তী এবং সদস্যা সচিব জয়া বর্মণ বিশ্রামগঞ্জ ছুটে যান। থানায় খোঁজ খবর নেন,মহিলা কনস্টেবল মুন্না রায়ের সঙ্গে কথা বলেন। রাজারাম দেববর্মার বাড়িতে যান। নির্যাতিতা সুপ্রিয়া ও তার বাবার অভিযোগ শুনেন এবং আশ্বাস দেন যে কমিশনের রিপোর্ট রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরে পাঠিয়ে দেবেন। গণতান্ত্রিক নারী সমিতির উদ্যোগে বিশ্রামগঞ্জে সোমবার ১৬ই ডিসেম্বর ২০০৭ইং এক ধিক্কার মিছিল বের হয় এবং পথসভা হয়—নারী নেত্রী চপলা বিশ্বাস নেতৃত্ব দেন।

ঘটনার রাতে কনস্টেবল মুন্না রায় যথেষ্ট সাহস দেখিয়ে কর্তব্যে অটল থেকে ক্ষিপ্ত নেকড়ের থাবা থেকে অসহায় মেয়েটিকে রক্ষা করেন। তাঁকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

কর্তব্যরত পুলিশ কোন্ ধরনের কর্তব্য পালন করলেন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব যার উপর তিনিই কিনা চূড়ান্তভাবে আইন ভঙ্গ করলেন। অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারের উপযুক্ত শাস্তি কাম্য।

দৈনিক আরোহণ— শনিবার, ২২ ডিসেম্বর, ২০০৭ইং

নারকীয় ঘটনা রোধে প্রতিরোধ দরকার

পত্রিকা খুললেই শিশু ধর্ষণ,কিশোরী ধর্ষণ,যুবতী ধর্ষণ, বধূ ধর্ষণ, হত্যা, গুরুতর আঘাত, অগ্নিদগ্ধ—এসব চোখে পড়ে। পাশাপাশি শাস্তির রায়ের খবরও ওঠে। জেল,জরিমানা, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ফাঁসি। খবরগুলি দেখতে দেখতে বা পড়তে পড়তে অনেকের কাছে যেন গুরুত্বহীন হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টা তো আদৌ গুরুত্বহীন নয়। প্রতিটা ঘটনা হৃদয় বিদারক এবং ভাববার মতো।

সদর উত্তরের লেফুঙ্গা থানার হরেন্দ্র নগর চা-বাগানে এক কিশোরীকে ধর্ষণ করে হত্যার চেষ্টা করা হয়। মৃত ভেবে দুষ্কৃতি স্বদেশ পাইক কিশোরীকে লতাপাতা দিয়ে ঢেকে পালিয়ে যায় (০৯-০৫-০৭)।

পরদিন বাগানের অন্য শ্রমিকরা অর্ধমৃত অবস্থায় কিশোরীকে উদ্ধার করে এবং আশঙ্কাজনক অবস্থায় জি বি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ধর্ষণকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। তার বিরুদ্ধে আরো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

খোয়াই-এর পম্পা বণিক,মহিলা কলেজের ইংরেজি অনার্সের ছাত্রী গত ১৩ এপ্রিল ২০০৭ ইং খুন হয় ত্রিকোণ প্রেমের অজুহাতে। বিশালগড়ের জহিরুলকে নিজের বাপ ভাইয়েরা পিটিয়ে মেরে ফেলল—শ্বশুরবাড়ি থেকে পণের অবশিষ্ট ১২০০ টাকা না আনার জন্য। জহিরুল তার স্ত্রী ঋণাকে নিয়ে সংসার করতে চেয়েছিল—কিন্তু পারলনা। তেলিয়ামুড়ার তুইসিন্দ্রাই কলোনীর সুভাষিণী রুদ্রপালকে জীবন্ত দগ্ধ করে রাতের অন্ধকারে মারা হল। কারণ তিনি বিবাহিতা মেয়ের ইজ্জত বাঁচাতে চেয়েছিলেন। গত ২৪ এপ্রিল ২০০৭ অমরপুরের অম্পি এলাকায় এক বোবা যুবতীকে ধর্ষণ করে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়। এসব নারকীয় ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে। প্রতিটা খুনের প্রেক্ষাপট ভিন্ন ভিন্ন। খুনিরা প্রত্যেকে মানবিকতায় বিবর্জিত, অধৈর্য,আত্মনিয়ন্ত্রণহীন। একটা খুনের বা ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি ওঠে এবং খবরগুলি পত্রিকায় যত্নসহকারে প্রকাশিত হয়। ত্রিপুরায় অন্তত খুনের ঘটনা চাপা থাকেনা,প্রকাশিত হয়,দোষীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে সাজা হয়। ঘৃণা ধর্ষক বা খুনির দিকে থাকে। আর ধর্ষিতার প্রতি সহমর্মিতার প্রকাশ ঘটে।

দুর্ঘটনা হবার পর উভয় পরিবারেই বিপর্যয় নেমে আসে। বিশেষ করে নারী ও শিশুরা বেশি ভুক্তভোগী হয়। একটা দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে—তার বিন্দু বিসর্গ আঁচ করতে পারলে

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যদি এগিয়ে এসে এর প্রতিরোধের চেষ্টা করে তবে এ ধরনের অনেক অঘটনই এড়ানো যায়। যেমন বিশালগড়ের জহিরুল বা তুইসিন্দ্রাই কলোনীর সুভাষিনী রুদ্রপালকে রক্ষা করা যেত।

একটা সামাজিক বিয়েতে উভয় পক্ষের বহু মানুষ জড়িত থাকে। পণ নিয়ে যেন বাড়াবাড়ি না হয়—এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে কেউ যদি সৎ সাহস দেখিয়ে একটু এগিয়ে আসেন তবে নব পরিণীতাকে জ্বলে পুড়ে মরতে হয়না বা বৌভাতের পরদিন থানায় গিয়ে শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে হয়না। দুটি পরিবারের ও দুটি মনের মিলনে তো সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবার কথা। সমাজে শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের অভাব নেই—আছে শুধু একটু উদ্যোগের অভাব।

পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়—এ কথাটাকে আরো একটু ঘুরিয়ে বলা যায় অপরাধীকে ঘৃণা কর, অপরাধীর পরিবারকে নয়। পরিবারের নিরাপত্তা যেন থাকে। মূল্যবোধের শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজন। একের কথায়, আচরণে, ব্যবহারে বা কাজে যেন অপরের মনোকষ্টের কারণ না হয় বা কোন ক্ষতি না হয়। শুধু আর্থিক স্বয়ম্ভরতায় সমাজে শান্তি সুস্থিতি আসেনা। সহিষ্ণুতার শিক্ষা দরকার। সহমর্মিতা সমবেদনা—এ কথাগুলি সামাজিক জীবন ও পারিবারিক জীবন থেকে নিঃশেষ হয়ে গেলে মানুষের জীবনে ভয়ঙ্কর শূণ্যতার সৃষ্টি হবে।

দৈনিক আরোহণ— বুধবার, ১৬ই মে, ২০০৭ইং